মুদ্রাভঙ্গ

সমরেশ মজুমদার

সমরেশ মজুমদারের নতুন দুইটি উপন্যাস
'মুদ্রাভঙ্গ, বিপুল নিকট' পাপপুণ্যময়
জীবনের বিচিত্র জলছবিতে
আলতো লেগে আছে হৃদয়ের বিষাদ।

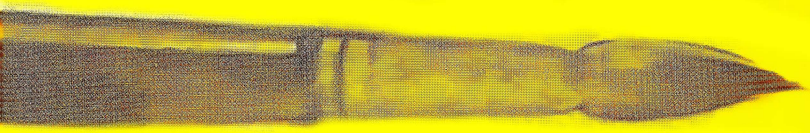

মুদ্রাভঙ্গ

মুদ্রাভঙ্গ

সমরেশ মজুমদার

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

© সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-088-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

MUDRABHANGA
[Novel]
by
Samaresh Majumder
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.bengaliboi.com

Click here

কমল চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

চারপাশে ছায়াছায়া অন্ধকার। কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না সে। খানিক বাদে বুঝতে পারল জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে বুনো ঝোপ, লতানো উদ্ভিদ। সে শুয়ে আছে চিত হয়ে অথচ মাথার ওপর কোনও আকাশ নেই। ধীরে ধীরে উঠে বসল। দুটো পা সামনের দিকে প্রসারিত, কোমর থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ সোজা হল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল আশপাশে কোনও পথ নেই।

এখন তার শরীরে কোনও ক্লান্তি নেই। যেন দীর্ঘ এবং শান্তির ঘুম তাকে পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছে। কিন্তু আশপাশের বুনো ঝোপ আর লতাগুলো কীরকম অদ্ভুত! কোনও গন্ধ নেই, সে হাত বাড়িয়ে দেখল কোনও পাতাও নেই। ডালগুলো খুব শুকনো, খসখসে। এরকম জায়গায় সে কীভাবে এল? মনে করতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু কেবলই ধাক্কা খাচ্ছিল তার স্মরণশক্তি। শুধু মনে হচ্ছিল সে শুয়েছিল। এই একটু আগে যেভাবে চিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই। তার শায়িত শরীর দুলছিল। আশপাশে কেউ কথা বলছিল না। তার মতোই কি সবাই ঘুমন্ত ছিল? কিন্তু তার আগে অথবা পরের কিছুই তার মনে পড়ছিল না। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। আঃ, খুব হালকা লাগছে নিজেকে। কেউ যেন তাকে ওজন কমাতে বলেছিল। ওজন কমালে শরীর ভাল থাকে। যেহেতু এখন নিজেকে খুব হালকা লাগছে তাই তার শরীর নিশ্চয়ই ভাল হয়ে গেছে! কিন্তু তার শরীর কি আগে খারাপ ছিল? মাথা নাড়ল সে, মনে আসছে না।

কয়েক পা হাঁটল সে বুনো ঝোপ সরিয়ে। তাকে ওপরে উঠতে হচ্ছে। অর্থাৎ পাহাড়ের একটা ধাপে রয়েছিল এতক্ষণ। আর একটু উঠতেই পাহাড়ের ওপাশে ছায়াছায়া উপত্যকা দেখতে পেল। আশ্চর্যে ভরা উপত্যকা। এবং তখনই সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ল সেই উপত্যকায়। চারধার সাদা হয়ে যাচ্ছিল। আলো ঘন হতে হতে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল পাহাড়ে আর সেই ঢেউয়ে সে ভেসে যাচ্ছিল। কখনও ডুবে যাচ্ছে কখনও শ্বাস নেওয়ার জন্যে মুখ তুলছে ওপরে। কতক্ষণ ধরে সে নাকানি-চোবানি খেয়েছিল জানা

নেই, হঠাৎ পায়ের পাতা দুটো একটা শক্ত জায়গা ছোঁয়ামাত্র আটকে গেল। তখন সমস্ত শরীর ঢেউয়ের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে কিন্তু দুটো পা নড়ছে না। তারপর আচমকা ঢেউ সরে গেল। চারধার ছায়ায় মোড়া। সামনেই একটা পথ যেটা নীচ থেকে ওপরে উঠে গেছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশের জঙ্গলে। কোনও পাখিকেই উড়তে দেখতে পেল না। সে চোখ বন্ধ করল। এই পথ কোথায় গিয়েছে? এই অন্ধকার অরণ্য যেন ক্রমশ বুকের ভেতরে চলে এল। সে তার ভেতরে নিজেকে খুঁজতে শুরু করল। তার মনে হল চারপাশে ভয়ংকর পশুরা ওত পেতে আছে। এই বন্য জন্তুরা মাঝে মাঝেই হুংকার ছাড়ছে। এরা কি তার একজীবনের পাপ? সে কি এখন পাপের পরিমণ্ডলে আটকে রয়েছে? তার লোভ, অহংকার, স্বার্থপরতাগুলো এখন বন্য হিংস্র জন্তুর মতো আহত হয়ে গোঙাচ্ছে? তার পরেই পথের প্রান্তে একটি সিংহকে দেখা গেল। তার দুটো চোখে আগুন জ্বলছে, কেশর ফুলে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। দ্রুত সে ছুটে আসছে গর্বিত পদক্ষেপে। কিন্তু তার কাছাকাছি আসামাত্র সে আর্তনাদ করতেই সিংহ মিলিয়ে গেল। দেখা দিল একটি হিংস্র নেকড়ে। পথের মাঝখানে বসে সে তার লেজ মাটিতে আছড়াচ্ছে। সিংহ যদি অহংকার হয় তা হলে এই নেকড়ে নির্ঘাত লোভ ছাড়া কিছু নয়। নেকড়েটা বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। গজরাচ্ছে, কষ দিয়ে লালা পড়ছে। সে পিছনে হাঁটার জন্যে চেষ্টা করল কিন্তু তার দুটো পা নড়ল না। নেকড়েটা আরও এগিয়ে এসেছে। তার কোনও অবলম্বন নেই। সে চিৎকার করে বলল, "দয়া করো, দয়া করো আমাকে।" কিন্তু নেকড়ে শূন্যে লাফ দিল। ভয়ংকর সেই লাফ। সে আর্তনাদ করে উঠল।

খানিক বাদে চোখ খুলতেই সে অবাক হয়ে গেল। নেকড়েটা ধারে কাছে নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝখানে। দুটো পা আর মাটিতে আটকে নেই। কিন্তু চারধারে ছায়া আরও ঘন হয়ে গেছে। তারপর খেয়াল হল পথটা আগের থেকে অনেক সরু হয়ে গেছে। জঙ্গলে যেমন পায়ে চলা পথ থাকে চেহারাটা তেমনই।

এসব কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে বোঝার চেষ্টা না করে সে এগোতে লাগল। নীচ থেকে ওপরে উঠে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে না যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই বলে তার মনে হচ্ছিল। দু'পাশে জঙ্গল কিন্তু কোনও পরিচিত গাছ নেই। শব্দ নেই। খানিকটা হাঁটতেই জঙ্গল ফাঁকা হয়ে এল এবং সে অবাক হয়ে গেল।

সামনেই একটা চওড়া রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে অগুনতি মানুষ। চলেছে পা টেনে টেনে। যেন যেতে হবেই তাই যাওয়া। ওইসব মানুষের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দেশের কোনও কোনও প্রদেশের মানুষের মুখ দেখে আন্দাজ করা যায়, এখন সেটাও করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া মানুষগুলো হাঁটছে মাথা নিচু করে। তার মনে হল এরকম দৃশ্য যেন সে কোথাও দেখেছে। কোথায়? সে মনে করতে পারল না। মনে করার শক্তিটা কীরকম অকেজো হয়ে গেছে তার। কেবলই মনে হচ্ছিল এই দৃশ্য সে দেখেছে। অনেক মানুষ মাথা নিচু করে হাঁটছিল। কিছু বহন করার পরিশ্রমে তারা ঝুঁকে পড়ছিল। আর তাদের পাশে কিছু বলশালী চাবুক হাতে শাসন করছিল।

কিন্তু এরা কেউ কিছু বহন করছে না। এদের পাশে বলশালী ব্যক্তিরা নেই তাই চাবুকের শাসনও অবান্তর। তবু এরা মাথা নিচু করে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটছে কেন? আচমকা সে টান অনুভব করল। যেন অদৃশ্য কোনও শক্তি তাকে টেনে নিয়ে ওই মিছিলে ঢুকিয়ে দিল। মিছিলের মানুষ হওয়ামাত্র সে পা টেনে টেনে হাঁটতে শুরু করল, মাথা নিচু হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছিল তার এখন আলাদা কোনও পরিচয় নেই।

"এই, তুই তো মেয়েমানুষ! হা হা হা।"

ঠিক পাশে হাঁটা শরীর থেকে কি বাক্য বেরিয়ে এল? কিন্তু মেয়েমানুষ বলে ওইভাবে হাসার কী আছে! লোকটা যদি কথাগুলো বলে থাকে তা হলে সামনে পিছনের হাঁটিয়েরা শুনতে পেল না কেন? তা ছাড়া লোকটা তাকে তুই বলে সম্বোধন করল! বোঝাই যাচ্ছে হয় ও শিক্ষিত নয় কিংবা অতি-দাম্ভিক।

"হাঁটছি তো হাঁটছি। আর কত দূরে যেতে হবে কে জানে। বেশ তো আরামে রাতের ট্রেনে ঘুমোচ্ছিলাম—উঃ! কপালে সুখ সহ্য হল না।"

রাতের ট্রেন? তার মানে এই লোকটাও সেই ট্রেনে ছিল যার কথা তার একটু একটু মনে আছে। ওই অবধি গিয়েই স্মৃতিটা ধাক্কা খেয়ে থেমে যাচ্ছে। এই লোকটার স্মৃতিতে আর কিছু থাকলেও থাকতে পারে!

"আমিও একটা ট্রেনে ছিলাম। ঘুমোচ্ছিলাম।" সে ঠোঁট নাড়ল।

"নতুন কথা নাকি! এখানে যারা হাঁটছে সবাই ওই ট্রেনে ছিল। কী জোরে ছুটছিল ট্রেনটা! কী দুলুনি! তাতেই ঘুম জমে গিয়েছিল।"

"তারপর? তারপর?"

"ইয়ারকি হচ্ছে? তারপর কী হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারছি না বলে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তারপর? তারপর? তারপর কিছু জানি না। ট্রেনে শুয়েছিলাম আরাম করে, জেগে দেখি হাঁটছি," লোকটা বলল।

হঠাৎ ঘন ছায়া আরও ঘন হয়ে গেল। সামনে যারা হাঁটছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন চারপাশে কাক-অন্ধকার। পাশের লোকটা বলল, "এসব কী হচ্ছে? ম্যাজিক?" তারপরে ওই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসল সে, "কী মজার ব্যাপার। স্মৃতিগুলো সব মরে হেজে গেছে কিন্তু কথাগুলো দিব্যি বলতে পারছি।"

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র ভয়ংকর আওয়াজ করে বাজ পড়তে লাগল একের পর এক। অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে আগুন ছুটে যেতে লাগল চারধারে। সেইসব আগুন পরস্পরের স্পর্শ পেতেই গোলাকার হয়ে মাথার ওপরে উঠে গেল। তারপর যখন তাদের ওজন এবং আয়তন বেড়ে গেল তখন প্রবল বেগে নেমে আসতে লাগল নীচের রাস্তার দিকে। ছাই হয়ে যাওয়ার ভয়ে সম্মিলিত আর্তনাদ ছিটকে উঠল।

গলা শুকিয়ে কাঠ, হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে কণ্ঠনালির প্রান্তে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সংহিতা। দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁপাতে হাঁপাতে মনে করল সে মরে যাচ্ছে। তার পরনের নাইটি অতিদ্রুত ভিজে গেছে ঘামে, যদিও মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে তিন পয়েন্টে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সে বিছানা থেকে দ্রুত নেমে ঢাকা দেওয়া গ্লাসটা তুলে ঢকঢক করে অর্ধেকটা জল খেয়ে ফেলল। যেন বালি ভিজিয়ে জল সমস্ত ধুলোকে শুষে নিল। নেওয়ার পর একটু শান্ত হল বুক, স্থির হল মন। শরীর থেকে নাইটি টেনে বের করতেই বাতাস এল ঘাম শুকিয়ে দিতে। আঃ, কী আরাম! কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল সংহিতা।

হঠাৎ তার খেয়ালে এল। বছর তিনেক আগে একটা ছবি এঁকেছিল সে। মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবী থেকে যখন জল নেমে ভূমণ্ডল নতুন করে জেগে উঠেছে তখন নোয়ার নৌকো থেকে মিছিল করে নেমে আসছে যাবতীয় প্রাণীকুল। যেহেতু তখনও মাটি কাদা কাদা, পলিতে ভরা, তাই তারা হাঁটছিল পা টেনে টেনে। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে মাথা ঝুঁকে পড়েছিল সামনে। ছবিটা খুব প্রশংসা পেয়েছিল। আমদাবাদের একজন শিল্পপতি আঠারো

লক্ষ টাকায় কিনেছিলেন এগজিবিশন থেকে। আজ, এই একটু আগে, যে-মিছিলের দৃশ্য তার ঘুমে চলে এসেছিল তার সঙ্গে ওই ছবির মিছিলের বেশ মিল আছে। শুধু ছবিতে ছিল পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল আর তার স্বপ্নে এসেছে মানুষ। নোয়ার প্রাণীরা নতুন জীবনের পথে এগিয়েছে, তার স্বপ্নের মিছিলের ওপরে নেমে আসছিল ভয়ংকর আগুনের গোলা যা তাদের ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু ভয়ে তার ঘুম ভেঙে গেছে, তাই মিছিলটা ছাই হয়ে গিয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব নয়। সেই যে-লোকটা মেয়েমানুষ বুঝে হা হা করে হেসেছিল সে তা হলে এখন ছাই।

কিন্তু এরকম স্বপ্ন সে কেন দেখল? দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল সংহিতা। রাত এখন আড়াইটে। ভারতের সব পরিচিত মানুষ এখন গভীর ঘুমে। কাউকে ফোন করার সময় এখন নয়। হঠাৎ বব্-এর কথা মনে এল। সাতাশি বছরের আর্ট ক্রিটিক। এখনও সমান সক্রিয়। থাকেন নিউ ইয়র্কের স্যাটান আইল্যান্ডে। বারো বছর আগে সংহিতার সোলো এগজিবিশন দেখতে এসেছিলেন বব্। ছোটখাটো, টাকমাথার মানুষটির চিবুকে সাদা দাড়ি। ছবি দেখার পর সেই যে আলাপ করেছিলেন তার ছেদ এখনও পড়েনি। শুধু ছবি নয়, তার বাইরেও অনেক কথা হয়েছে বব্-এর সঙ্গে। মাসে একবার কথা তো হয়ই। গতবার ফোন করতে দেরি হয়েছিল। বব্ বলেছিলেন, "মাই ডিয়ার লেডি, তুমি সাতদিন দেরি করেছ। আমার তো ভয় করছিল, তোমার কিছু হয়ে গেছে নাকি! বয়সটা তো ভাল নয়!"

সাতাশি বছরের বৃদ্ধ কথাগুলো বলেছেন আটান্নর প্রৌঢ়াকে। হো হো শব্দ করে হেসেছিল সংহিতা। তারপর বলেছিল, "ঠিক আছে বব্, এখন থেকে আমরা পাক্ষিক ফোন করব। একবার আমি আর একবার আপনি।"

স্যাটান আইল্যান্ডে এখন ক'টা বাজে? বিয়োগ করে সংহিতা হাসল, বিকেল পাঁচটা। বব্-এর এখন বিকেলের চা খাওয়ার সময়। সে মোবাইল তুলে বব্-এর নাম বের করে বোতাম টিপল। দুই কি তিন সেকেন্ডে রিং শুরু হল, তার চার সেকেন্ড বাদে বব্-এর গলা, "এ কী! তোমার কী হল? রুটিনের বাইরে ফোন? তোমার তো এখন অনেক রাত।"

"বব্, আপনার স্বপ্ন নিয়ে কোনও পড়াশুনো আছে?"

"মাই ডিয়ার লেডি, স্বপ্ন তো উপভোগ করার জন্যে, গবেষণা করে কী লাভ?"

"তা নয়, আমি আজ একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলাম। ঘুম ভাঙল এমন ভয় পেয়ে যে, কয়েক সেকেন্ড ধরে মনে হচ্ছিল আমি মরে যাচ্ছি। সমস্ত শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গিয়েছিল। উঃ, কিন্তু আমি কেন স্বপ্নটা দেখলাম?"

"ওয়েল, শোনা যাক বিষয়টা।"

সংহিতা যতটা মনে করতে পারল বলল বব্‌কে। শোনার পর বব্ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, এবার বলো, তুমি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কবে পড়েছ?"

"'ডিভাইন কমেডি'?"

"হ্যাঁ। যে-পার্টটায় হেল-এর কথা বলা আছে, সেটা কবে পড়েছ?"

সংহিতা চিন্তা করল। মাথা নেড়ে বলল, "মনে পড়ছে না। হয়তো পড়েছি। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য'-এ যে-নরকের বর্ণনা আছে তার সঙ্গে নাকি দান্তের ডিভাইন কমেডির নরকের খানিকটা মিল আছে।"

"আমি জানি না। ওই বই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।" বব্ বললেন, "কিন্তু একেই বলে ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ। মৃত আত্মারা নীরব মিছিলে যোগ দিয়ে হাঁটছে। তারা কোথায় যাবে, কী পরিণতি হবে জানে না। তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ সামনে ঝুঁকে আছে, পা টেনে টেনে হাঁটছে, নিঃশব্দে। সেই অদ্ভুত চরাচরের মিছিলের ওপর আগুনের ভয়ংকর গোলা তৈরি হচ্ছে আরও-একটি ধ্বংস করার জন্যে। এঁকে ফেলো মাই ডিয়ার লেডি। আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে তোমার ওপর। দারুণ ছবি হবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ বব্। আই উইল ট্রাই। কিন্তু আঁকার আগে আমি একবার দান্তের বইটা পড়ে নিতে চাই।"

"নো। কখনও না। ওই স্বপ্নই হোক তোমার ছবির উপাদান। ডিভাইন কমেডি তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। এবার ঘুমোতে যাও লেডি। গুড নাইট।"

বব্-এর সঙ্গে কথা বলার পর মন শান্ত হল। টেলিফোন রেখে সংহিতা শোওয়ার ঘর থেকে পড়ার ঘরে এল। প্রচুর বই তার। দিনটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছে সে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আঁকার ঘরে থাকে, লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়ার ঘরে রাত ন'টা পর্যন্ত। বাংলা এবং ইংরেজির কত ভাল বই এক জীবনে না-পড়া থেকে যাবে!

সংহিতার এই ফ্ল্যাটের ভেতরটা আঠারোশো স্কোয়ার ফুট। পাঁচ বছর আগে

যে দামে সে কিনেছিল এখন সেটা তিন গুণ বেড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় হল আঁকার ঘর। আর একটা ছবি আঁকা শেষ হলেই এগজিবিশন শুরু করা যায়। শহরের দুটো বড় গ্যালারি খুব চাপ দিচ্ছে এগজিবিশনের জন্যে। কিন্তু নতুন কোনও আইডিয়া পছন্দ হচ্ছিল না বলে বেশ কয়েকটা ক্যানভাস বাতিল করেছে সে। একসময় কোনও গ্যালারি অনেক শিল্পীর ছবির সঙ্গে তার ছবি এগজিবিশনে রাখলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করত সংহিতা। সেসব দিন অনেক পিছনে ফেলে এসেছে সে। এখন কোন ছবি আঁকবে, কখন আঁকবে, কখন তার এগজিবিশন হবে তা সে নিজেই ঠিক করে। চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেছে এখানে পৌঁছোতে।

আঁকার ঘরের বাঁ দিকের দেওয়ালের অনেকটা জুড়ে একটা আয়না আছে। দামি আয়না, কোনও ফ্রেম নেই। ওর সামনে দাঁড়ালে সমস্ত ঘর চোখের সামনে এসে যায়। সংহিতা জেনেছে সরাসরি তাকালে ঘরটাকে যেমন দেখায় আয়নার দিকে তাকালে তা থেকে একটু আলাদা মনে হয়। ওই আলাদাটুকু উপভোগ করে সংহিতা।

এখন সাদা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করল সে। বব্ যা বলেছে তা আঁকলে ছবি কতটা অর্থবহ হবে? মনে মনে ছবিটাকে আঁকার চেষ্টা করল সে। মানুষগুলো জন্তুর মতো বেঁকে হেঁটে যাচ্ছে। দু'পাশে নিষ্পত্র গাছেদের ভিড়। মাথার ওপর ভয়ংকর আগুনের গোলা। সে মাথা নাড়ল। ঠিক জমছে না। কোথাও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সংহিতা আয়নার দিকে তাকাতেই নিজেকে দেখতে পেল। আপাদমস্তক নিরাভরণ শরীর। আয়নার শরীরে চিকচিকে আলো ছড়ানো। ঘরের আলো শরীরে ধাক্কা খেয়ে ওই কাণ্ড করেছে। সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখনও, এই আটান্নতেও শরীর যেন আটত্রিশেই থেমে গেছে। স্নানের ঘরের বাইরে নিজেকে এই প্রথম পুরোটা দেখতে পেল আজ। আচ্ছা, আপাদমস্তক বলে কেন? পা থেকে শুরু করে মাথায় পৌঁছোয়, কেন মাথা থেকে শুরু হয় না? নিজের কপাল নাক চিবুকে আঙুল ছোঁয়াল সংহিতা। হেসে ফেলল তখনই, এই মুখ কত দিন একই থেকে গেল।

ওপাশের ঘরে শব্দ হল। এগিয়ে গিয়ে আঁকার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল সংহিতা। তারপরেই দরজার ওপাশ থেকে সিক্তার গলা ভেসে এল, "দিদিমণি, আপনি কি এই ঘরে?"

"হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

"এত রাত্রে ঘুমোননি?"

"তুমি তো ঘুমিয়েছিলে, উঠলে কেন?"

"কী জানি। মনে হল কিছু হয়েছে। আপনি চিৎকার করছেন। তারপর শুনলাম ফোনে কথা বলছেন। তারপর দেখি এই ঘরের আলো জ্বলছে। আপনি ভাল আছেন তো?"

"হ্যাঁ। তুমি শুয়ে পড়ো। আলো নিভিয়ে দাও।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে আবার ক্যানভাসের সামনে ফিরে গেল সংহিতা। সিক্তা তাকে এই অবস্থায় দেখলে নির্ঘাত ধরে নিত সে পাগল হয়ে গেছে। বছর পাঁচেক আগে যখন সেন্টার থেকে ওকে পাঠিয়েছিল বাড়ির কাজের জন্যে তখন নাম বলেছিল, রিক্তা। বিরক্ত হয়েছিল সংহিতা। বলেছিল, "এই নামের কাউকে আমি বাড়িতে রাখব না। তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও তা হলে নাম বদলাতে হবে।"

"কেন?"

"আমি হাহাকার, হতাশা সহ্য করতে পারি না। নাম পালটাবে?"

"বলুন।"

"তোমার এখনকার নামের সঙ্গে মিল রেখে তোমাকে সিক্তা বলে ডাকব।"

"বেশ, ডাকবেন।"

কিছুদিনের মধ্যেই সংহিতা বুঝতে পারল মেয়েটি সুন্দর কাজকর্ম করে, হাতের রান্নাও ভাল কিন্তু কখনওই হাসে না। দম দেওয়া পুতুলের মতো সচল থাকে। শেষপর্যন্ত ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমার কি আমার এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

মুখ নিচু করেছিল সিক্তা, "আমি তো একবারও ভাবিনি।"

"কিন্তু আমার অসুবিধে হচ্ছে।"

"ও!"

"দেখো, তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার অশৌচ চলছে। কোনও প্রিয়জন চলে গেছে। তোমার বয়সের একটা মেয়ে যদি ওইরকম মুখ করে আমার সামনে ঘোরাফেরা করে তা হলে আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। আমি কি সেন্টারকে বলব তোমাকে বদলে দিতে?"

বলতে বলতে সংহিতা দেখল সিক্তার দু'চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল।

"কাঁদলে হবে না। কিছু বলার থাকলে বলো।"

"তা হলে সেন্টার আমাকে যেখানে পাঠাবে সেখানে পুরুষমানুষ থাকবে।"

"তাতে কী হবে?"

"আমি আপনার এখানে থাকতে চাই দিদি। পুরুষমানুষকে আমার খুব ভয়।"

"কেন?"

"বিয়ে করা বউ থাকা সত্ত্বেও ওরা আমার শরীরের দিকে হাত বাড়ায়। আপত্তি করলে আমার ওপরেই দোষ চাপায়।" ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল সিক্তা।

"কিন্তু আমার যে অসুবিধে হচ্ছে।"

সে আঁচলে জল মুছল, "আমাকে একটু সময় দিন দিদি।"

মাঝে মাঝে সংহিতার মনে হয় মেয়েটা অভিনয় করছে। হাসিখুশি হয়ে থাকার অভিনয়। ছটফটে পায়ে এঘর থেকে যে ওঘরে যাচ্ছে তা বোধহয় মন থেকে নয়। কিন্তু আর এই নিয়ে কথা বাড়ায়নি সে। ওর অতীত, ওর কষ্টের কাহিনি শুনতে চায়নি একবারও। খোঁড়াখুড়ি করলে যে-গরল উঠে আসবে তার স্বাদ নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

শূন্য ক্যানভাসের দিকে তাকাল সংহিতা। ছবিটাকে কল্পনা করতে গিয়ে হোঁচট খেল। এ কী ভাবছে সে? ওই মিছিল তো মানুষের মিছিল নয়। ওদের স্মৃতি একটা চলন্ত ট্রেনের দুলুনিতে আটকে যাচ্ছিল। তার মানে ওরা ট্রেনে চেপে কোথাও যাচ্ছিল। সেটা কোথায়, কোন ট্রেন তা আর মনে আসছে না। তা হলে কি সেই ট্রেনটা ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েছিল? লাইন তুবড়ে, চৌচির হয়ে যাওয়া কামরায় মানুষগুলোর প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল কিছু বোঝার আগেই? নিশ্চয়ই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে গিয়েছিল চারপাশে। তাদের শনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। কোনও কোনও দেহ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, জ্বালিয়ে দিতে হয়েছিল অনেকগুলোকে। সেইসব মৃত মানুষের আত্মারাই কি মিছিলে ছিল? সে নিজেও, স্বপ্নের মধ্যে সে নিজেকেও যা দেখেছে তা কি তারই আত্মা? আত্মা কি মরণের পরে জেগে ওঠে? জীবিত অবস্থায় মানুষের শরীরে আত্মা তো থাকেই নইলে ওই কথাটা চালু থাকবে কেন, আত্মারাম খাঁচাছাড়া! কিন্তু

সেই আত্মা মানবশরীরের ভেতরে নিরাপদে বাস করে। মৃত্যুর পরে যখন শরীর ধ্বংস হয় তখন সে বেআবরু হয়ে যায়। সেই আত্মার অস্তিত্ব যদি হিন্দুরা বিশ্বাস না করত তা হলে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করত না। শ্রাদ্ধ মানেই তো ইহলোক থেকে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া।

সেই শরীরবিহীন আত্মার অবয়ব কী হবে? মানুষের শরীর আঁকলে তো আত্মাকে বোঝানো যাবে না। ঘড়িতে সময় বাজল। ইচ্ছে করেই সময়-শব্দে-জানানো ঘড়িটাকে সংহিতা কিনে এনেছিল এক নিলামঘর থেকে। আওয়াজ কানে এলেই মনে হয়, সময় চলে যাচ্ছে, তোমার সময় ফুরোচ্ছে।

নাঃ। মাথায় আসছে না কিছু। সংহিতা ফিরে এল নিজের ঘরে। শুকনো একটা নাইটি বের করে শরীরে চাপিয়ে নিল। আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাবল বব্‌কে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়! বব্ তো সারাজীবন বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেছেন। তাদের কেউ-ই কি আত্মার ছবি আঁকেনি? নাঃ, বব্‌কে জিজ্ঞাসা করতে কোথায় যেন বাধছে। সম্পর্ক যতই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠুক ক্যানভাসে আঁকা ছবির ব্যাপারে বব্‌কে সে তার সমালোচক হিসেবে দেখতেই এতদিন অভ্যস্ত ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

আজ ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। এই দ্বিতীয়বারের ঘুমে কোনও স্বপ্ন দেখেনি সে। বাথরুম থেকে তৈরি হয়ে খাওয়ার টেবিলে আসতেই দেখতে পেল ইংরেজি-বাংলা কাগজ দুটো সযত্নে রাখা হয়ে গেছে। সিক্তা বলল, "গুড মর্নিং দিদি।"

মাথা নেড়ে চেয়ার টেনে বসে সংহিতা জবাব দিল, "গুড মর্নিং।"

"আবার ভাল ঘুম হয়েছে?"

আবার শব্দটা কানে বাজল। কথা না বলে মাথা নাড়ল সে। সিক্তা চলে গেল চায়ের পট আনতে। সকালবেলায় প্রথম দেখার সময় গুড মর্নিং বলাটা সে-ই চালু করেছিল। এখন মনে হচ্ছে না করলেই ভাল হত। প্রতিটি সকালে মনে হয় রোবট কথা বলছে।

চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজে চোখ বোলাল সে। প্রথম পাতা যেমন হয় সেরকম। মানুষ মানুষকে সহ্য করতে পারছে না। খুন, হামলা, শাসানো চলছে তো চলছেই। ছয় নম্বর পাতায় এসে থমকে গেল সে। এক কলমে খবরটা ছাপা হয়েছে। শিল্পী অনীশ সোমের জীবনাবসান। বাহাত্তর বছর বয়সে কিছুদিন

অসুখে ভুগে চলে গেছেন অনীশবাবু। তাঁর আঁকা ছবি দেশ-বিদেশে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। মাত্র সাত লাইনে খবরটা ছাপা হয়েছে। মন খারাপ হয়ে গেল সংহিতার। অনীশবাবুর জন্যে কী সাত লাইনের বেশি জায়গা দেওয়া যেত না? তার পরেই খেয়াল হল, ওদের দোষ দিয়ে লাভ কী, ভদ্রলোক যে অসুস্থ ছিলেন খবরটা তো তারও জানা ছিল না। অথচ তার আগের প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা নিজের ঘরানা তৈরি করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনীশ সোম অবশ্যই অন্যতম। এবং তখনই সংহিতার মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। অনীশ সোম ছবি আঁকতেন ফর্ম ভেঙে। তাঁর আঁকা মানুষের ছবি অদ্ভুত বাঁকাচোরা থাকত। নারীচরিত্র আঁকার সময় স্তন দুটিকে সূর্যের মতো ভয়ংকর দেখাতেন। মুখের গঠন ভাঙাচোরা। ওইভাবে আঁকতে আঁকতে এমন প্রচার পেয়েছিলেন যে, কেউ ফর্ম ভেঙে চেহারা পালটালেই দর্শকরা ভাবত অনীশ সোমের ছবি। কিছু বছর আগে ওঁর এগজিবিশনে গিয়েছিল সংহিতা গ্যালারির মালিকের আমন্ত্রণে। সেখানে অনীশ সোম বসেছিলেন। মাঝারি চেহারার মানুষটির মুখ দাড়িতে ঢাকা। টাঙানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে সংহিতার মনে হয়েছিল কেউ এগুলো কিনে বাড়ির দেওয়ালে টাঙাবে না। তবু ইদানীং ভাল দামে বিক্রি হচ্ছে ওঁর ছবি। যাঁরা ছবির ব্যাবসা করেন তাঁরা নাকি ভবিষ্যতে আরও বেশি দাম পাবেন ধরে নিয়ে কিনে থাকেন। ছবি দেখা শেষ হয়ে গেলে সংহিতাকে বসানো হল অনীশ সোমের পাশের চেয়ারে। অনীশ সোম হেসে বললেন, "কেমন দেখলেন গর্ভবতী জননীদের?" অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সংহিতা।

অনীশ সোম বললেন, "একটু আগে একজন বিদেশি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ছবির নারীরা মনে হয় গর্ভবতী অথচ তাদের মুখচোখ হিংস্র, শরীর ডিফর্মড, নিম্নাঙ্গ অযথা অনেক ভারী। কেন? কী বলব ভাই? জবাব দিয়েছিলাম, ওরা সবাই গর্ভবতী জননী। আমরা কেউ আমাদের জননীকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখিনি।"

হেসে ফেলেছিল সংহিতা, "মনে হচ্ছিল ওরা এই পৃথিবীরই, আবার তা বোধহয় নয়।"

"কারেক্ট। ওরা আমাদের ভেতরে বাস করে।"

পাশে বসে শুনছিলেন যে-ভদ্রলোক, জিজ্ঞাসা করলেন, "মানুষের আত্মা?"

"আপনার যা খুশি নাম দিতে পারেন।" অনীশ সোম মাথা নেড়েছিলেন।

আজ সকালে সংহিতার মনে হল, আমি যদি ওদের আত্মা বলি। যারা মাটির তলায় শরীর পচিয়ে গলিয়ে অথবা আগুনে শরীর জ্বালিয়ে ছাই হয়ে শেষপর্যন্ত এক অনন্তের দিকে যাত্রা শুরু করেছে তাদের চেহারা আঁকতে যদি অনীশ সোমের ফর্ম ব্যবহার করি তা হলে যথার্থ হবে। ছবি দেখে লোকে বলতেই পারে অনীশ সোমের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বলুক। উত্তরে বলা যাবে, এই ছবি অনীশ সোমের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য! এইসব ভেবে খুব তৃপ্ত হল সংহিতা।

চা-কাগজ শেষ করে সে চলে এল আঁকার ঘরে। ঢুকতেই আয়নার দিকে চোখ গেল। সেখানে আটান্ন বছরের সংহিতা তার রুচি এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ব্যতিক্রমী ব্যাপার নেই। অথচ এই আয়নায় গত রাতে তার পোশাকহীন শরীর ধরা পড়েছিল। আচ্ছা, আয়না যদি তার বুকে যেসব ছবি ফুটে ওঠে তার সবগুলো পরের পর ধরে রাখতে পারত? যেমন, তার এখনকার এই ছবি সরিয়ে দিলেই রাত্রের নগ্ন শরীর দেখা যেত! আহা!

বড় ছবি আঁকার আগে খাতায় ড্রইং করে নেওয়া সংহিতার দীর্ঘকালের অভ্যেস। অনেক শিল্পী সোজা ক্যানভাসে চলে যান। কিন্তু সংহিতার মন খুঁতখুঁত করে। পেনসিলে আঁচড় কাটা শুরু করল সে। অনীশ সোমের পুরুষ বা নারী যেরকম হয় তা তার আবিষ্কার করতে বোধহয় কয়েক বছর লেগেছিল, আবিষ্কার করার পর তারই সম্পত্তি হয়ে গেল। কিন্তু এখন সেরকম পুরুষ বা নারীকে আঁকতে কয়েক মিনিট খরচ হয়। দু'জনকে পাশাপাশি আঁকল সংহিতা। যাঁরা সামান্য খোঁজখবর রাখেন তাঁরা এই দুটিকে দেখলেই বলে দেবেন অনীশ সোমের আঁকা ছবি। যেমন তার নিজের ছবিতে যে-টান এবং রঙের ব্যবহার আছে, নারীচরিত্রের চিবুকের যে-আদল তা যাঁরা জানেন তাঁরা তার নাম বলতে ভুল করবেন না। বিকাশ ভট্টাচার্যের দুর্গা সিরিজের পর আর কার সাহস হবে আটপৌরে মেয়ের কপালে চোখ আঁকার? কিন্তু এই দুটো যতই ডিফর্মড হোক, এদের আত্মা বলে কি মনে হচ্ছে? প্রথম কথা হল আত্মার শরীর যেমন থাকে না তেমনই তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে। সেই ক্ষমতা কি মন ছাড়া সম্ভব?

গোটা সকাল ওই ফর্মভাঙা ফিগারগুলো নিয়ে গবেষণা করে গেল সংহিতা।

কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। শেষপর্যন্ত উঠে পড়ল সে। ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে। তার আগে কয়েকটা আসন করে না নিলে পৃথিবীর সব আলস্য শরীরে ভর করবে।

ব্রেকফাস্টে ফল, ডিমসেদ্ধ, একটা সেঁকা পাউরুটি আর কালো কফি খেতে পছন্দ করে সংহিতা। মাঝে মাঝে সিক্তা মেনু পালটায়। ডিম-পাউরুটির বদলে কর্নফ্লেক্স-দুধ। আজ হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল, "দিদি, একটু অন্যরকম খাবেন?"

"কীরকম?"

"গরম গরম লুচি আর আলুর চচ্চড়ি।"

"ওরে বাব্বা! ওসব খেলে আর দেখতে হবে না। প্রথমত, অ্যান্টাসিড খেতে হবে, তারপর ওজন বাড়বে।" সংহিতা না হেসে পারল না।

"কিস্যু হবে না। মাসে একদিন খেলে জিভের স্বাদ বদলাবে। আপনি শেষ কবে লুচি খেয়েছেন ভেবে দেখুন?" সিক্তার গলায় আবদার।

সংহিতা মাথা নাড়ল, "না না। ওসব করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

"একদম না। ঠিক দশ মিনিটে টেবিলে দিয়ে দেব।"

"বেশ, বলছ যখন।" বলেই খেয়াল হল, "শোনো, আলুর চচ্চড়ি নয়, তুমি চাকাচাকা করে আলু ভেজে দাও, সঙ্গে নুন আর কাঁচালঙ্কা।"

"ওরকম শুকনো শুকনো খেতে পারবেন?"

"ছেলেবেলার প্রত্যেক রবিবারে ওটাই খেতাম।"

সিক্তা দ্রুত চলে গেল। এই যে একটু নিয়মের বদল হল তাতেই মেয়েটা খুশি হয়ে গেল। এই খুশিটা কি বানানো? অভিনয়? সংহিতার মনে হল সিক্তা আজ স্বাভাবিক।

রবিবার সকালের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত ওরা। সংহিতা আর তার দুই খুড়তুতো ভাই। সকাল ন'টায় কাকিমা ময়দা মেখে লুচি বেলতে শুরু করতেন, মা ভাজতেন। প্রথম ভাজা লুচিগুলো যেত বাবা-কাকার জন্যে। তারপর তাদের দেওয়া হত। লুচি ভাজার গন্ধে পড়াশুনো থেমে যেত অনেকক্ষণ। ডাক আসামাত্র তিনজনে ছুটত। চারটের বেশি লুচি দেওয়া হত না তাদের। সঙ্গে চার পিস আলু চাকা করে ভাজা। পাশে একটু নুন। সেই বয়সটায় লঙ্কা খাওয়ার সাহস হত না। তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে বলে সে প্রতিটি লুচি

তিন টুকরো করে খেত। শেষেরটা শুধু নুন দিয়ে খাওয়া। তাই অমৃত বলে মনে হত।

যখন বোঝার বয়স এল তখন জেনেছিল ওইভাবে আলু ভাজলে পরিশ্রম যেমন কম হয়, খরচও। যেহেতু বাবার মাঝারি রোজগারের সঙ্গে কাকার সামান্য রোজগার মিললেও সংসারের সব হাঁ-মুখ বন্ধ করা যেত না তাই রবিবারের ব্রেকফাস্টে লুচি খাওয়াকে খানিকটা বিলাসিতাই বলা যেতে পারত। তাদের চারটের বেশি লুচি দিলে মা-কাকিমারা বঞ্চিত হতেন। এখন ওসব কথা ভাবলেই বুকে চাপ আসে। হাড়গুলো কনকনিয়ে ওঠে। তখন বোঝার বয়স ছিল না, আজ কিছু করার সুযোগ নেই। তবু আজ সিক্তার কথা শুনে সেই সকালগুলো উঠে এল তার সামনে।

"দিদি, হয়ে গেছে, আসুন।" সিক্তার ডাক শুনে টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে দেখতে পেল বড় চিনেমাটির সাদা প্লেটের একপাশে একটা কাঁচালঙ্কা রাখা আছে, পাশের পাত্রে ফুলকো লুচির পাহাড়। চেয়ার টেনে নিয়ে সংহিতা বসল, "সিক্তা, আমাকে ঠিক চারটে লুচি দেবে।"

"ওমা! কেন?" চোখ বড় করল সিক্তা।

"তার কারণ আমি ঠিক চারটে লুচি খাব।"

"দিদি, লুচিগুলো দেখুন, একদম বড় নয়।"

"আমি যা বলছি তাই তোমার করা উচিত।"

বাধ্য হয়ে চারটে লুচি প্লেটে রাখল সিক্তা, হাতায় তুলল অনেকগুলো আলুভাজা।

"না। ঠিক চারটে দেবে।" সংহিতা তাকে থামাল।

"মাত্র চারটে?"

"ঠিকই শুনেছ।"

চারটে আলুভাজা প্লেটে রাখল সিক্তা ঠোঁট টিপে। সংহিতা হাত বাড়িয়ে লবণের পাত্রটা টেনে নিল। সিক্তা জিজ্ঞাসা করল, "কফি করি?"

"না। আজ চা দাও।"

সিক্তা তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিচেনে চলে গেল কিন্তু লুচি এবং আলুভাজার পাত্রগুলো নিয়ে গেল না। মজা লাগল সংহিতার। এই চারটে লুচি তখনও এরকমই দেখতে ছিল। নুন মাখিয়ে মুখে পোরার আগে ভাবল ছিঁড়ে তিন টুকরো করবে কিনা। হাসল সে। তখন চারটের বেশি হাজারবার

চাইলেও পাওয়া যেত না। এখন না চাইলেও টেবিলে অনেক লুচি মজুদ রয়েছে।

মন অনেক কিছু ভুলে যায় অথবা ভুল করে। কিন্তু শরীর যেসব স্বাদে আমোদিত হয় তা আমৃত্যু মনে রাখে। লুচি এবং আলুর মিশ্র স্বাদ জিভে পৌঁছোনোমাত্র সেই ছেলেবেলার রবিবারের সকালগুলো ঝিমঝিম করতে লাগল মনে। আঃ। একই স্বাদ, একই গন্ধ। তখন এসব খেলে অ্যান্টাসিড লাগত না, এখন লাগতে পারে বলে ভয় হয়। তখন লুচি শেষ করেই জলের গ্লাস ধরত। আজ জল খাবে না বলে ঠিক করল সংহিতা।

চা নিয়ে এসে সিক্তা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লঙ্কা খেলেন না দিদি?"

প্লেটের দিকে তাকাল সংহিতা। ওটার কথা মাথাতেই ছিল না। ছেলেবেলার অভ্যেসটা হুড়মুড়িয়ে চলে এসেছিল বলে লঙ্কার দিকে তাকায়নি। বরং শেষ লুচিটা টুকরো করে শুধু নুন দিয়ে খেয়েছে।

"খাওয়া হল না।"

সিক্তা নিশ্চয়ই অবাক হবে। সে দেখেছে খাওয়ার সময় সংহিতার লঙ্কা না হলে চলে না। প্রায়ই অনুযোগ করে, "কোথায় এই লঙ্কাগুলো পাও? একটুও ঝাল নেই!" কাল বিকেলে বাজার থেকে এসে বলেছিল, "আজকের লঙ্কায় খুব ঝাল পাবেন।" কিন্তু ও তো বুঝবে না কেন তার লঙ্কা খাওয়ার কথা মনে আসেনি।

এখন মা বা কাকিমা নেই। বাবা এবং কাকাও চলে গেছেন। তাঁদের কথা মনে পড়ে এইভাবেই। যেমন লুচি আলুভাজার গন্ধে ওঁরা যেন তার সামনে এসে বসলেন। তা হলে এই যে সে ব্রেকফাস্ট করল ওঁদের প্রিয় খাবার দিয়ে তার খবর কি জেনেছেন ওঁরা? যদি ভাবতে ভালবেসে ধরে নিই, জেনেছেন, তা হলে তাঁদের আত্মায় একটা মন আছে। সংহিতা আঁকার ঘরে চলে এল। স্কেচবুকটা নিয়ে সকালে আঁকা ফিগারগুলো পাল্টাতে লাগল। একটা বড় বেঢপ ঊর্ধ্বাঙ্গ যার ভেতরে মন রয়েছে, ঊর্ধ্বাঙ্গের ওপর ছোট্ট মুন্ডু যার একটাই চোখ, নিম্নাঙ্গে গোলাকার জালা, তার তলায় দুটি হাঁসের পা। নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে সংহিতা পুরুষদের ঊর্ধ্বাঙ্গ রুগ্ণ করে নিম্নাঙ্গ তার সঙ্গে মানানসই করে ফেলল। নারীদের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত। তাদের মন যেমন বড়, নিম্নাঙ্গও বিশাল। এটা করার পর সে বুঝতে পারল অনীশ সোমের ভাবনা এদের মধ্যে নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাললাগা তৈরি

হয়ে গেল। আর তার ফলেই আলস্য শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রইংরুমের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, এখন এরাই হবে তার সঙ্গী। আত্মার চেহারা যদি এরকম হয় তা হলে মন্দ কী!

পরপর অনেকগুলো, অনেক রকম আত্মার স্কেচ করার পর তার মনে পড়ল পাশে হাঁটা সেই উদ্ধত লোকটার কথা। লোক না বলে পুরুষাত্মা বলাই সঠিক। এই, তুই তো মেয়েমানুষ। হা হা হা। এরকম কথা যে বলতে পারে তার মুখের আদল নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে। কিছুক্ষণ লোকটাকে আঁকার চেষ্টা করে যখন মনমতো হচ্ছিল না তখন খেয়াল হল, দরকার কী! আত্মাদের কারও মুখ তো দেখা যাওয়ার কথা নয়। সবাই মুখ নিচু করে শরীর সামনে বেঁকিয়ে হাঁটছে। বরং এই আত্মার মাথার ওপর যে-একমাত্র চোখ সেটা আধখোলা থাক।

এসব করতে করতে যে দুপুর চলে এসেছে তা শব্দ-ঘড়ি জানিয়ে দিল। স্কেচবুক রেখে আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সিক্তা দাঁড়িয়েছিল বাথরুমের দরজার সামনে, জিজ্ঞাসা করল, "গিজার অন করে দেব?"

"একটু পরে।"

এটা ওর অভ্যেস। শীতকালে তো বটেই, গরমের সময়েও ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করলে শরীরটা চাঙ্গা থাকে। শোওয়ার ঘরের টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলে নিয়ে সে জিভে শব্দ করল। আটটা মিস্‌ড কল। যেহেতু সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল তাই শব্দ শোনা যায়নি। প্রথম ফোনটা এসেছিল সকাল আটটায়, লীনা ফোন করেছিল। তারপর গ্যালারি সি থেকে তিনবার। নতুন গ্যালারি, প্রচুর সাজিয়েছে। মালিক ছেলেটি অল্পবয়সি। তার পিছনে লেগে আছে এগজিবিশনের জন্যে। তার পরের ফোনটা করেছিলেন হিমাদ্রি সেনগুপ্ত। প্রবীণ শিল্পী। সে নম্বরটা টিপল। রিং হচ্ছে ওপাশে। হ্যালো শব্দটা কানে আসতেই সংহিতা বলল, "আমি সংহিতা বলছি, আপনি ফোন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তুমি দেশেই আছ তো?"

হেসে ফেলল সংহিতা, "হ্যাঁ। আছি।"

"তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ অনীশ আর আমাদের মধ্যে নেই!"

"হ্যাঁ। কাগজে পড়লাম।"

"ও! তা সে তো আমাদেরই একজন ছিল। আমরা ওকে নিয়ে একটু

কথাবার্তা বলব, শ্রদ্ধা জানাব। তুমি কি আসতে পারবে?" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

"নিশ্চয়ই যাব।"

"তা হলে কোথায় হচ্ছে তা জেনে নিয়ো।"

"আমি আপনাকে ফোন করব।"

"ভাল থেকো ভাই।"

"আপনিও ভাল থাকবেন।" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত ফোনটা রেখে দিলে সংহিতার খেয়াল হল, ওঁর বয়স আশির অনেক ওপরে। অনীশবাবু ওঁর অনুজ ছিলেন। কীরকম একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। আচ্ছা, হিমাদ্রি সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার চেহারা কেমন হবে!

হিমাদ্রি সেনগুপ্তের পরে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। দশ মিনিটের মধ্যে তিনবার। নম্বরটা কার তা বুঝতে পারল না সংহিতা, সে মোবাইল নামিয়ে রাখল। অচেনা নম্বরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে হবে, "আপনি কে!" তার চেয়ে যার এত প্রয়োজন সে নিশ্চয়ই আবার ফোন করবে। সিক্তাকে গিজার অন করে দিতে বলে টুকটাক কাজগুলো সেরে নিতে নিতে সংহিতার মনে হল আজ অনীশবাবুর বাড়িতে তার যাওয়া উচিত। কিন্তু বাড়িটা কোথায় তা সে জানে না। অবশ্য যে-কোনও গ্যালারিকে ফোন করলে ঠিকানা পেতে অসুবিধে হবে না। সকালে কখনও বের হয় না সে, ড্রাইভারকে বলা আছে ঠিক বারোটায় আসতে। রাত দশটা পর্যন্ত তার ডিউটি। যদি সে না বের হয় তবু ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে হবে নীচে। আগে দরকার না থাকলে দুপুরেই ছেড়ে দিত। কিন্তু একদিন ছেড়ে দেওয়ার পর বিকেলে আচমকা খুব প্রয়োজন হল বাইরে যাওয়ার। তখন ড্রাইভার নেই। ফোন করে শুনেছিল তার মোবাইলের সুইচ অফ। সেই থেকে ড্রাইভারকে ডিউটিতে থাকতে হচ্ছে দশ ঘণ্টা।

বাথরুমে যাওয়ার সময় মোবাইল জানান দিল। বিরক্তমুখে ওটা তুলে নম্বর দেখল সংহিতা। সেই অচেনা নম্বর যা থেকে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। সে বোতাম টিপে জিজ্ঞাসা করল, "কে বলছেন?"

চার কি পাঁচ সেকেন্ড নীরবতা। পাঁচ সেকেন্ডে পঞ্চাশ গজ দৌড়ে যায় পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ। তারপর গলা শোনা গেল, "সংহিতা কি?"

"আপনি কে বলছেন।?"

হয়ে গেল। আর তার ফলেই আলস্য শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রইংরুমের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, এখন এরাই হবে তার সঙ্গী। আত্মার চেহারা যদি এরকম হয় তা হলে মন্দ কী!

পরপর অনেকগুলো, অনেক রকম আত্মার স্কেচ করার পর তার মনে পড়ল পাশে হাঁটা সেই উদ্ধত লোকটার কথা। লোক না বলে পুরুষাত্মা বলাই সঠিক। এই, তুই তো মেয়েমানুষ। হা হা হা। এরকম কথা যে বলতে পারে তার মুখের আদল নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে। কিছুক্ষণ লোকটাকে আঁকার চেষ্টা করে যখন মনমতো হচ্ছিল না তখন খেয়াল হল, দরকার কী! আত্মাদের কারও মুখ তো দেখা যাওয়ার কথা নয়। সবাই মুখ নিচু করে শরীর সামনে বেঁকিয়ে হাঁটছে। বরং এই আত্মার মাথার ওপর যে-একমাত্র চোখ সেটা আধখোলা থাক।

এসব করতে করতে যে দুপুর চলে এসেছে তা শব্দ-ঘড়ি জানিয়ে দিল। স্কেচবুক রেখে আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সিক্তা দাঁড়িয়েছিল বাথরুমের দরজার সামনে, জিজ্ঞাসা করল, "গিজার অন করে দেব?"

"একটু পরে।"

এটা ওর অভ্যেস। শীতকালে তো বটেই, গরমের সময়েও ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করলে শরীরটা চাঙ্গা থাকে। শোওয়ার ঘরের টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলে নিয়ে সে জিভে শব্দ করল। আটটা মিস্‌ড কল। যেহেতু সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল তাই শব্দ শোনা যায়নি। প্রথম ফোনটা এসেছিল সকাল আটটায়, লীনা ফোন করেছিল। তারপর গ্যালারি সি থেকে তিনবার। নতুন গ্যালারি, প্রচুর সাজিয়েছে। মালিক ছেলেটি অল্পবয়সি। তার পিছনে লেগে আছে এগজিবিশনের জন্যে। তার পরের ফোনটা করেছিলেন হিমাদ্রি সেনগুপ্ত। প্রবীণ শিল্পী। সে নম্বরটা টিপল। রিং হচ্ছে ওপাশে। হ্যালো শব্দটা কানে আসতেই সংহিতা বলল, "আমি সংহিতা বলছি, আপনি ফোন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তুমি দেশেই আছ তো?"

হেসে ফেলল সংহিতা, "হ্যাঁ। আছি।"

"তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ অনীশ আর আমাদের মধ্যে নেই!"

"হ্যাঁ। কাগজে পড়লাম।"

"ও! তা সে তো আমাদেরই একজন ছিল। আমরা ওকে নিয়ে একটু

কথাবার্তা বলব, শ্রদ্ধা জানাব। তুমি কি আসতে পারবে?" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

"নিশ্চয়ই যাব।"

"তা হলে কোথায় হচ্ছে তা জেনে নিয়ো।"

"আমি আপনাকে ফোন করব।"

"ভাল থেকো ভাই।"

"আপনিও ভাল থাকবেন।" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত ফোনটা রেখে দিলে সংহিতার খেয়াল হল, ওঁর বয়স আশির অনেক ওপরে। অনীশবাবু ওঁর অনুজ ছিলেন। কীরকম একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। আচ্ছা, হিমাদ্রি সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার চেহারা কেমন হবে!

হিমাদ্রি সেনগুপ্তের পরে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। দশ মিনিটের মধ্যে তিনবার। নম্বরটা কার তা বুঝতে পারল না সংহিতা, সে মোবাইল নামিয়ে রাখল। অচেনা নম্বরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে হবে, "আপনি কে!" তার চেয়ে যার এত প্রয়োজন সে নিশ্চয়ই আবার ফোন করবে। সিক্তাকে গিজার অন করে দিতে বলে টুকটাক কাজগুলো সেরে নিতে নিতে সংহিতার মনে হল আজ অনীশবাবুর বাড়িতে তার যাওয়া উচিত। কিন্তু বাড়িটা কোথায় তা সে জানে না। অবশ্য যে-কোনও গ্যালারিকে ফোন করলে ঠিকানা পেতে অসুবিধে হবে না। সকালে কখনও বের হয় না সে, ড্রাইভারকে বলা আছে ঠিক বারোটায় আসতে। রাত দশটা পর্যন্ত তার ডিউটি। যদি সে না বের হয় তবু ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে হবে নীচে। আগে দরকার না থাকলে দুপুরেই ছেড়ে দিত। কিন্তু একদিন ছেড়ে দেওয়ার পর বিকেলে আচমকা খুব প্রয়োজন হল বাইরে যাওয়ার। তখন ড্রাইভার নেই। ফোন করে শুনেছিল তার মোবাইলের সুইচ অফ। সেই থেকে ড্রাইভারকে ডিউটিতে থাকতে হচ্ছে দশ ঘণ্টা।

বাথরুমে যাওয়ার সময় মোবাইল জানান দিল। বিরক্তমুখে ওটা তুলে নম্বর দেখল সংহিতা। সেই অচেনা নম্বর যা থেকে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। সে বোতাম টিপে জিজ্ঞাসা করল, "কে বলছেন?"

চার কি পাঁচ সেকেন্ড নীরবতা। পাঁচ সেকেন্ডে পঞ্চাশ গজ দৌড়ে যায় পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ। তারপর গলা শোনা গেল, "সংহিতা কি?"

"আপনি কে বলছেন।?"

"আমি, আমি জয়ব্রত। মনে আছে? হা-হা-হা।"

চোখ ছোট হল সংহিতার। গলা অচেনা লাগছে কেন? জিজ্ঞাসা করল, "কোন জয়ব্রত?"

আরও কিছুক্ষণ কথা নেই। তারপর লাইনটা বিচ্ছিন্ন হল। সংহিতা বুঝল ওপাশ থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে ওটা রেখে বাথরুমে চলে গেল সংহিতা। পোশাক ছেড়ে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে কল খুলে দিল। হুড়মুড়িয়ে জল পড়তে লাগল মাথায়, শরীরে। তার পরেই খেয়াল হল জলটা এখনও গরম হয়নি তবে ঠান্ডার ঝাঁঝটা কমে গেছে। প্রতিদিন সে আর-একটু গরম জলে স্নান করে। চুলোয় যাক প্রতিদিনের অভ্যেস। জয়ব্রত! না, তার গলা চিনতে ভুল হয়নি। যতই বয়স স্বরটাকে অচেনা করুক শোনামাত্র সংহিতার মনে হয়েছে এ সে-ই। হঠাৎ, এতদিন পরে, কতদিন? চট করেই সময়ের ব্যবধান স্পষ্ট হল, তিরিশ বছর। তিরিশ বছর আগে কেউ যদি গভীর নদীতে ডুব দিয়ে হারিয়ে যায় এবং তিরিশ বছর পরে জলের ওপরে মাথা তুলে নিজের নাম উচ্চারণ করে তা হলে তাকে চিনতে হবে কেন? জলের ওপরে যেমন অনেক ধুলো ওড়ে, সেই ধুলো আড়াল করে দেয় সবুজ তেমনি জলের নীচেও শ্যাওলা জমে যা শরীরকে আঁশটে গন্ধে অচেনা করে দেয়।

আমি জয়ব্রত! কোন সাহসে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল লোকটা! তারপর ওই হাসি! মনে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে ওরকম হাসির কারণ কী! ব্যঙ্গ করা? ব্যঙ্গ করতে হলে ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে হয়। ওই হাসি সে শুনেছে। হ্যাঁ, এই তো গতকালই এই, তুই তো মেয়েমানুষ। হা হা হা। অবিকল। ওই উদ্ধত আত্মার সঙ্গে মোবাইলে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরের কোনও পার্থক্য নেই। চোখ বন্ধ করল সংহিতা। শাওয়ারের জল তার সর্বাঙ্গ সিক্ত করে নীচে নেমে যাচ্ছে। আঃ, কী শান্তি!

গ্যালারি থেকে বাড়ির নম্বর নিয়ে যখন সংহিতার গাড়ি অনীশ সোমের বাড়ির সামনে পৌঁছোল তখন সেখানে কোনও মানুষ নেই। এমনকী বাড়ির বাইরের দরজাও আধভেজানো। গাড়ি থেকে নেমে ইতস্তত করলেও সংহিতা এগিয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে আধভেজানো দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভেতরটা দেখতে পেল। একজন প্রবীণা মহিলা পিছনে শরীর হেলিয়ে বসে

আছেন চোখ বন্ধ করে। সংহিতা দরজায় শব্দ করতেই তিনি ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। সংহিতা খুব নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ভেতরে আসতে পারি?"

"হ্যাঁ।" প্রৌঢ়া নিজেকে গুছিয়ে নিলেন।

ভেতরে ঢুকে সংহিতা বলল, "আমার নাম সংহিতা। অল্পস্বল্প ছবি আঁকি।"

"ও! কিন্তু ওরা এখনও শ্মশান থেকে ফিরে আসেনি। নার্সিংহোম থেকে আনতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর এখানে একে একে ওরা জড়ো হয়েছিল অনেক সময় ধরে। বলা যায় না, শ্মশানে গেলে ওকে দেখলেও দেখতে পেতে পারেন।" প্রৌঢ়া কেটে কেটে কথাগুলো বললেন।

"কাগজে খবরটা পড়ে আমি ভেবেছিলাম ওসব অনেক আগেই হয়ে গেছে। নইলে সকালেই আসতে পারতাম। ঠিক কী হয়েছিল অনীশবাবুর?"

"আপনি দেখছি ওকে বাবু বলছেন। সবার মুখে তো অনীশদাই শুনি। অতিরিক্ত মদ্যপানে যেসব অসুখ হয় তার কয়েকটা একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল দিন সাতেক আগে। তা ডাক্তাররা আর কী করবে? সবক'টাকে তো একসঙ্গে সামলানো যায় না।" মাথা নাড়লেন প্রৌঢ়া।

"ওঃ।" সংহিতার গলা থেকে আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

"আজ জনা তিনেক মহিলা ওঁর শরীরের পাশে বসে খুব কান্নাকাটি করেছে। ওদের দু'জন নাকি ছবি আঁকে, একজন কবিতা লেখে।" প্রৌঢ়া বললেন।

"আপনি কি অনীশবাবুর স্ত্রী?"

"ছিলাম। আমাদের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভাই, আপনি যা বুঝছি তাতে মনে হচ্ছে ওঁকে দেখতে আসেননি। অর্থাৎ দেখার টান অন্য তিন মহিলার মতো আপনার মনে ছিল না। তা হলে কী কারণে এখন এসেছেন?" প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন।

সংহিতা লক্ষ করছিল প্রৌঢ়া কথা বলছেন আর তাঁর বাঁ হাতটা সমানে কেঁপে যাচ্ছে। তাকে বসতে বলার কথাও ওঁর বোধহয় খেয়ালে নেই।

সে নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার যদি খুব আপত্তি না থাকে তা হলে একটু কি বসতে পারি?"

"হ্যাঁ। বসুন। আজকাল আমার কথা বলতে একটুও ইচ্ছে হয় না। তা

অনীশের সঙ্গে আপনার কি অনেকদিনের পরিচয়?”

“আলাপ হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। দেখা হয়েছে সাকুল্যে তিন কি চারবার। তার মধ্যে বেশি কথা হয়েছিল শেষবার যখন আমি ওঁর এগজিবিশনে যাই। আমি আপনাদের বাড়িতে এসেছি কারণ একজন শিল্পী চলে গিয়েছেন যিনি একটি আলাদা ধারা তৈরি করেছিলেন। যে-ঘরে তিনি ছবি আঁকতেন সেখানে একটু দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার জন্যে প্রার্থনা করে যেতে চেয়েছি।” সংহিতা বলল।

“কিন্তু উনি তো মৃত্যুর পর আত্মা আছেন বলে বিশ্বাসই করতেন না। বলতেন, যাদের আমরা আত্মা বলি তারাই নাকি এখন পৃথিবীতে মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই ওঁর ছবির মানুষের চেহারা ভাঙাচোরা, মেয়েদের শরীরের মেয়েলি অংশগুলো বড় উৎকট।”

হঠাৎ মনে হতেই সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, “আপনি আপনার শাশুড়িকে দেখেছেন?”

“কী করে দেখব! শুনেছি ওকে জন্ম দিয়েই তিনি গত হয়েছিলেন। কিছুদিন ধরে ওর একটা বাতিক শুরু হয়েছিল। নিজের গর্ভধারিণীকে প্রসবের আগের স্টেজে কীরকম দেখতে লাগত তাই কল্পনা করে আঁকার চেষ্টা করত। আমার মনে হত ব্যাপারটা খুব বিকৃত রুচির প্রকাশ। কিন্তু কিছু বলিনি। ওকে কিছু বলাই ছেড়ে দিয়েছিলাম বহু বছর ধরে।”

“কেন?”

“আমাকে সারাজীবন ধরে ভালবাসতে হবেই এমন মাথার দিব্যি ওকে কখনও দিইনি। কিন্তু যে-মেয়ে ওর সংস্পর্শে আসবে তাকে ভাল না লাগলেই সম্পর্ক ত্যাগ করবে কেন? আর বেশি দিন যে ভাল লাগবে না তা ওর জানা ছিল। তা হলে সম্পর্ক তৈরি করা কেন? বললে বলত, আমার আত্মা যেমন চাইছে তেমন করছি। বাহানা!”

সংহিতা প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল, “আপনি কি অনীশবাবুকে মিস করছেন না?”

“মিস করতে করতে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে আছি ভাই।”

সংহিতা বলল, “ওঁর আঁকার ঘরে একবার যেতে পারি?”

“যাবেন? যান। ওই সিঁড়ি দিয়ে ডান দিকের দরজা।” আঙুল তুলে দেখালেন প্রৌঢ়া।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল সংহিতা। সব আছে। তুলি, রং, পেনসিল, ক্যানভ্যাস কিন্তু কোনও ছবি নেই। না দেওয়ালে না টেবিলে। ঘরটাকে খুব ক্যাটকেটে দেখাচ্ছে বললে কম বলা হবে, খাঁ-খাঁ করছে। দ্রুত নীচে নেমে এল সংহিতা, "ওখানে তো কোনও ছবি নেই!"

"থাকবে কী করে? যে-কয়েকটা ছিল, নার্সিংহোমে যাওয়ার আগে সেগুলো গ্যালারিকে দিয়ে গেছে বিক্রি করার জন্যে। গ্যালারির মালিক আজ ফুল নিয়ে এসেছিল। বলে গেল, খুব শিগ্‌গির এগজিবিশন করবে। শোনো ভাই, আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।"

মাথা নাড়ল সংহিতা। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করলে সে অনীশ সোমের মুখটা ভাবল। এত সব শোনার পরেও লোকটার ওপর রাগ, বিতৃষ্ণা অথবা বিরক্তি হচ্ছে না কেন? আর পাঁচটা মানুষের মতো না হয়ে তিনি নিজের মতো বেঁচেছিলেন বলে? নিজেকেও তা হলে আত্মা বলেই মনে করতেন। সংহিতা জানলার বাইরে তাকাল। ছুটন্ত ফুটপাথ ধরে যারা হাঁটছে তারা সবাই আত্মা? পৃথিবী থেকে লীন হয়ে যাওয়ার আগে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য! মানুষ নিজেকে আত্মা মনে করে বলেই তো ঈশ্বরকে নাম দিয়েছে পরমাত্মা। এই আত্মাদের ছবি আঁকার সময় অনীশ সোম যেমন পারেন তেমন বিকৃত ভঙ্গি করেছেন। গর্ভধারিণীকে প্রসবের আগে আঁকতে চেয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ গর্ভধারিণীর গর্ভে যে ছিল সে আত্মা হয়ে জন্মেছে। জন্মেই জন্মদাত্রীকে মৃত অবস্থায় দেখেছে। শ্বাস ফেলল সংহিতা।

তখনই তার মনে এল গত রাতের স্বপ্নটা। সে তো নিজের আত্মাকেও দেখেছে। প্রথমে শায়িত অবস্থায়, তারপর আলোর ঢেউয়ে টালমাটাল হতে, মাটিতে দুটো পা আটকে যেতে, তারপর মিছিলে শরীর বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতে। তখনও শুনতে হয়েছিল, "তুই তো মেয়েমানুষ! হা হা হা।" অর্থাৎ আত্মার পর্যায়ে গেলেও মেয়েমানুষ বলে তাকে চেনা গিয়েছিল? হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ব্রেক চাপল ড্রাইভার। অল্পের জন্যে মাথা ঠুকল না সংহিতার। ড্রাইভার চিৎকার করল, "এই ঘাটের মড়া, এখানে মরতে এসেছিস কেন?"

বিরক্ত হল সংহিতা, "কী করে চালাচ্ছ?" ধমক দিল সে।

"কী করব দিদি! বলা নেই কওয়া নেই হুট করে সামনে চলে এসেছে। কিছু হলে পাবলিক তো আমার দোষ দেবে!" ড্রাইভার গজগজ করছিল।

যে চাপা পড়তে যাচ্ছিল তার বয়স বোঝা মুশকিল। কাঁপতে কাঁপতে জানলার পাশে এসে ড্রাইভারকে বলল, "ঠিক বলেছ ভাই। আমি ঘাটের মড়া। মরে ঘাটে বসে আছি। আমি কি বেঁচে আছি যে চোখ মেলে চলব!"

ড্রাইভার কথা না বলে গাড়ি চালু করল। সংহিতার কানে কথাগুলো কিছুক্ষণ সেঁটে রইল। ওরকম শুকিয়ে যাওয়া শরীর, কোটরে ঢুকে থাকা চোখ, এই লোকটির আত্মাও মরে গেছে।

আজ রুটিন বদলাল সংহিতা। বাড়িতে ফিরে এসে এক কাপ চা খেয়ে পড়ার ঘরের বদলে আঁকার ঘরে ঢুকে গেল সে। ড্রইংবুকটায় কিছুক্ষণ চোখ রাখার পর সরাসরি ছবি আঁকা শুরু করল। ঘণ্টাখানেক আঁকার পর মনে হল, কিছুই হচ্ছে না। তার ছবির ফিগারগুলো যেন ক্রীতদাসের মতো ঝুঁকে হাঁটছে। এইটে সে চায় না। আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সংহিতা।

রাতের খাওয়া শেষ হলে সিক্তা এসে দরজার পাশে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যে, সংহিতার মনে হল ও কিছু বলতে চায়। সে জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার?"

"দেশ থেকে খবর এসেছে। কী করব বুঝতে পারছি না দিদি।" সিক্তা মুখ নামাল।

"কী খবর?"

"কাল রাত্রে সে মারা গিয়েছে।" ঠোঁট কামড়াল সিক্তা।

"কে?"

"যার সঙ্গে আমি ঘর ছেড়েছিলাম।"

আবার একটা কাহিনি শুনতে হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় থাকত সে?"

"ঝাড়গ্রামে।"

"তা হলে তো তোমারও সেখানেই থাকার কথা।"

"থাকতে পারিনি। এক বছরের মধ্যে ভুল ভেঙে গিয়েছিল। ঝাড়গ্রামে ট্যাক্সি চালাত সে। আমাদের বিয়ে হয়নি কিন্তু পাঁচজনের জন্যে সিঁদুর পরতে হত। দু'বছরের মাথায় সিঁদুর মুছে ফেলেছিলাম। তখন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে

যাওয়ার উপায় ছিল না। কল্পনাদি আমাদের পাড়ায় থাকতেন। স্কুলে পড়ান। তাঁকে সব বলেছিলাম। তিনি আমাকে এখানে ওঁর বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। কল্পনাদির বাবা অসুস্থ হলে ওঁরা মেয়ের কাছে চলে যান। ততদিনে আমার সঙ্গে সেন্টারের জানাশোনা হয়ে গিয়েছিল। ওরা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিল।" ধীরে ধীরে কাহিনি শোনাল।

"শ্বশুরবাড়ি ছাড়লে কেন?"

"ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার বুদ্ধি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো। খেতে কাজ করত কিন্তু ভাইরা একটা পয়সাও দিত না। যে-ভাইয়ের বউ বাপের বাড়িতে যেত সেই ভাই রাত্রে আমাকে তার ঘরে ডাকত। আমি আর পারছিলাম না। তখন এর সঙ্গে আলাপ। আমাকে কোনও স্বপ্ন দেখায়নি। শুধু বলেছিল, ভাতে-কাপড়ে রাখবে। অসম্মান করবে না। সাহস করে বেরিয়ে এসেছিলাম।"

"ভুল ভাঙল কেন?"

"ভাতে-কাপড়ে রেখেছিল। গায়ে হাত দেয়নি কখনও। কিন্তু ওর পরিচিতরা এলে আমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলত। ওরা নাকি মিটিং করত তখন। ওইরকম সময়ে পাশের বাড়ির মাসি আমাকে কল্পনাদির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কীসের মিটিং জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত না সে। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই দশ-বারো দিনের জন্যে উধাও হয়ে যেত সে। ওর এক বন্ধুর মুখে শুনলাম গবমেন্টের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন হচ্ছে তাতে যোগ দিয়েছে সে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু ও জবাব দেয়নি।"

"মাওবাদী?"

"না না। মাওবাদীরা তো জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। ও সেই দলে ছিল না। তারপর একদিন পুলিশ এসে আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। ওরা ওকে আমার স্বামী ধরে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিল। জেলে পাঠাবে বলেছিল। ভয় দেখিয়েছিল খুব। বলেছিল সে বাড়িতে ফিরলেই যদি খবর না দিই তা হলে ভয়ংকর শাস্তি দেবে। পাশের বাড়ির মাসির কাছ থেকে খবর পেয়ে কল্পনাদি থানায় গিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনে। তারপর আর ওর সঙ্গে থাকার সাহস পাইনি।" সিক্তা বলল।

"তোমাকে খবরটা কে দিয়ে গেল?"

"মাসিকে ঠিকানা আর আপনার ওই ফোনের নম্বর দিয়েছিলাম। মাসি

ফোন করে বলল, কাল রাত্রে পুলিশের গুলিতে ও মারা গিয়েছে।" চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল সিক্তার।

"যার জন্যে এখন কাঁদছ তাকে ছেড়ে এলে কেন?"

"সে আমার কাছে সব লুকিয়েছিল কেন? আমার দায়িত্ব নিয়েও সে ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি কেন? যদি আমার পেটে বাচ্চা এসে যেত তা হলে কী করতাম? যার আন্দোলনে এত শখ তার কি উচিত হয়েছে একটা মেয়েকে পথে বসানো?" চোখ মুছল সিক্তা, "কাঁদছি কারণ মানুষটা আমার ওপর কোনও অত্যাচার কখনও করেনি। যখন উধাও হয়ে যেত তখন বাজারের টাকা দিয়ে যেত। একবার এত দেরি করে ফিরেছিল যে, শুধু ভাত ফুটিয়ে খেয়ে বেঁচে ছিলাম। ফিরে এসে খুব ক্ষমা চেয়েছিল। সেই লোকটা বেঘোরে মরে গেল শুনে একটুও ভাল লাগছে না দিদি।"

একটু ভাবল সংহিতা। মেয়েটার জন্যে অন্যরকম ভাললাগা তৈরি হল। ওর স্বামী মরে গেলে বোধহয় দেখতে যেতে চাইত না। সে তাকাল, "তোমার স্বামীর কথা মনে পড়ে?"

"নাঃ।" দ্রুত মাথা নাড়ল সিক্তা।

"তুমি কি তাকে দেখতে যেতে চাও?"

"আমি কী করব বুঝতে পারছি না।"

"ভেবে দেখো। যদি যেতে হয় কাল সকালে চলে যেয়ো। অসম্ভব না হলে রাত্রে ফিরে এসো। দূরত্ব তো খুব বেশি নয়। কোথায় আছে জানো?"

"না। মাসি বলে দিতে পারে। কিন্তু আমি গেলে আপনার অসুবিধে হবে।"

"সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও।"

সিক্তা চলে গেল। কাল কী হবে এই মুহূর্তে সংহিতা ভাবতে চাইল না। সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

জয়ব্রত ফোন করেছিল কেন? এতগুলো বছর পরে আজ কী কারণে ফোন করতে পারে? সারাদিন যে-অস্বস্তিকে চাপা দিয়ে রেখেছিল সে, এখন সেটা প্রকট হল। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল। জয়ব্রত সম্পর্কে কোনও আগ্রহ তার এতকাল ছিল না, এখনও হচ্ছে না। ফোনটা পাওয়ায় শুধু বিরক্ত হয়েছে। বিছানা থেকে নেমে এসে কৌটো খুলে ঘুমের ওষুধ বের করে মুখে দিয়ে জল ঢালল সে। একসময় কিছুকাল খেতে হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিলেন

ডিনারের আগে খেয়ে নেবেন, তা হলে তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যাবে। আজ বাধ্য হয়ে ডিনারের পর খেতে হল, দেরিতে হলেও ঘুম তো আসবেই।

"আমাকে চিনতে পারছিস না তুই, কিন্তু আমি তোকে চিনে ফেলেছি। হা হা হা।"

চমকে সে তাকাল ডানপাশে। মাথা নিচু, শরীর ঝুঁকে পড়া সত্ত্বেও হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে সে। এই গলার স্বর তেমন স্পষ্ট না হলেও ওই হাসিটাকে সে ভালভাবে মনে করতে পারল। এ তো জয়ব্রত। জয়ব্রত কোত্থেকে এল?

কিন্তু সে কোনও কথা না বলে ওই একই ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। তা হলে কি সেই ট্রেনে জয়ব্রতও ছিল? মনে করতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু ওই দুলুনি এবং তারপর ভয়ংকর আর্তনাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপাশে পৌঁছোচ্ছে না স্মরণশক্তি। সে চিনবে না, কিছুতেই বুঝতে দেবে না চিনতে পেরেছে। এই লোকটা, যদি লোক বলা যায়, যে জয়ব্রত তার নিশ্চয়তা কোথায়? স্মৃতিতে তো কিছুই ধরা দিচ্ছে না। আচ্ছা জয়ব্রত নামটাও তার মনে পড়ার কথা নয়। কেন মনে এল!

এখন পায়ের তলার পথ কাদা কাদা হয়ে গিয়েছে। কাদায় পা বসে যাচ্ছে। ফলে প্রত্যেকের হাঁটার গতি কমে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। হঠাৎ মিছিলটা দাঁড়িয়ে গেল। তার পরেই ঝড় উঠল। প্রবল বাতাসে সবাই ছিটকে যেতে লাগল। পথ থেকে যেন কেউ তাকে তুলে নিয়ে গেল পাশের উঁচু ঢিপির ওপরে। সে দেখল পথ জনশূন্য। মিছিলের সবাই পথের দু'পাশে কুঁকড়ে রয়েছে। আর তখনই একটা ভয়ংকর আগুনের গোলা নেমে এল ওপর থেকে। লকলক করছে ঘিয়ে রঙের আগুন। সেই আগুন নীচে নেমে যাওয়ার সময় দু'পাশের কয়েকজনকে টেনে গিলে ফেলল। আর তার পরেই নেমে এল লাভার স্রোত। তীব্র ধোঁয়া বের হচ্ছে সেই স্রোত থেকে। উলটোদিকের পারে দাঁড়ানো কয়েকজনের ওপর সেই স্রোত ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্রোত যখন শেষ হল তখন দেখা গেল সেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সেই কাদামাটির পথে নেমে এল বাকিরা। আবার শুরু হল চলা। তার পাশে এখনও সেই হতচ্ছাড়াটা। চাপা গলায় বলল, "আমাদের যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কে জানে! তুই কিছু বুঝতে পারছিস?"

ফোঁস করে উঠল সে, "খবরদার, আমাকে তুই বলবেন না।"

"সে কী! আমার মুখ থেকে আপনি তুমি না এলে কী করব? তোকে দেখে আমার খুব স্নেহবোধ হয়েছে। হা হা হা।"

সে কিছু বলল না। এর সঙ্গ ত্যাগ করে একটু এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই সে গতি বাড়াতে পারল না। যেন তার কোনও ইচ্ছে নেই, অন্যের নির্দেশমতো তাকে হাঁটতে হবে।

এই সময় আকাশবাণী হল, "অত্যাচারীদের আমি পছন্দ করি না। তাদের জন্যে আছে প্রচণ্ড শাস্তি। তবে কেউ অত্যাচার করার পরে অনুশোচনা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে সে আমার ক্ষমা পেতে পারে। যারা জীবদ্দশায় ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে তাদের আমি ক্ষমা করব না। তোমাদের মধ্যে যারা অনাথদের ওপর অত্যাচার করে এসেছ তাদের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলতে হবে। যারা অপচয় করেছে তাদের আমি পছন্দ করি না। যারা মন্দ কথা এবং নিন্দা করতে অভ্যস্ত ছিলে তাদের শাস্তি পেতে হবে। যারা নিরীহ নারীকে অপবাদ দিয়েছ তাদের জন্যে ভয়ংকর শাস্তি প্রস্তুত আছে। যারা অহংকারী, উদ্ধত, অশ্লীলতা ও অসৎ কাজে অভ্যস্ত ছিলে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী ছিলে তাদের কশাঘাতের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে যা কর্ম করেছ তার ফল পরলোকে এসে পাবে। এখন তোমরা নিজেরা ভেবে দেখো কে কী করেছ।"

আকাশবাণী শেষ হলেই অদ্ভুত নীলচে আলোয় চারধার আলোকিত হয়ে গেল। কেউ কোনও কথা বলছিল না। তখনই সে বুঝতে পারল তাদের কারও শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই। যে-প্রশ্ন মনে উঠছে তার তরঙ্গ যাকে স্পর্শ করছে সে-ই বুঝতে পারছে কথাগুলো। কোনও স্পষ্ট শব্দ নয়, একটা গুনগুনানি যেন চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর মিছিলটা দাঁড়িয়ে গেল। পথ রোধ করে রয়েছে একটা বিশাল জন্তু। তার তিনটে চওড়া পা, বিরাট শরীর, মাথার মাঝখানে একটা গোল চোখ যা থেকে আগুন ঝরছে আর হাতির শুঁড়ের মতো প্রত্যঙ্গ দু'পাশে দুলছে। আচমকা চিৎকার করে উঠল প্রাণীটা। দু'পাশের লম্বা শুকনো গাছের মাথা ছাড়িয়ে গিয়েছে তার শরীর। দু'বার চিৎকার করার পরে সেটি এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে মিছিলটা ছত্রাকার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে বড় চওড়া পা ফেলে মিছিলের ওপর দিয়ে পিছনে চলে গেল প্রাণীটা। ঠিক

সময়ে তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়েছিল সেই হা হা হা করা সঙ্গী, নইলে কাদামাটিতে মিশে যেত সে-ও। মিছিলের আয়তন এখন দুই তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছে। আর তখনই আকাশবাণী হল, "যারা চরম পাপ করে এসেছে তারা নরকে যাওয়ারও যোগ্য নয়। যারা পাপ কম করেছে তাদের স্থান হবে নরকে। যারা পাপী তাদের জন্যে স্বর্গের দরজা কখনও উন্মুক্ত হবে না। যারা সৎকর্ম করে এসেছে তারা স্বর্গলোকে প্রবেশ করতে পারবে। তাদের অন্দরে যদি কোনও বিষাদ থাকে তা হলে আমি তা দূর করে দেব। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কে স্বর্গলোকে আর কে নরকে যাবে।"

"তুই কোথায় যাবি?" প্রশ্নটা ভেসে এল পাশ থেকে।

যেহেতু তাকে ও রক্ষা করেছিল তাই ইতস্তত করেই সে পালটা প্রশ্ন করল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"স্বর্গ ছাড়া আমার তো কোথাও যাওয়ার কথা নয়।"

"কেন?"

"আমি তো কোনও পাপ কখনও করিনি।"

"পৃথিবীতে থাকার সময় কী করেছেন তা আপনি মনে করতে পারছেন?"

জবাব এল না কিছুক্ষণ। সে তখন বলল, "আমাদের কারও স্মরণে নেই পৃথিবীতে কী করে এসেছি। তাই না?"

"না। একটু একটু, অস্পষ্ট মনে পড়ছে।"

"কী?"

পাশ থেকে গাঢ় স্বর ভেসে এল, "আমি ভালবেসেছিলাম।"

ঘুম ভেঙে গেল সংহিতার। শরীরে তীব্র অস্বস্তি হচ্ছে। সেই সঙ্গে শীত করছিল খুব। উঠে বসল সে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বুঝতে পারল তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। কোনওরকমে বিছানা থেকে নেমে ফ্যানের সুইচ অফ করল সে। তারপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এরকম স্বপ্ন কেন দেখছে সে? সে তো এখনও জীবিত তা হলে মরণের পরে ওই যে যাত্রা তার স্বপ্ন কেন বারে বারে দেখতে হচ্ছে! অবচেতনে সে কি মৃত্যুর কথা ভাবছে? আচ্ছা, আজ রাত্রে যদি সে মরে যায়, না, আজ নয়, কাল সিক্তা তার মৃত প্রেমিককে দেখার জন্যে যদি চলে যায় তা হলে

এই বন্ধ ফ্ল্যাটে একা থাকার সময়ে যদি আচমকা তার মৃত্যু হয়, তা হলে কী হবে? সিক্তা ফিরে এসে বেল বাজাবে। তারপর লোক জড়ো করে দরজা না খোলানো পর্যন্ত তাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে।

তারপর এই ফ্ল্যাট, ছবি, ব্যাঙ্কের টাকা, লকারের গহনা, এসব নেওয়ার জন্যে কারা হাত বাড়াবে? যে বা যারাই বাড়াক তাদের সঙ্গে বহু কাল যোগাযোগ নেই তার অথবা তাদের অনেককেই কোনওদিন দেখেনি সে। এদেরই বলা হয় পাঁচ ভূত।

জল খেল সংহিতা। ওই পাঁচ ভূতকে তার সম্পত্তি লুটেপুটে খেতে দেবে না সে। এগুলো অর্জনের সময় কেউ একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি তাকে। বিছানায় বসল সংহিতা। পরপর দু'রাত যে-স্বপ্ন সে দেখল তা তাকে সতর্ক করছে নিশ্চয়ই। এই যে আমি খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, রাগ করছি, ছবি আঁকছি, সেগুলো বিক্রির টাকা ঠিকঠাক পাচ্ছি কিনা হিসাব রাখছি, আয়কর দিচ্ছি, কখন আচমকা বুকের যন্ত্রটা বন্ধ হয়ে যাবে তা জানি না। আর সেটা বন্ধ হলে আমার সব কিছু অর্থহীন হয়ে যাবে। সংহিতা মাথা নাড়ল। তার পাশে স্বামী নেই, কোনও সন্তান নেই। তার কোনও যোগ্য উত্তরাধিকারী নেই। তা হলে সে এসব কার জন্যে রেখে যাবে?

এখন এখানে মধ্যরাত হলেও ববের শহরে রোদ্দুর নিভে যায়নি। স্যাটান আইল্যান্ডে ফোন করল সংহিতা। যেন পাশের ঘরের কাউকে ফোন করছে এমন জোরে রিং হতে লাগল। তারপরই ববের গলা শুনতে পেল, "হাই!"

"বব্, আমি সংহিতা।"

"ও মাই সুইট লেডি। এত রাত্রে জেগে আছ! ছবি আঁকছিলে?"

"নাঃ। স্বপ্ন দেখলাম। জার্নি আফটার ডেথ!"

"বাঃ! তোমার ছবির বিষয় তুমি স্বপ্নেই পেয়ে যাচ্ছ।"

"ওকে বব্। আমার ভাল লাগছে না। এখন ইন্ডিয়ার যে-কোনও ভদ্র মানুষ ঘুমিয়ে আছে। তাই তোমাকে কল করলাম।" সংহিতা আঙুল চুলে বোলাল।

"এনি প্রবলেম?"

"বব্, তুমি বিশ্বাস করো মৃত্যুর পরে মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকে যেতে পারে?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

"আমি তো কখনও গিয়ে দেখিনি, কেউ গিয়ে ফিরে এসে আমাকে বলেনি,

তবে এভাবে যদি ভাবো, আমরা কোন অজানা জায়গা থেকে পৃথিবীতে এসেছিলাম? কেউ কম কেউ বেশি বছর এখানে কাটিয়ে আমরা আবার সেই অজানা জায়গায় নিশ্চয় যাব। এক্ষেত্রে পৃথিবীটায় আমরা পরবাসী। এই পরবাসে আমরা কে কী করছি তার নিশ্চয়ই মূল্যায়ন হবে। যেভাবে সরকারি-বেসরকারি কাজের অডিট হয়। ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই তার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।" বব্ হাসলেন, "এরকম ব্যাপার মনে করলে অনেক কিছু স্বাভাবিক, সহজ হয়ে যায় মাই ডিয়ার লেডি।"

"ভাল কাজ মানে? আমার চেয়ে যারা কষ্টে আছে তাদের সাহায্য করা?"

"এটা অনেক কিছুর মধ্যে একটা। একটি ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলাম, যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্যে এবং কারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালনের সন্তুষ্টিলাভের জন্যে। যে গোপনে অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে, যে সাহায্যের কথা প্রচার করে না সে প্রতিপালকের আশীর্বাদে ধন্য হবেই।" বব্ বললেন, "তবে সেই সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তুমি যেমন কৃপণ হবে না তেমনি একেবারে মুক্তহস্ত হওয়ার দরকার নেই। প্রথমটার জন্যে লোকে তোমার নিন্দা করবে আর দ্বিতীয়টা তোমাকে নিঃস্ব করবে। মাই ডিয়ার লেডি, তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়ো। পারলে একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নাও। রাখছি। গুড নাইট।"

মোবাইল অফ করে মাথা নাড়ল সংহিতা, "বব্, ট্যাবলেট তো আজ খেয়েছিলাম। কিন্তু ঘুমোলেই ওই ভয়ংকর স্বপ্ন আমাকে দেখতে হচ্ছে।"

আর ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করতে করতে এল ভোররাতে।

ঘুম ভাঙল যখন তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা। ভাঙতেই মনে পড়ল, সিক্তার তো চলে যাওয়ার কথা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল সিক্তা তৈরি হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

"এ কী! আমাকে ডাকোনি কেন?"

"আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।"

"তাই বলে ডাকবে না?"

"মনে হল রাত্রে ঘুম হয়নি আপনার, টেলিফোনে কথা বলছিলেন।"

"তুমি জেগেছিলে কেন? আমি তো তোমার ঘুম ভাঙানোর মতো শব্দ করে কথা বলিনি।"

"কাল রাত্রে ঘুমোতে পারিনি দিদি।"

"কেন?"

"হাজার হোক মানুষটা আমার উপকার করতে চেয়েছিল। সে পুলিশের গুলিতে বেঘোরে মারা যাবে ভাবতেই পারছি না।" চোখ মুছল সিক্তা।

"ঠিক আছে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখনই বেরিয়ে যাও।"

"দিদি, আমি চলে গেলে আপনার খুব কষ্ট হবে।"

"আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না সিক্তা।"

"তা হলে চা করে দিই।"

খবরের কাগজ আর চা টেবিলে পাওয়ার পর সংহিতা সিক্তাকে চারশো টাকা দিল, "এটা রাখো। যাতায়াতের বাস ভাড়া ছাড়া খেতেও তো লাগবে।"

"আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।"

"কী করব সেটা আমি ঠিক করব। যদি দেখো ফিরতে পারছ না তা হলে দয়া করে ফোন করে দিয়ো।" কাগজ খুলল সংহিতা।

সিক্তা বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল। হঠাৎ সংহিতার মনে হল এখন এই ফ্ল্যাটে সে একা। তার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে কেউ টের পাবে না। সে দ্রুত চা খেয়ে খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে উঠে দাঁড়াতেই মোবাইল বেজে উঠল। সেই নম্বর, যা থেকে জয়ব্রত ফোন করেছিল। ধরার কোনও দরকার নেই, প্রথমে ভাবল সংহিতা। কিন্তু শব্দটা ক্রমশ তার নার্ভে আঘাত করতে লাগল। তারপর থেমে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বেজে উঠল। নিজেকে সামলাল সংহিতা। মোবাইল অন করে জিজ্ঞাসা করল, "কী চাইছ?"

"তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দশ মিনিটের বেশি সময় নেব না।"

"অসম্ভব। একথা বলতে তোমার সাহস হল কী করে?"

"বাধ্য হয়ে, বিশ্বাস করো। আমি খুব সুস্থ নই।" জয়ব্রত বলল।

"জয়ব্রত, এসব কথা বলে তুমি আমার সিমপ্যাথি পাবে বলে যদি আশা করো তা হলে আর-একবার নিজেকে মূর্খ প্রমাণ করবে। রাখছি।"

"এক মিনিট। ঠিক আছে, আমাকে সময় দিয়ো না, একবার টিকলির সঙ্গে দেখা করো।"

থম লাগল বুকে। কোনওরকমে বলল সংহিতা, "ভেবে দেখব।" তারপর লাইন কেটে দিয়ে সুইচ অফ করে দিল।

টিকলি। তিরিশ বছর আগে টিকলির বয়স ছিল চার। ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে। ওই বয়সে নিজের মতো নাচত যখন খুশি। জয়ব্রত তখন আর্ট কলেজে পড়াচ্ছে, আঁকা শেখাচ্ছে। ওর অভ্যেস ছিল একটু জোরে কথা বলা। আর মাঝে মাঝেই হা হা হা করে হাসা। আঠারো বছর বয়সেই ছাত্রী হিসেবে যেটুকু কাছে আসা যায় তাতে জয়ব্রত সম্পর্কে একটা টান অনুভব করত সে। তার অনেক পরে শুনল জয়ব্রতর স্ত্রী তার প্রেমিকের হাত ধরে স্বামী এবং মেয়েকে ছেড়ে প্রবাসে চলে গিয়েছে। তখন খুব খারাপ লেগেছিল। সে সময় সে আর্ট কলেজের ছাত্রী নয়। বাবার পছন্দ মানতে হয়েছিল মায়ের অনুরোধে। বাগবাজারের দত্তবাড়ির আভিজাত্য নাকি ওই পরিবারের গর্ব।

ফোন বাজছে। ল্যান্ড ফোন। রিসিভার তুলেই কেয়ারটেকারের গলা শুনতে পেল, "ম্যাডাম, আপনার মেডসার্ভেন্ট একটু আগে বলে গেল ভাল খাবার যারা হোম-ডেলিভারি করে তার টেলিফোন নম্বর আপনাকে দিতে। বলব ম্যাডাম?"

ঠোঁট কামড়াল সংহিতা। তবু সিক্তার এই পাকামোটা মন্দ লাগল না সংহিতার। নিস্পৃহ গলায় বলল, "বলুন।"

নম্বর ও সংস্থার নাম জানালে সংহিতা লিখে নিল। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। প্রথমে তার মনে হল, একদিন তথাকথিত লাঞ্চ বা ডিনার না খেলে কোনও মানুষের ক্ষতি হয় না। একটা ডিমের ওমলেট এবং টোস্ট খেলেই চলে যায়। অনেকদিন পরে রান্নাঘরে ঢুকল সংহিতা। সিক্তা আসার পরে সে এই ঘরে ঢোকেনি। ঢুকতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। গ্যাস পরিষ্কার করেনি মেয়েটা ভাল করে। পাশের দেওয়ালে ধোঁয়া লেগে লেগে কালচে হয়ে গেছে। ফ্রিজ খুলল সংহিতা। নাক সিঁটকে গেল, কতদিন ফ্রিজ পরিষ্কার করেনি সিক্তা? মেয়েটার কথাবার্তা, ব্যবহার এত ভাল, রান্নাও মন্দ করে না কিন্তু এত অপরিষ্কার কেন? তারপরেই খেয়াল হল। যার জন্ম এবং বড় হওয়া গ্রামের গরিব সংসারে তার তো শিক্ষার অভাবে কিছু খামতি থেকেই যেতে পারে। ও এলে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে রাগারাগি না করে।

আঁকার ঘরে এল সংহিতা। নতুন ক্যানভাসে স্কেচ শুরু করল। কাল রাত্রে যেমন দেখেছিল মিছিলটাকে তেমনই আঁকার চেষ্টা করল। করতে

করতে একটা সময় থমকাল। বব্ বলেছিলেন, ভাল কাজ করলে তার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এতদিন শুনেছিল, ফলের জন্যে চিন্তা কোরো না, কাজ করে যাও। এই কাজটা নিশ্চয়ই ভাল কাজ করা। প্রতিদানের আশা ত্যাগ করে নিজেকে একেবারে নিঃস্ব না করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। বাঃ। এসব কথা তো পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থে লেখা হয়েছে। আর গ্রন্থ যখন আজ লেখা হয়নি, দীর্ঘকাল ধরে গ্রন্থগুলো আছে কিন্তু সেইসব উপদেশ অনুসরণ করার ইচ্ছে হয়নি কখনও। এতদিন কথাগুলো কানে ঢুকেছে কিন্তু মনে পৌঁছোয়নি।

সংহিতা আবার আঁকা শুরু করল। স্কেচ যখন কিছুটা এগিয়ে গেছে তখন ঘড়ির আওয়াজ কানে এল। নাঃ, রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না তার। কেয়ারটেকারের দেওয়া নম্বরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করল, "ঘরোয়া? হ্যাঁ, যদিও অনেক বেলা হয়ে গেছে তবু আপনাদের যদি অসুবিধে না থাকে তা হলে এখন লাঞ্চ পেতে পারি?"

"অসুবিধে নেই। কোত্থেকে বলছেন?"

জায়গাটা জেনে নেওয়ার পরে লোকটি বলল, "এখন আমরা ভাত, শুক্ত, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, সবজি আর মাছ অথবা মাংস এবং চাটনি দিতে পারব।"

"আমার এসব না হলেও চলবে। রুটি আর চিকেন স্যুপ দেওয়া সম্ভব হবে?"

"ওটা রাত্রে দিতে পারব।"

অগত্যা বাঙালি খাবারেই রাজি হল সংহিতা। ঠিকানা বলে দিয়ে ব্যালকনিতে চলে এল। এখানে দাঁড়ালে কলকাতার অনেকটাই দেখা যায়। সন্ধের পরে চেয়ার নিয়ে বসলে দিব্যি সময় কেটে যায়। আবার ফোন বাজছে শুনতে পেল সংহিতা। এবার মোবাইল। জয়ব্রত যদি আবার ফোন করে তা হলে ওটার সুইচ অফ করে দিতে হবে।

ঘরে এসে মোবাইলে নম্বরটা দেখল সংহিতা। অচেনা নম্বর। সে বোতাম টিপে জিজ্ঞাসা করল, "কে বলছেন?"

"হাই সুইটি!" শব্দ দুটোয় অনেক উচ্ছ্বাস মাখামাখি।

"মিলা? হোয়াট এ সারপ্রাইজ!" চোখ বড় হল সংহিতার, "তুমি কোথায়?"

"তোমার বাড়ির সদর দরজায়।"

"সে কী!"

"গার্ড বলছে তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে ঢুকতে দেবে না। আমি বললাম, তার আগে আমি কথা বলে দেখি, চিনতে পারে কিনা!" হাসল মিলা।

"তুমি রাখো, আমি ওকে বলে দিচ্ছি।"

মোবাইল নয়, লান্ডলাইন থেকে গার্ডকে নির্দেশ দিল সংহিতা মিলাকে উপরে আসার ব্যাপার সাহায্য করতে। মিলা এই ফ্ল্যাটে একবারই এসেছিল কয়েক বছর আগে।

একটু পরেই বেল বাজল। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই মিলা সমস্ত মুখে হাসি ছড়িয়ে দুটো হাত দু'দিকে বাড়াল। বছর দশেকের ছোট মিলাকে দেখলে মনেই হবে না পঞ্চাশের কাছে চলে এসেছে। পরনে হারেম প্যান্ট আর স্লিভলেস শার্ট, কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝোলা চামড়ার ঢাউস ব্যাগ। ভাল করে দেখার আগেই ঘরে ঢুকে মিলা তার গলা জড়িয়ে ধরে সশব্দে ঠোঁটে চুমু খেল।

কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সংহিতা বলল, "এই, কী হচ্ছে?"

"কী হচ্ছে মানে? আর কেউ আছে নাকি ফ্ল্যাটে? কারও সঙ্গে আছ না বিয়ে করেছ? তা হলে দেখতে হবে ভাগ্যবানটি কে?" মিলা চোখ ছোট করল।

"দুটোর কোনওটাই না।"

"বাঃ। তুমি কী ভাল।" আবার চুমু খেল মিলা, এবার গালে। বাঙালি মেয়েদের চেয়ে অনেক লম্বা মেয়েটা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "বেডরুম কোথায়?"

সংহিতা তাকে বেডরুমে নিয়ে গেলে সে ব্যাগটা চেয়ারের ওপর ছুড়ে ফেলে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল খাটে, "উঃ কী টায়ার্ড লাগছিল, মরে যাচ্ছিলাম!"

"কেন? কী হয়েছিল। দেশে কবে ফিরেছ?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

চোখ বন্ধ করল মিলা, জবাব দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওকে ওইভাবে থাকতে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল সংহিতা। বারোটা বেজে গেছে। ধরে নেওয়াই যেতে পারে মিলা লাঞ্চ করে আসেনি। হোম ডেলিভারির খাবার কি দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট? শোনা যায় ওরা একটু বেশি দিয়ে থাকে। নাকি, ফোন করে বলবে আর-একটা ডিশ দিতে।

"বাস্টার্ড!" নিচু গলায় বলল মিলা। সংহিতা তাকাল, মিলার চোখ বন্ধ।

"কার কথা বলছ?"

"লোকটার কালেকশনে দালি, পিকাসোর ছবি আছে। প্রত্যেক বছর প্রচুর ছবি কেনে। ওর কালেকশন যেখানে রেখেছে তা যে-কোনও গ্যালারির থেকে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। লোকটার নাম ইয়ুসোফ। মরুভূমির ভেতরে যে-বাড়ি বানিয়েছে, তা দেখলে তাজ্জব হতে হয়।" কথা বলতে বলতে শ্বাস ফেলল মিলা শব্দ করে।

"মরুভূমি?"

"দুবাইয়ের কাছে। শেখ ইয়ুসোফ।" আচমকা উঠে বসল মিলা, "বাস্টার্ড! মাদার ফাকার!"

সংহিতা অবাক হল, "এই, গালাগাল দিচ্ছ কেন?"

"কেন দেব না? পরশু রাত্রে একটা পার্টিতে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। যে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তার কাছে খবর পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যি ওঁর সংগ্রহে দালি এবং পিকাসো আছে কিনা। তখন শালার কী বিনয়! বলল, ওদের কাজ আছে কিন্তু ম্যাডাম আপনার কোনও কাজ আমার কাছে নেই। এটা কি ভাল কথা? আমি গলে গেলাম। বললাম আমি ওকে সিডি দেখাতে পারি, যে-ছবিটা পছন্দ করবে সেটা পাঠিয়ে দেব। ঠিক হল পরের দিন সকাল দশটায় ও আমাকে নিয়ে যাবে ওর আর্ট কালেকশন সেন্টারে। আমি যখন পিকাসো বা দালি দেখব তখন ও আমার সিডি দেখে নেবে।" মিলা বলল।

"সত্যি, দালির অরিজিন্যাল দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।" মাথা নাড়ল মিলা, "ফ্যান্টাস্টিক গ্যালারি। মরুভূমির মধ্যে একটা বিশাল এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ি। ছবিগুলো যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে যে-ব্যবস্থা নিয়েছে তা বোধহয় ল্যুভরেও নেওয়া হয় না। তারপর লোকটা আমাকে যে-ঘরে নিয়ে গেল সেখানে পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত ফিল্মের সিডি রয়েছে। বিশাল বড় স্ক্রিন। লক্ষ করলাম ওর কর্মচারীরা সব বাইরের ঘরগুলোয় কাজ করছে, ভেতরের ঘরে কারও ঢোকার অধিকার নেই। গ্যালারির দরজায় অটোমেটিক তালা। কোড্ জানা না থাকলে কারও পক্ষে খোলা সম্ভব নয়। লোকটা গ্যালারি থেকে বের হলেই কোড চেঞ্জ করে দেয়। আমার সিডি ও নিজেই চালাল। ছবির যা সাইজ তার চেয়ে চারগুণ

বড় হয়ে এল স্ক্রিনে। গোটা পনেরো ছবি ছিল সিডিতে। চুপচাপ একের পর এক দেখে যাচ্ছিল সে। তেরো নম্বর ছবি পরদায় ভেসে আসতেই সে মিনিট ছয়েক চুপচাপ দেখতে লাগল।"

"কী ছিল ওই ছবিতে?"

"ফার্স্ট ইন্টারকোর্স অফ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান। ইভ এবং আদমের প্রথম সঙ্গম। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন সেক্স সম্পর্কে কোনও ধারণা ওদের ছিল না। পরস্পরের সান্নিধ্য যখন ওদের উত্তাপ দিচ্ছে তখন ওরা পশুদের সঙ্গম করতে দেখল। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষ প্রাণী পিছন থেকে কাজটা করেছে। এবং আদম ইভের সঙ্গে সেই পথই অনুসরণ করেছিল। আমার ছবিতে আদমের শরীর ছিল ইভের শরীরের অনেকটা আড়ালে। ইভের মুখ ভয়ংকর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছিল। সে আদমের কাছ থেকে পরিত্রাণের জন্যে ছটফট করছিল।" মিলা বলল।

"তারপর?"

"লোকটা ওই ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। জিজ্ঞাসা করল কত দাম দিতে হবে। প্যারিসের একটা এগজিবিশনে ওর দাম উঠেছিল তিরিশ হাজার ডলার। যে কিনতে চেয়েছিল সে ইনস্টলমেন্টে দেবে শুনে আমি রাজি হইনি। আমি ওই দামটাই বললাম। শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল। বলল, আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেব। ব্যাগ থেকে চেকবই বের করে জিজ্ঞাসা করল, কী নেবে? চেক না ক্যাশ?"

"কিন্তু ছবি তো এখন আমার সঙ্গে নেই। ওটা ভিয়েনাতে আমার স্টুডিয়োতে আছে।" বললাম।

"কোনও সমস্যা নেই। তুমি তারিখ বললে আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।"

আমি একটু ভাবলাম, এরকম লোকের চেক কখনওই বাউন্স করবে না। করলে ছবি দেব না। তা ছাড়া পঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলার নিয়ে প্লেনে উঠলে আমাকে কাস্টম ধরবে। শেষপর্যন্ত বললাম, আপনি আমাকে টেন পার্সেন্ট ক্যাশে অ্যাডভান্স দিন। ছবি নেওয়ার সময় বাকিটা দেবেন।"

"যা তোমার ইচ্ছে।" বলে লোকটা আমাকে পঞ্চাশটা একশো ডলারের চকচকে নোট দিয়ে বলল, "কিছু মনে কোরো না, কাকে দেখে তুমি ওই ইভকে এঁকেছ। মডেল কে?"

হেসে বলেছিলাম, "আমি কোনও মডেল ব্যবহার করিনি। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে এঁকেছি।"

সে বলল, "মাই গড। তুমি আমাকে একটু দেখাও।"

আমি বললাম, "কী বলতে চাইছেন?"

সে বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার কথা। প্রমাণ চাই।"

"মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে বলছি?" রেগে গেলাম আমি।

"হয়তো! কী জানি!"

"তা হলে আপনাকে ছবি কিনতে হবে না।"

"ছবির কেনাবেচার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। সে কাছে এসে দাঁড়াল, আমি ছবিটার দিকে যখনই তাকাব তখনই মনে করতে চাই মডেল কীরকম ছিল। প্লিজ।"

লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি বাধা দিতে চাইলাম। কিন্তু ওর শরীর থেকে একটা গন্ধ বের হয়ে আসছিল, হয়তো কোনও আতরের যা আমার নাকে যাওয়ামাত্র মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। এইখানে তোমাকে বলছি, আচমকা আমার ব্যাপারটা খারাপ লাগছিল না। আমার সব পোশাক খুলে নিয়ে সে অদ্ভুত চোখে শরীরটাকে দেখল। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে ডিভানে উপুড় করে শুইয়ে দিল। ও যে আমার ছবির আদমের মতো আক্রমণ করবে বুঝতে পারিনি। কিন্তু ওর দীর্ঘ শক্তিশালী শরীর আমাকে নড়তে দিচ্ছিল না। আমার রেক্টাম ছিঁড়ে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়। আমি কাঁদলাম। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলাম।"

"সে কী!" সংহিতা হাঁ হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম সে একটু দূরে ভদ্রভাবে বসে হাসছে, "এখন কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই আর ব্যথা নেই। আমি খুব ভাল ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছি।"

উঠে পোশাক পরলাম। ব্যথা আছে কিন্তু তখনকার মতো তীব্র নয়।

গম্ভীর গলায় বললাম, "আমি যেতে চাই।"

"নিশ্চয়ই। ওই দরজা খুলে বাইরে যাও। আমার ড্রাইভার তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে। হ্যাভ এ নাইস জার্নি। সে হাসল। মনে হচ্ছিল আমার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে। ওর কর্মচারীর দেখানো পথে টলতে টলতে কোনওরকমে গাড়িতে উঠে বসলাম। হোটেলের ঘরে

ফিরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তারপর সন্ধেবেলায় প্লেন ধরতে যাওয়ার সময় আবিষ্কার করলাম লোকটা আমার পোশাকের পকেটে ওই একশো ডলারের নোটগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে। একবার মনে হয়েছিল ছুড়ে ফেলে দিই ওগুলো। তারপর মত বদলালাম। অ্যাডভান্স যখন দিয়েছে তখন ইউসুফ ছবি নেবেই। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে লাভ কী? রাত দশটায় দিল্লিতে পৌঁছে ভোর অবধি ঘুমিয়ে আজ কলকাতায় এলাম।" মিলা মাথা নাড়ল।

সংহিতা চেয়ার টেনে মিলার সামনে বসল, "তুমি পুলিশের কাছে গেলে না কেন?"

মুখ বেঁকিয়ে হাসল মিলা, "আমি তখনও পাগল হয়ে যাইনি বলে।"

"মানে?"

"আমি পুলিশের কাছে গিয়ে যদি কমপ্লেন করতাম তা হলে দুটো ঘটনা ঘটত। একটা, আমি ট্যুরিস্ট হয়ে দুবাইতে গিয়ে ব্যাবসা করার চেষ্টা করেছি। ছবি বিক্রি করা তো ব্যাবসা করা। এই অপরাধের জন্যে আমার ভিসা বাতিল করে ওরা আমাকে জেলে ঢোকাতে পারত। দু'নম্বরটা হত আরও খারাপ। আমার অভিযোগের খবরটা ওরা সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফকে জানিয়ে দিত। তা হলে আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।" মিলা বলল।

"সে কী?"

"হ্যাঁ। হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে আমি কখনওই পৌঁছোতে পারতাম না। পুলিশও চেষ্টা করত না কয়েকশো কোটি ডলারের মালিককে বিরক্ত করতে। আমি তখন মাথা ঠান্ডা রেখে প্লেনে উঠে পড়েছিলাম, এটা একটা দারুণ কাজ করেছি।"

"এখন শরীর কীরকম?"

"খুব টায়ার্ড। কলকাতায় এসে বাড়িতে উঠিনি। সোজা হোটেলে গিয়েছি।"

"যন্ত্রণা আছে এখনও?"

মাথা নেড়ে না বলল, "কী ওষুধ দিয়েছিল জানি না, খুব ভাল কাজ হয়েছে। ওই ওষুধটা লোকটা কাছে রাখে কেন? নিশ্চয়ই আমার আগে অন্য মেয়েদের সঙ্গে একই কাণ্ড করে ব্যবহার করেছে। উঃ!"

"হোটেলে উঠলে কেন?"

"ফ্ল্যাট তো নোংরা হয়ে আছে। গিয়ে আমাকেই সব পরিষ্কার করতে

হত। আর পারছিলাম না। দু'দিন হোটেলে থেকে একটু তাজা হয়ে তারপর যাব।"

"এখন তোমার কোথায় কোথায় ফ্ল্যাট আছে?"

"এমন ভাবে বলছ যেন পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কলকাতা আর ভিয়েনাতেই ফ্ল্যাট, লন্ডনে একটা ছোট্ট অ্যাটাচ্‌ড বাথওয়ালা ঘর। ব্যস।"

"এখন কার সঙ্গে আছ?"

"কেন্ট নামের একটা ছেলে। সে-ও পেন্টার কিন্তু নপুংসক।"

"তার মানে?"

"যৌন প্রতিবন্ধী।"

"তার সঙ্গে আছ?"

"খুব নিরাপদে আছি। তবে ওকে বলে এসেছি নিজের জায়গা খুঁজে নিতে। বেচারা যে ছবি আঁকে তার কোনও খদ্দের নেই। খুব খারাপ অবস্থা। কিন্তু অনেকদিন তো ওকে বইলাম। এখন ও ঘাড় থেকে নেমে যাক।" মিলা বলল।

"এক কাজ করো। দু'দিন হোটেলে থাকতে হবে না। এখানেই থাকো। তুমি আমার ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়ি নিয়ে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

"এখানে।" সঙ্গে সঙ্গে মিলার চেহারা বদলে গেল। দু'হাতে সংহিতার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "দারুণ হবে। থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু তোমার বাড়িতে কাজের লোক নেই?"

"আছে। দেশে গিয়েছে।"

"তা হলে এক কাজ করি। ড্রাইভারকে বলে দাও, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে চেক-আউট করে ফিরে আসছি।" মিলা উঠে দাঁড়াল।

মিলা চলে যাওয়ার পর হোম-ডেলিভারির খাবার এসে গেল। ওদের পাত্র নিয়ে নিজের থালা বাটি সসপ্যানে ঢেলে নিয়ে ফেরত দিল দাম সমেত সংহিতা। তারপরে স্নান করতে ঢুকল। আয়নায় নিজের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। যে ছেলেটা খাবার দিতে এসেছিল সে কেন তার মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল এখন বুঝতে পারল। তার ঠোঁটের ওপরে মিলার লিপস্টিকের ছাপ এখন অস্পষ্ট দেখালেও আছে। দ্রুত তোয়ালে দিয়ে ওটা মুছে ফেলল। একটু জোরেই ঘষেছিল তাই ঈষৎ জ্বলুনি অনুভব করল।

অদ্ভুত মেয়ে। এই চুমু খাওয়াটা ওর অনেকদিনের রোগ। এখন দেখা হলে

অনেকেই গদগদ হয়ে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুমু খায় না। প্রথম আলাপ হওয়ার পরে মিলা যখন এই কাণ্ড করত তখন প্রচণ্ড আপত্তি করত সে, শরীর ঘিনঘিনিয়ে উঠত। সে অনুমান করত একমাত্র লেসবিয়ানরাই পরস্পরের ঠোঁটে চুমু খায়। কিন্তু ওই চুমু খাওয়া ছাড়া মিলার আচরণে এমন কোনও ছাপ ছিল না যাতে ওকে লেসবিয়ান মনে হতে পারে। তার আপত্তির কথা শুনে মিলা হো হো করে হেসেছিল, "তোমাকে আমার ভাল লাগে। আমি আমার মাকেও ঠোঁটে চুমু খেতাম। শেষের দিকে আপত্তি করলে জোর করে খেতাম। কোনও ছেলেকে ভাল লাগলে তার ঠোঁটেও চুমু খাই। আমার মনে হয় এটাই ভাল-লাগা জানানোর ঠিক উপায়। তা ছাড়া তাতে তো আমিও আনন্দ পাই।"

সংহিতা লক্ষ করেছে মিলা অনেকদিন পরে দেখা হলে এই কাণ্ডটা দু'-তিনবার করে। কিন্তু তারপর নিয়মিত দেখা হওয়ার সময়ে ভুলেও চুমু খায় না। হেসে ফেলল সে, বিচিত্র চরিত্র!

ড্রাইভার ফিরে এসে নীচের ফোন থেকে জানাল, "ওই মেমসাহেব আসেননি।"

"মানে?"

"হোটেলে গিয়ে বললেন, আমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোব। তুমি ফিরে যাও।"

"ঠিক আছে।"

এভাবে সিদ্ধান্ত পালটানো মিলার দ্বারাই সম্ভব। খেতে বসল সংহিতা। বহু দিন পরে শুক্ত খেয়ে খুব ভাল লাগল। এদের রান্নাও বেশ ভাল। সিক্তা খারাপ করে না কিন্তু এর ধারে কাছে না। খাওয়া শেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে বসতেই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। পাতা জুড়ে একটা নামী বড় সোনার কোম্পানির বিজ্ঞাপন। গহনার ছবি। এখন সোনার ভরি তো বাইশ হাজার টাকা। সাধারণ মানুষ কেনে বলেই তো এরা এত খরচ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। গয়নার ব্যাপারে তার কোনও কালেই আকর্ষণ ছিল না। বিয়ের পর অভিজাত দত্তবাড়িতে গিয়ে দেখেছে বউগুলো সর্বাঙ্গে সোনার গয়না চাপিয়ে বসে আছে। এমনকী শাশুড়িমা, যাঁর বয়স ষাটের ওপরে তিনিও গয়না না পরে ঘুমোতে পারতেন না। বিয়ের ক'দিন বাদে তাকে আলাদা ডেকে বলেছিলেন, "তোমার শ্বশুরমশাই তো রূপ দেখে গলে গেলেন। গরিবঘর হলেও বললেন

পঙ্কে পঙ্কজ ফুটেছে। তাকে নিয়ে আসবই। বিয়ের আগে বাপের দেওয়া একচিলতে সোনা যখন পরতে তখন দেখার কেউ ছিল না। বিয়ের সময় তো তোমাকে কিছুই দিতে বাকি রাখিনি। এখন থেকে সেগুলো অঙ্গে চড়াবে।"

মাথা নিচু করে সংহিতা জানিয়েছিল, "আমার খুব অস্বস্তি হয়।"

"অ্যাঁ? গয়না পরলে মেয়েছেলের যে অস্বস্তি হয় বাবার জন্মে শুনিনি। হোক অস্বস্তি। সবার বউ যা পরে তা ন'খোকার বউকেও পরতে হবে, এই বলে দিলাম।"

অতএব আদেশ মান্য করতে হয়েছিল। স্বামী লোকটি কিন্তু খুব নিরীহ ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, ওর কোনও বন্ধু নেই। স্কুলের সহপাঠীদের বাড়িতে নিয়ে আসা নিষেধ ছিল। এই বাড়িতে চামেলি নামের এক যুবতীকে ছাদ থেকে কাপড় তুলতে দেখত সে। মেজবউ বলেছিল, "চামেলি এখন ছোটকর্তাকে মানুষ করছে।"

"মানুষ করছে মানে?" অবাক হয়েছিল সংহিতা।

মেজবউ ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, "তোমার কর্তাকে জিজ্ঞাসা কোরো।"

রাত্রে স্বামীকে প্রশ্নটা করতেই সে দেখল লোকটা যেন অস্বস্তিতে পড়ল, "কে বলেছে তোমাকে?"

"মেজদিদি।"

"অ। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।"

"আমি বুঝতে পারছি না। বাড়িতে মা-বাবা থাকতে কাজের মেয়ে ছোটভাইকে কেন মানুষ করবে? দেখে মনে হল গরিবঘরের মেয়ে, পড়াশুনো করেনি।"

"ঠিকই। কিন্তু শরীর তো অনেকের চেয়ে ঢের ভাল। শুয়ে পড়ো। এসব ভেবো না।"

"আশ্চর্য! এর মধ্যে শরীর আসছে কেন?"

"বেশ, শোনো। এটা এই বাড়ির রেওয়াজ। বারো বছর বয়স হলেই তাকে আলাদা ঘর দেওয়া হয়। একজন যুবতী মেয়ে তার সব কাজ করে দেয়। তাকে অনেক কিছু শেখায়।"

"সে কী!" হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সংহিতা। ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকেও কি ওরকম একজন মানুষ করেছিল?"

"শুধু আমি কেন? আমার দাদাদের সবাইকে ওই শিক্ষা নিতে হয়েছে।"

"ছিঃ।" শব্দটা ছিটকে বেরোল সংহিতার মুখ থেকে।

সেটা শোনার পরে উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়েছিল লোকটা। অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারেনি সংহিতা। বাড়িটাকে নর্দমা বলে মনে হচ্ছিল।

বিয়ের পরে মাত্র দু'বার সে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল সাত মাসে। কোনও বারই তিন রাত্রি থাকেনি। শাশুড়ি বলেছিলেন, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু তেরাত্রি কাটাবে না। কুটুমবাড়িতে ওর বেশি থাকা উচিত নয়।"

সে চোখ বড় করেছিল, "আমার মা-বাবা আমার কুটুম?"

"গোত্রান্তর হয়ে গেলে তাই হয়।" শাশুড়ি বলেছিলেন।

দ্বিতীয়বারে শ্বশুরবাড়িতে ফেরার সময়ে সংহিতা তার আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিল। প্রথমে সেগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ভরদুপুরে যখন উত্তর কলকাতা জুড়ে ভাতঘুম নেমেছে তখন ছবি আঁকা শুরু করেছিল সংহিতা। খড়খড়িওয়ালা জানালা খুলে দিলে প্রচুর ছাদ দেখা যায়। সেখানে তারে তারে কাপড় শুকোচ্ছে। একটা ছাদে মধ্যবয়সি কোনও মহিলা, বোধহয় রোদের জন্যেই মাথায় ঘোমটা টেনে রাস্তা দেখছেন। ওই পটভূমিতে মহিলাকে আঁকতে চেষ্টা করছিল সংহিতা। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে সজোরে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি। এত দূর থেকেও তাঁর হাসির বন্যা বইছিল। তারপর ছুটলেন নীচের দিকে। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে তিনি কারও অপেক্ষায় ছিলেন। তার দেখা পেতে উচ্ছ্বসিত হলেন। ওই হাত নেড়ে উচ্ছ্বাস দেখানো ভঙ্গিটাকে ধরতে চাইল সংহিতা। স্কেচ শেষ হলে মন ভাল হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে যখন রঙের কাজ করছে তখন ঘরে ঢোকা কাজের মেয়ে দৃশ্যটা দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল। সংহিতা এমন তন্ময় হয়ে ছিল যে, ওর আসাটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু তার কিছুক্ষণ বাদে হইহই করে ঘরে ঢুকে পড়ল এ-বাড়ির বউরা। সবাই ছবি দেখতে চায়। দেখে মন্তব্য করা আরম্ভ হয়ে গেল। মেজবউ বলল, "এ তো সেজ। ওইভাবে হাসে।" সেজ বলল, "না না, অনেকটা মায়ের মতো দেখতে।" বড়বউ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ছবি আঁকো বলে শুনেছিলাম, ভালই আঁকো। কোথায় শিখেছ তুমি?"

"আর্ট কলেজে।"

"ওম্মা!" চোখ বড় করেছিল সেজবউ।

বাকিরা তাকিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু কিন্তু করে সেজবউ বলেছিল,

"শুনেছি সেখানে নাকি ভাড়া করে আনা মেয়েদের জামাকাপড় খুলিয়ে ছেলেমেয়েদের বলা হয় ছবি আঁকতে।"

"অ্যাঁ!" শব্দটা একসঙ্গে বেরিয়েছিল অনেকের গলা থেকে।

সন্ধেবেলায় ডাক পড়ল সংহিতার শাশুড়ির ঘরে। পালঙ্কে বসে পান চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "ওই ছবিটা দেখেছ?"

"হুঁ।"

"কার আঁকা জানো? রবি বর্মার। ওরকম ছবি কখনও আঁকতে পারবে?"

"বলতে পারছি না।"

"সে কী! বলতে যদি না পারো তা হলে ছবি আঁকছ কেন?"

"উনি ওঁর মতো আঁকতেন।"

"আমি অত মতোটতো জানি না। ঠাকুরদেবতার ছবি আঁকো, আমার কোনও আপত্তি নেই। না আঁকতে পারলে এই বাড়িতে বসে অন্য ছবি আঁকা চলবে না, এই তোমাকে বলে দিলাম। যাও, মাথা গরম করিয়ো না।" শাশুড়ি বালিশ টেনে হেলান দিলেন।

সংহিতা একবার আড়চোখে ছবিটাকে দেখল। ওটা তো ঠাকুরদেবতার ছবি নয়! কিন্তু শাশুড়ির মুখ বলছে তিনি আর কথা বলতে ইচ্ছুক নন। সে বেরিয়ে এল।

রাত্রে স্বামী যখন শোওয়ার জন্যে এল তখন কথাটা বলল সে। চুপচাপ শুনল সে। তারপর বলল, "এক কাজ করো। তোমার যদি ছবি আঁকার খুব ইচ্ছে হয় তা হলে দিনের বেলায় এঁকো না। আমি রাত্রে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলে যতক্ষণ পারবে এঁকো। রাতের ঘুমটা দুপুরে ঘুমিয়ে নিয়ো। কেউ জানতেই পারবে না।"

পথ বলে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু অনেকক্ষণ জেগেছিল সংহিতা। তাকে চোরের মতো ছবি আঁকতে হবে কোনওদিন ভাবেনি সে। তার চেয়ে না আঁকা অনেক বেশি সম্মানের।

প্রতিটি রাত স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকলে কেঁচো আচমকা সাপ হয়ে ছোবল মারতে শিখে যায়। এক রাত্রে তাই হল। দাঁতে দাঁত চেপে সেটা সহ্য করেছিল সংহিতা। কিন্তু পরের মাসেই বুঝতে পারল গোলমাল হয়ে গিয়েছে। মেজগিন্নির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাওয়াই কাল হল। তিনি উৎফুল্ল

হয়ে প্রচার করলেন, ন'বউয়ের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কীরকম মিশ্র অনুভূতি হয়েছিল তখন। সে মা হতে যাচ্ছে, তার সন্তান পৃথিবীতে আসছে ভেবে অন্যরকম উত্তেজনা হচ্ছিল। আবার সেই রাতে সে যে-কষ্ট পেয়েছিল, তাতে যে আসছে সে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আসছে, তাও তো সত্যি!

ক'দিন পরে শাশুড়ির ঘরে ডাক পড়ল। তিনি বললেন, "কাল সকালে কোনও খাবার দূরের কথা, চা-ও খাবে না। ভোর ভোর স্নান করে নেবে। লাল পাড় সাদা শাড়ি আছে?"

"না।"

"ওই টেবিলের ওপর নতুন শাড়ি রাখা আছে। নিয়ে যাও। ওটাই পরবে।"

"কাল কী হবে?"

"বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য মশাই কাল সকালে আসবেন। তাঁর সামনে তোমাকে বসতে হবে। ওঁকে আমি আমার বিয়ের পর এ-বাড়িতে দেখেছি। যা বলেন তার অন্যথা কখনও হয় না। যাও।"

মেজবউকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের কথা। সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ছুঁইয়ে মেজবউ বলেছিলেন, "খুব বড় সাধক গো। ঠিকুজি দেখে যখন মুখ খোলেন তখন সরস্বতী এসে ওঁর জিভে বসেন। প্রথমবার যখন আমি চ্যাঙারি ধরলাম," বলে খিকখিক করে হাসলেন মেজবউ, "মানে বুঝলে না? পেটে বাচ্চা এল গো! তখন শাশুড়িমা ওঁকে খবর দিলেন। তিনি ঠিকুজি পরীক্ষা করে বললেন, বাচ্চা যখন পৃথিবীতে আসবে তখন খুব সমস্যা হবে। বাড়িতে না রেখে হাসপাতালে দিয়ো। নইলে বাঁচাতে পারবে না। তাই শুনে শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী আসবে? ছেলে না মেয়ে? কষ্ট দিয়ে আসছে যে পরে সে সুখে রাখবে। ছেলে আসছে। তাই হল। কী ব্যথা, কী কষ্ট! নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। সেখানকার ডাক্তার তো এই মারে কি সেই মারে। এতদিন ডাক্তার না দেখিয়ে বাড়িতে ফেলে রেখেছিলেন কেন? ইঞ্জেকশন দিয়ে পেট কেটে বাচ্চা বের করল। খুব ভুগেছিলাম তখন।"

সংহিতা জিজ্ঞাসা করেছিল, "ছেলেই হয়েছিল?"

"হবে না?" চোখ ঘুরিয়েছিলেন মেজবউ, "বললাম না, ওঁর কথা মিথ্যে

হয় না। তারপর আরও দুটো এল। আগে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে পেট কেটে বের করা হল। তবে ডাক্তার বলে দিয়েছে আবার পেট কাটা যাবে না। দরকারই বা কী!"

পরের সকালে স্নান সেরে, লালপাড় সাদা শাড়ি পরে ঠাকুরঘরে যেতে হল সংহিতাকে। সেখানে একজন বেশ বৃদ্ধ মানুষ লাল কাপড় এবং লাল উড়নি গায়ে জড়িয়ে আয়োজনের তদারকি করছিলেন। শাশুড়িও স্নান করে গরদ পরে আসনের ওপর বসে আছেন। তাকে দেখে বললেন, "এসো। এই হল ন'বউমা।"

বৃদ্ধ মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। সংহিতা নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেলে আপত্তি জানালেন বৃদ্ধ, "না মা। এই ঘরে বিগ্রহ আছেন। তাঁর সামনে কোনও মানুষকে প্রণাম করলে তাঁকে অপমান করা হয়। আয়ুষ্মতী হও। বসো।"

বৃদ্ধের কথাগুলো খুব ভাল লাগল সংহিতার। সে একটি আসনে বসল। হাত দুটো কোলের ওপর রাখল। বৃদ্ধ এবার পুজো শুরু করলেন। স্পষ্ট উচ্চারণে ওঁর মতো সংস্কৃত মন্ত্র বলতে এর আগে কাউকে শোনেনি সংহিতা। শাশুড়ি হাতজোড় করে আছেন বন্ধ চোখে। পুজো শেষ হলে ওদের দু'জনকে দিয়ে অঞ্জলি দেওয়ালেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "আর সব কোথায়?"

শাশুড়ি বললেন, "আজ ওদের এখানে আসতে নিষেধ করেছি।"

"অ।" বৃদ্ধ বললেন।

"এবার আপনি বিচার করে বলুন।" সংহিতার ঠিকুজি এগিয়ে দিলেন শাশুড়ি। সংহিতার মনে পড়ল, এই ঠিকুজি বিয়ের আগে এ-বাড়ির চাহিদা মেটাতে দেওয়া হয়েছিল।

শাশুড়ি বললেন, "ন'বউমার বাড়ি থেকে বিয়ের আগে পাঠিয়েছিল। আপনি তখন যোশীমঠে ছিলেন। আমি বরদাবাবুকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলাম।"

ততক্ষণে ঠিকুজি দেখতে শুরু করেছেন বৃদ্ধ। বললেন, "বরদা তোমাকে ঠিক কী বলেছিল বলো তো?"

"প্রশংসাই করেছিল।"

"এই ঠিকুজিতে কিছু ত্রুটি আছে।" গম্ভীর মুখে বললেন বৃদ্ধ।

"সে কী!" চমকে উঠলেন শাশুড়ি, "বরদাবাবু তো কিছু বলেননি!"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। ঠিকুজি একপাশে সরিয়ে রেখে সংহিতার কপালের দিকে তাকালেন।

"কত বয়স?"

সংহিতা মুখ খোলার আগেই শাশুড়ি বলে দিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, "মানুষের জীবন হল পদ্মপাতায় জল। সবসময় টলমল করে। কারও বেশি কারও কম। তুমি প্রথম দলে। তা যতই ঝড় আসুক নিজের ওপর আস্থা হারিয়ো না। আর কখনওই স্বধর্মচ্যুত হয়ো না। এই জেদ যদি রাখতে পার তা হলে তুমি জয়ী হবে।"

কথাগুলো ওই বয়সে স্পষ্ট বুঝতে পারেনি সংহিতা। তবে মনে হয়েছিল তার খুব বিপদ হবে। কিন্তু ঠিকুজি বা কপাল দেখে একটা মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করলে তা সত্যি হয়ে যাবে?

শাশুড়ি বললেন, "এই বাড়ির বউ কখনওই বিপদে পড়ে না ঠাকুরমশাই। এখন বলুন ওর শরীর থেকে যে আসবে সে ছেলে না মেয়ে?"

হাসলেন বৃদ্ধ, "তুমি কী চাইছ?"

"অবশ্যই ছেলে।"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, "না। তোমাদের সংসারে মা লক্ষ্মী আসছেন।"

"অসম্ভব।" তীব্র প্রতিবাদ করলেন শাশুড়ি, "অনেক লক্ষ্মী এসেছে। আমার আর মেয়ে চাই না।"

"বিধাতার ইচ্ছে তুমি খণ্ডাবে কী করে!"

"আপনি নিশ্চিত ওর মেয়ে হবে?"

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন বৃদ্ধ।

শাশুড়ি সংহিতার দিকে তাকালেন, "যাও। এখন তুমি চা খেতে পারো।"

ঠিক এক মাস পরে এল সংহিতার জীবনের অন্যতম কালো দিন। সকালে শাশুড়ি তাকে বললেন, "এসেছে যখন তখন তাকে হেলাফেলা করে রাখতে পারি না। তৈরি হয়ে নাও। ডাক্তারের কাছে যাব।"

"কেন?"

"আশ্চর্য! এই সময়ে ডাক্তারকে দেখানো এখন রেওয়াজ হয়েছে। আমাদের সময়ে এসব ছিল না। যা হওয়ার বাড়ির আঁতুরঘরেই হত। চলো।"

বাড়ির গাড়িতে চেপে শাশুড়ির সঙ্গে নার্সিংহোমে গিয়েছিল সংহিতা। গিয়ে দেখেছিল ডাক্তার একজন মহিলা। দেখে স্বস্তি পেয়েছিল সে। ভদ্রমহিলা তাকে পরীক্ষা করে নার্সকে বললেন ভেতরে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশন দিতে।

তাকে একটা উঁচু বেডে শুইয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার ঘুম এসে গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন একটা সাদা ঘরে সে একা শুয়ে আছে। শাশুড়ি বা ডাক্তার ধারে কাছে নেই। সে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু পরদা সরিয়ে একজন আয়াগোছের মহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, "না না। শুয়ে থাকুন। অন্তত আরও এক ঘণ্টা।"

"কেন? কী হয়েছে আমার?"

"কিছুই টের পাচ্ছেন না?"

চোখ বন্ধ করে ভাবতেই তলপেটে চিনচিনে অনুভূতি টের পেল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে বলুন তো?"

"আপনি কী জন্যে এসেছিলেন জানেন না?"

সংহিতাকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে আয়া হাসল, "দেখে মনে হচ্ছে বেশি দিন বিয়ে হয়নি। এর মধ্যে অনেকগুলো বাচ্চা হয়ে গেছে?"

দ্রুত মাথা নেড়েছিল সংহিতা, "আমার ওসব এখনও হয়নি।"

চোখ কপালে তুলেছিল আয়া, "সে কী! হায় কপাল!" তারপর ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। কিন্তু ফিরে এসেছিল আরও দু'জন মহিলাকে নিয়ে। তারা এসে কয়েকটা প্রশ্ন করার পর আয়া বলল, "এরকম শাশুড়ি কখনও দেখিনি বাপু। জেনেশুনে বউয়ের সর্বনাশ করে গেল!"

দ্বিতীয়জন মহিলা হেঁয়ালি সরিয়ে রেখে জানাল, "তোমার পেট থেকে শত্রুটাকে বের করে দিয়েছে গো। শত্রুই বলব। ওর জন্যেই তো তোমার এই হেনস্তা!"

আচমকা ঠান্ডা হয়ে গেল শরীর। চোখের কোণে জল জমল।

তৃতীয়জন বলল, "তোমার বর জানে না? বাচ্চা হয়নি এখনও, পেটে যেটা এল প্রথমবার তাকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে আর সেটা তো তার অজানা থাকতে পারে না!"

সংহিতা ধীরে ধীরে উঠে বসল। আয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথায় যাবে? বাথরুমে?"

"না। আমি ঠিক আছি।"

দ্বিতীয়জন বলল, "দু'মাস যখন হয়নি তখন ঠিক হয়ে যাওয়াই তো উচিত।"

সংহিতা উঠে দাঁড়াল। শরীরে একটু ঝিমঝিম ভাব।

আয়া বলল, "সন্ধের পরে তোমার শাশুড়ি এসে নিয়ে যাবে।"

শেষপর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিল সংহিতা, "আপনারা আমার একটা উপকার করবেন?"

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী করতে হবে?"

"একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন, প্লিজ!"

"কোথায় যাবে?"

"আমার বাবা-মায়ের কাছে।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আয়া বলেছিল, "ঘর থেকে চলে গেলে সব দায় তো আমার ওপর চাপবে। হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। শাশুড়ি সন্ধেবেলায় এসে ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ?"

প্রথমজন বলল, "ও চলে যাওয়ার পর চিৎকার করবি, বাথরুমে গিয়েছিলি ফিরে এসে দেখছিস নেই। তোর কোনও দোষ কেউ দেবে না।"

"কিন্তু ট্যাক্সি ডাকতে গেলে তো সবাই দেখবে। দারোয়ানটা চুকলি কাটবে।" দ্বিতীয়জন বলল, "তুমি যদি সত্যি যেতে চাও তা হলে এক কাজ করো। এই ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকের সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যাও। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটু হাঁটলেই গলির দরজা পাবে। সেই গলি ধরে এগোলেই বড় রাস্তায় পড়বে।"

প্রথমজন বলেছিল, "কিন্তু আর একবার ভেবে দেখো, তুমি এভাবে চলে গেলে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে।"

তৃতীয়জন বলল, "রাখো তো! যা করল তার পরেও সম্পর্ক ভাল আছে নাকি!"

হাঁটতে একটু আড়ষ্ট ভাব প্রথম দিকটায়, একতলায় নামতে নামতে সেটা চলে গেল। রান্নাঘরের দরজা তখন বন্ধ, লোকজন যারা ছিল তারা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে যখন গলিতে পা দিচ্ছে তখন আয়ার গলা শুনতে পেল। চিৎকার করে বলছে, "এ কী! পেশেন্ট কোথায়? আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম, এর মধ্যে পেশেন্ট কোথায় গেল!"

দ্রুত হাঁটতে লাগল সংহিতা। বড় রাস্তায় পড়ে কিছুটা যেতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। দরজা খুলে বাপের বাড়ির পাড়ার কথা বলতেই সর্দারজি মাথা নেড়ে ট্যাক্সি চালু করল। পিছনের সিটে মাথা হেলিয়ে বসে রইল সংহিতা। তার হাতে শাঁখা লোহা ছাড়া শরীরে কোনও গয়না নেই। নার্সিংহোমে আসবার সময় শাশুড়ি বলেছিলেন, খুলে রাখতে। তাই নাকি রাখতে হয়।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়েই মনে পড়ল তার সঙ্গে একটাও টাকা নেই। সে ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির দরজায় বেল বাজাল। একটু বাদে বাবা দরজা খুলতেই গম্ভীর গলায় বলল, "আমি ওই ট্যাক্সিতে এসেছি, তুমি ভাড়াটা দিয়ে দাও তো!"

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে সে সোজা চলে গেছে নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকেই তার মনে হল, সে এত আপসেট হচ্ছে কেন? শাশুড়ি তো তার উপকারই করেছেন। তাকে যন্ত্রণা দিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক করে কনসিভ করিয়েছিল লোকটা। ওই অনিচ্ছার ফসল শরীর থেকে বের করে দিয়ে তাকে হালকা করে দিয়েছে ওরা।

ওই সময় মা এসে দাঁড়াল। আপাদমস্তক তাকে দেখে বলল, "কখন খেয়েছিস?"

"ভুলে গেছি।"

"কাপড় বের করে দিচ্ছি। বাথরুম থেকে ঘুরে আয়।" মা চলে গেল।

কোনও প্রশ্ন নয়, উদ্বেগে ভেঙে পড়া নয়, মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল সংহিতা।

ফোনটা বাজছিল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না, তবু উঠতে হল।

হ্যালো বলতেই মিলার গলা, "শোনো, আমি আজ ফিরছি না।"

"যা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর এরকম কেন?"

"কীরকম? ধ্যুৎ। আচ্ছা, তুমি আমাকে একবারও বললে না যে, অনীশ সোম এই পৃথিবীতে নেই। তুমি জানতে না?"

"আমি গতকালই জেনেছি। তোমাকে দেখার আনন্দে ওটা ভুলে গেছি।"

"আনন্দ? আচ্ছা, ডু ইউ বিলিভ যে, মৃত্যুর পরে মানুষ আনন্দিত অথবা দুঃখিত হয়? কী? বিশ্বাস করো?"

অস্বস্তিটা শুরু হয়ে গেল। সেটা কাটাতে বলল, "আমি কী করে জানব,

মারা গেলে জানতাম, তবে ফিরে এসে জানাতে পারতাম না।”

“কেন?”

“বাঃ, আমার শরীর পুড়িয়ে ফেলা হত না?”

“কিন্তু আমি লোকটাকে ফিল করছি। কতবার বলেছে, চলো আমার সঙ্গে, সিমলা যাচ্ছি, ব্যাঙ্কক যাচ্ছি। যেতে যে ইচ্ছে করত না তা নয় কিন্তু—! আসলে ওকে শিল্পী এবং বন্ধু হিসেবে খুব পছন্দ করতাম, আমার চেয়ে অনেক বড় বয়সে, সেটা কেয়ার করতাম না কিন্তু ওকে দেখে আমার শরীর রি-অ্যাক্ট করত না। কী করব। বেচারা! বুঝলে আজ হোটেলে ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাত্র এক ঘণ্টা। ঘুম ভাঙলে মনে পড়ল অনীশ সোমের কথা। ফোন করলাম। ওর বাড়ির কেউ বলল অনীশ নেই। কবে মরে গেছে জিজ্ঞাসা করিনি কিন্তু ফোন না করা পর্যন্ত তো ও আমার কাছে জীবিত ছিল। তাই না?” মিলা বলল।

“তুমি ড্রিঙ্ক করেছ?” সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

“এখনও করছি। আসলে সেলিব্রেট করছি।”

“সেলিব্রেট?” চেঁচিয়ে উঠল সংহিতা।

“ইয়েস। আমার শোক, আমার কষ্ট, আমার দুঃখকে সেলিব্রেট করে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে আবার তাজা হয়ে যেতে চাই। বাই!”

মিলা ফোন রেখে দিল। সংহিতার মনে হল মিলারা এভাবেই ভাল থাকে!

রাত্রে খেতে ইচ্ছে করছিল না। দুপুরে যা দিয়ে গিয়েছিল তার অর্ধেকই ফ্রিজে পড়ে আছে। ওভেনে গরম করে নেওয়া যায়। কিন্তু সিক্তার নিয়ে আসা দুধে চিনি মিশিয়ে এক গ্লাস খেয়ে মনে হল এতেই হয়ে যাবে। অনেকদিন পরে ঠান্ডা দুধ খেয়ে মন্দ লাগল না।

অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি শুতে যাচ্ছিল সংহিতা। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই বয়স্কা গলা কানে এল, “মেমসাহেব বলছেন? আমাকে আপনি চিনবেন না। ওই যে রিক্তা বলে, যে-মেয়েটা আপনার কাছে কাজ করে সে আমাকে মাসি বলে ডাকে।”

“আপনার কথা ওর কাছে শুনেছি।”

“হ্যাঁ, হয়েছে কী, তাকে পুলিশ থানায় আটকে রেখেছে।”

“সে কী? কেন?” চমকে উঠল সংহিতা।

"লোকটার সঙ্গে এতদিন ছিল, মায়া পড়ে গিয়েছিল বলে দেখতে এসেছিল সে। যেহেতু ওর সঙ্গে এতদিন ছিল তাই পুলিশ ভাবছে রিক্তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু রিক্তাকে যে লোকটা কিছুই বলেনি, আঁধারে রেখেছিল, তা পুলিশ বিশ্বাস করতে চাইছে না। আমিও বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। সবাই বলছে পেট থেকে কিছু বের করতে পারলেও জেলে পুরবে, না পারলে আদালতে তুলে আরও জেরা করার অনুমতি নেবে। আহা রে! আমি ফোন করে খবরটা না জানালে ওর এত বড় বিপদ হত না।"

"কোথায় রেখেছে তাকে?"

"এই তো ঝাড়গ্রাম থানায়।" মাসি বলল, "তুমি ওকে রক্ষা করতে পারো না মেমসাহেব?"

"দেখছি।" লাইন কেটে দিল সংহিতা।

মেয়েটার কপালে এসব ছিল? আর ঘুম এল না। এখন রাত ন'টা। কলকাতায় কোনও রাতই নয়। ঝাড়গ্রামে? কী করা যায়? উকিলের সঙ্গে কথা বলবে? ওকে ছাড়ানোর জন্যে উকিলকে বলবে আদালতে যেতে? তার মনে হল সিক্তা মেয়েটা সত্যিই ভাল, কোনওদিন তাকে অসুবিধায় ফেলেনি। কী করা যায়?

হিমাদ্রি সেনগুপ্তের কথা মনে এল। প্রবীণ শিল্পী। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরাও ওঁকে খুব সম্মান করেন। ফোন করতেই হিমাদ্রি সেনগুপ্ত রিসিভার তুললেন, "কে?"

"আমি সংহিতা।"

"ও! কী খবর! তোমার কাছে কার্ড যাবে অনীশের স্মরণসভার।"

"না দাদা, আমি অন্য ব্যাপারে ফোন করছি।"

"বলো।"

"আমার কাছে যে-মেয়েটি কাজ করে সে খুব ভাল। যার সঙ্গে সে ঝাড়গ্রামে থাকত তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে চলে এসেছিল। সেই লোকটি পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিল। পুলিশ তাকে ধরে রেখেছে, ভাবছে ও লোকটার সব খবর জানত। অথচ ও নিতান্তই ইনোসেন্ট। কী করা যায়?"

"ঝাড়গ্রাম খুবই সেন্সসিটিভ এলাকা! তুমি এক কাজ করো, ওহো,

তোমার শেষ এগজিবিশনে আমি রমেশ চাকলাদারকে দেখেছিলাম। সে এখন আইজি। তুমি ওঁকে ব্যাপারটা খুলে বলো।”

“কোন ভদ্রলোক বলুন তো?”

“লম্বা, গোঁফ আছে, ষাটের কাছেই বয়স হবে। খুঁজে দেখো কার্ড পাও কিনা। না হলে কাল সকালে আমি ওকে ফোন করব। রাখছি।”

প্রতিটি এগজিবিশনে এসে অনেকেই তাকে কার্ড দিয়ে থাকেন। ক্রেতারা তো বটেই, তা ছাড়াও অনেকে পরিচয় রাখতে দিয়ে থাকেন।

যে-ড্রয়ারে কার্ডগুলো রাখা হয় সেটা খুলে দেখতে লাগল সংহিতা। শেষপর্যন্ত সে রমেশ চাকলাদারের কার্ড দেখতে পেল। ঘড়িতে এখন ন’টা কুড়ি। এই সময় প্রায় অপরিচিত কোনও মহিলা ফোন করলে ভদ্রলোক কীভাবে নেবেন! তবু, সিক্তার কথা ভেবে ফোন না করে পারল না সংহিতা।

ফোন বাজছে। তারপরই ভারী গলা, “স্পিকিং।”

“আমি কি মিস্টার চাকলাদারের সঙ্গে কথা বলছি?”

“হ্যাঁ। আমি রমেশ চাকলাদার।”

“নমস্কার। এই সময়ে বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি। আমি ছবি আঁকি। আমার এগজিবিশনে আপনি এসেছিলেন। আমি সংহিতা রায়।”

“হোয়াট এ সারপ্রাইজ। বলুন, কী করতে পারি?”

সংহিতা যতটা সংক্ষেপে সম্ভব সিক্তার ব্যাপারটা ভদ্রলোককে জানাল। সব শুনে মিস্টার চাকলাদার বললেন, “আমি খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু আপনি কি দায়িত্ব নিয়ে বলছেন মেয়েটি সম্পূর্ণ নির্দোষ?”

“হ্যাঁ। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।”

“আপনি কতক্ষণ জেগে আছেন?”

“আছি।”

“আপনাকে আধঘণ্টার মধ্যে আমি ফোন করছি।”

পুলিশের ওপরতলায় অফিসাররা এখন অনেক বদলে গিয়েছেন বলে শুনেছিল সে। এখন তাঁরা অনেক বেশি সামাজিক মানুষ হয়েছেন। কিন্তু মিস্টার চাকলাদার যে এমন সুন্দর ব্যবহার করবেন তা আশা করেনি সে।

পঁচিশ মিনিট পরে ভদ্রলোকের ফোন এল, “পুলিশ শুধু সন্দেহের বশে মেয়েটিকে আটক করেছে। অ্যারেস্ট করেনি। ও যে বহু দিন কলকাতায়

ছিল এইটে ওর পক্ষে যাচ্ছে। যা হোক, ওকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম থেকে আসতে যতক্ষণ লাগে। আপনি ঝাড়গ্রামের এসপি-কে একটা চিঠি লিখে রাখুন। তাতে বলুন মেয়েটি নির্দোষ। যদি কখনও তদন্তের প্রয়োজনে মেয়েটিকে দরকার হয় আপনি ওকে পৌঁছে দেবেন। যে-পুলিশ অফিসার ওকে নিয়ে আপনার বাড়িতে যাচ্ছে তার হাতেই চিঠিটা দিয়ে দেবেন। সমস্ত ব্যাপারটা একটা রুটিন চেক-আপ। আচ্ছা, নমস্কার।"

রমেশ চাকলাদার ফোন রেখে দিলেন।

কৃতজ্ঞ মনে চিঠিটা লিখল সংহিতা। খামে বন্ধ করে ওপরে এসপি-র ঠিকানা লিখে ভাবল সিক্তা নিশ্চয়ই তাকে বিপদে ফেলবে না। সে যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তা হলে এই কাজটা করাতে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু সত্যি না হলে? নাঃ। বিশ্বাস হারাবে না সে।

রাত আড়াইটের সময় গেট থেকে গার্ড ফোন করে জানাল পুলিশের গাড়ি এসেছে। তাদের আসতে বলে তৈরি হল সে। একটু পরেই বেল বাজল। একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার বললেন, "ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম।"

"অনেক ধন্যবাদ। আপনি এই চিঠিটা এসপি-কে দিলে খুশি হব।"

খাম নিয়ে ভদ্রলোক চলে যেতে দরজা বন্ধ করল সংহিতা। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল সিক্তা। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সংহিতা বলল, "ফ্রিজে খাবার আছে। খিদে থাকলে খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

ঘুমের ওষুধ খেতে হল আজ। সিক্তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তার কারণেই সংহিতা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে এবং আর যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয় তাই নিঃসাড়ে রয়েছে। মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে পেরে বেশ ভাল লাগছিল সংহিতার। এই উদ্যোগ না নিলে এবং মিস্টার চাকলাদার সাহায্য না করলে কত বছর ওকে জেলের ভেতরে থাকতে হত কে জানে! খবরের কাগজে এমন ঘটনা কয়েকবার পড়েছে সে। পাশ ফিরে শুল সংহিতা। সমস্ত শরীর জুড়ে এখন ঘুমঘুম ভাব।

আকাশে নীল আলো। সে একা দাঁড়িয়ে এক জঙ্গলের সামনে। গভীর জঙ্গল কালচে হয়ে রয়েছে। হঠাৎ ফিসফিসানি কানে এল, "এই জঙ্গল হল নরকে যাওয়ার দরজা।" সে মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই। সেই

মিছিল উধাও। আবার ফিসফিসানি শুনতে পেল সে, "এই দরজা দিয়ে নেমে গেলে প্রথমে একটা পুণ্য চরাচর দেখতে পাবে। নরকের ঊর্ধ্বভাগ ওখান থেকেই শুরু। প্রথমেই অপেক্ষা করার জায়গা। অথবা মৃত শিশু বা বালকদের অবস্থানক্ষেত্র। তার নীচে সেইসব ব্যক্তি যারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে সংযম হারিয়েছিল। তারা হয় কামুক কিংবা লোভী অথবা ক্রোধে অন্ধ হয়েছিল। এর পরের স্তরে সেইসব আত্মার জায়গা হয় যারা ধর্মে অবিশ্বাসী ছিল। তারা অত্যাচার এবং ধ্বংসে মাতাল হয়ে থাকত। এর পরে দীর্ঘক্ষেত্র ধরে জলপ্রপাত, যা দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে অনন্তকাল। সেটা পার হলেই নরকের নিম্নদেশে পৌঁছে যাবে। ওই নিম্নদেশে কাদের জায়গা হয়?

এটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি জটিল অন্যটি অপেক্ষাকৃত সরল। প্রথমটিতে নারীপাচারকারী অথবা ভোগী পুরুষের দালাল, ধর্ষণকারী, চাটুকার, ধর্মকে যে অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়, খারাপ আত্মাদের সঙ্গে যারা যোগাযোগ থাকার কথা বলে, চোর বদমাশদের অনন্তকাল শাস্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। দ্বিতীয় ধাপে যাবতীয় জঘন্য অপরাধীদের পাঠানো হয় চূড়ান্ত শাস্তির জন্যে। মনে রেখো এই জঙ্গলের দরজা দিয়ে নরকে পা দেওয়ামাত্র তুমি শয়তানের অধীন হয়ে যাবে। কারণ পৃথিবীর ওই পাপীদের একমাত্র শয়তানই শাসন করতে পারে। আর এও জেনে রেখো শয়তানের একমাত্র প্রভু হলেন পরমাবতার।"

কথাগুলে শেষ হওয়ামাত্র সে অবাক হয়ে দেখল তাকে হাঁটতে হচ্ছে। এখন মিছিলটা ছোট হয়ে গেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে ধীরে ধীরে চলছিল সে।

ছবি আঁকছিল সংহিতা। এখন ঘড়িতে এগারোটা। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সিক্তা যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে। চা দিয়েছে ঠিক সময়ে, ব্রেকফাস্টও। একটু আগে বাজারের টাকা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওকে কোনও প্রশ্ন করতে চায়নি সংহিতা। বোঝাই যাচ্ছে গত দিনে হাজারটা প্রশ্ন করেছে পুলিশ, নাজেহাল হয়েছে বেচারি।

ছবিটা যখন অনেকটাই এগিয়েছে তখন খেয়াল হল সংহিতার। রোজ রাত্রে ঘুমের মধ্যে সে ওইসব দৃশ্য দেখছে কেন? সে মারা যায়নি, দিব্যি বেঁচে ছবি আঁকছে তা হলে মৃত্যুর পরে যে-যাত্রা, তার শরিক হচ্ছে কেন? কোনও মনস্তাত্ত্বিকের কাছে গেলে তিনি কি এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন?

কার কাছে যাওয়া যায়? এই মুহূর্তে কোনও মনস্তাত্ত্বিকের নাম মনে পড়ল না। হঠাৎ হাসি পেল তার। সেদিন বাবা তাকে মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিন তিনটে মাস সে বাইরে বেরোনো দূরের কথা ঘরের বাইরে পা দেয়নি। একটা বিছানা, অ্যাটাচ্‌ড বাথ, কিছু পাঠযোগ্য বই আর দু'বেলা খাবার পেলে পৃথিবীর কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না। সমস্ত কিছু শোনার পর মা বলেছিলেন, "এই ব্যাপারটাকে তুমি দু'রকম চোখে দেখতে পারো। অনেকেরই প্রথম সন্তান অকালেই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকলেও ধরে রাখার ক্ষমতা তাদের থাকে না। ডাক্তাররা অনেক চিকিৎসা করে, তাকে নিয়মের মধ্যে রেখে শেষপর্যন্ত মা করতে পারেন। ধরে নাও, তোমার ক্ষেত্রে প্রথমবার তাই হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারটায় তুমি যখন এত অপমানিত বোধ করছ তখন স্থির করে নাও কখনওই মা হবে না। ওই বাড়িতে যেমন ছিলে তেমন থাকবে কিন্তু তোমার স্বামীকে কখনওই প্রশ্রয় দেবে না। এখন ভেবে দেখো—।"

"ভাবার আর কিছু নেই।" সংহিতা জবাব দিয়েছিল।

"উত্তরটা কিন্তু স্পষ্ট হল না।" মা বললেন।

"আমি ওদের সহ্য করতে পারছি না। কাউকেও না।"

"তোমার স্বামী কি ব্যাপারটা জানত?"

"যে-লোক আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের লালসা মিটিয়ে চোরের মতো থেকে গিয়েছিল সে যে হাবা কালা বোবা তা ভাবতে পারছি না।" সংহিতা ফোঁস করে উঠেছিল।

মা আর কথা বাড়াননি। বাবা দু'বেলা আসতেন ঘরে। বলতেন, "তুই যে এত নির্বোধ তা আমি কখনও জানতাম না।"

"মানে?"

"এই ঘরে বই নিয়ে পড়ে আছিস! কেন? তোর তো কাজ করা উচিত। ছবি আঁক। এই তো সময় ছবি আঁকার!" বাবা বলেছিলেন।

"এই তো সময় কেন?"

"যন্ত্রণা না থাকলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি আনন্দ এনে দেয়। তুই অপমানিত হয়েছিস, সেই অপমানের প্রতিশোধ হবে ছবি আঁকা।"

"আমার ইচ্ছে করে না।"

"ওই জন্যে তোকে নির্বোধ বললাম। যে-মানুষের মনে জেদ নেই তার কিছুই নেই।" বাবা উঠে গিয়েছিলেন।

তখনই মনে পড়েছিল সেই বৃদ্ধের কথা, "যতই ঝড় আসুক নিজের ওপর আস্থা হারিয়ো না। এই জেদ যদি রাখতে পারো তা হলে তুমি জয়ী হবে।"

ঘর থেকে বের হল সংহিতা। বিয়ের আগে বাবা তার ছবি আঁকার জন্যে একটা ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিন কী আঁকব আঁকব করে চলে গেল। কয়েকদিন হিজিবিজি অনেক কিছু।

এক সকালে বাবা এসে বললেন, "তোকে বলা হয়নি। তুই যেদিন নার্সিংহোম থেকে চলে এলি সেদিন আমি থানায় গিয়ে সব কথা জানিয়ে ডায়েরি করেছিলাম। থানা থেকে নার্সিংহোমে তদন্ত করতে গিয়েছিল। তুই অ্যাডাল্ট হওয়া সত্ত্বেও তোর দেওয়া কনসেন্ট লেটার নেই, আগে কোনও ইস্যুও ছিল না, ডাক্তার স্বীকার করেছে তোর শাশুড়ির পীড়াপীড়িতে ওটা করা হয়েছে। এই অবস্থায় পুলিশ তোর শাশুড়ি এবং ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করে মামলা শুরু করতে পারত। কিন্তু তোর শাশুড়ি টেলিফোনে অনেক রিকোয়েস্ট করলেন, প্র্যাক্টিক্যালি ক্ষমাই চাইলেন। এখন বল, তুই কি ডিভোর্স চাস?"

"অবশ্যই।"

"ক্ষতিপূরণ চাইবি?"

"এই ক্ষতি কীভাবে পূর্ণ করবে ওরা? টাকা দিয়ে করা যায়?"

"ঠিক বলেছিস। তা হলে আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলি?" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

"বলো।"

উকিল বলেছিলেন, "ডিভোর্সের সঠিক কারণ আদালতকে বললে ওদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল কেস শুরু হয়ে যাবে। আপনারা যখন তা চাইছেন না তখন মিউচুয়াল ডিভোর্সে যান। অপনেন্ট পার্টি এক কথায় রাজি হয়ে যাবে।"

তাই হল। কিন্তু তার কয়েকদিন বাদে বাবা বললেন, "ছেলেটি ফোন করেছিল।"

"কোন ছেলে?" সংহিতা তাকাল।

"যার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল।"

"সে কী? হঠাৎ?"

"বলল, আমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে এসে কথা বলতে চায়।"

"নিশ্চয়ই মায়ের আদেশে ফোন করেছিল।"

"মনে হল না। বলল, আমার নিজের মনে হচ্ছে কথা বলা দরকার।"

"তুমি কী বললে?"

"বললাম, ডিভোর্সের মামলা যখন ফাইল হয়েছে তখন আর কথা বলে কী হবে!"

মা ঘরে ঢুকছিলেন, বললেন, "কী বলতে চায় শোনা উচিত ছিল!"

বাবা বললেন, "কী আর বলবে! মায়ের বিরুদ্ধে তো যেতে পারবে না।"

সংহিতা বিরক্ত হল, "তোমরা কী বলো তো! যদি সে মায়ের বিরুদ্ধেও যায় আমি কি তাকে মেনে নিতে পারব?"

"সেটা কথা না বলে কী করে বুঝবি। ওর মা যে এমন কাণ্ড করছে তা হয়তো সে জানতই না।" মা বললেন।

"হ্যাঁ। কচি খোকা!" সংহিতা নিচু গলায় বলল, "সেই রাত্রে সে যখন আমাকে রেপ করেছিল তখন মনে ছিল না! সেটা না করলে এসব ঘটনা ঘটতই না!"

শেষপর্যন্ত ডিভোর্স হয়ে গেল। আদালতে শাশুড়ি আসেননি কিন্তু ওদের উকিলের সঙ্গে শাশুড়ির ছেলে এসেছিল। রায় বেরুবার আগেও দু'বার আদালতে যেতে হয়েছিল সংহিতাকে, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনি। রায় বের হওয়ার পরে ছেলেটা সটান চলে এল তার সামনে, "আমি কিছুই জানতাম না। এদেশে এখনও কন্যাসন্তানকে মেরে ফেলার কথা ভাবা হয় এবং মেয়েরাই সেটা করে তা ভাবতে পারিনি। একটা কথাই শুধু বলছি, এর প্রতিবাদে আমি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। চলি।"

বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল সংহিতা। মানুষটাকে এতটা কাল মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হত তার, সে কী করে এত বদলে গেল?

তখন থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করল সংহিতা। একদিন ছবিটা এঁকে ফেলল। মাতৃগর্ভে শিশু আর দৈত্যের বদলে একটি ভয়ংকর চেহারার স্ত্রীলোকের পা সেই শিশুকে লাথি মারছে।

যেদিন ছবিটা আঁকা শেষ হল সেদিনকার কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিল। উলটোডাঙার কাছে রেললাইনে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।

সম্ভবত ট্রেনে ধাক্কা খেয়ে মারা গিয়েছে যুবকটি। এরকম খবর প্রায়ই কাগজে বের হয়। নাম না জানা সেই যুবকটির মুখ দেখতে খুব ইচ্ছে হত সংহিতার!

ঠিক বেলা বারোটা নাগাদ মিলা চলে এল। বোধহয় গতকাল গেটের সিকিউরিটি ওকে চিনে গিয়েছিল বলে সোজা লিফ্‌টে চড়ে তার দরজার বেল টিপতে পেরেছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ওদের বলে দিতে হবে যখনই কেউ আসবে তাকে ফোন করে জেনে নিতে হবে। মিলার ক্ষেত্রে নয়, অনেক সময় কেউ কেউ প্রয়োজনে দেখা করতে আসে, দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে তার নাও হতে পারে।

মিলা এখন ঝকঝকে। হোটেল থেকে স্নান করে নীল শাড়ি পরে এসেছে। সিকিউরিটির একজন ওর দুটো সুটকেস নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। মিলা দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "চলে এলাম। তিনদিন থাকব।" না, আজ মিলা চুমু খেল না বলে স্বস্তি হল। নিশ্চয়ই সিক্তা ওদের দেখছে।

"চলো, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।" বলেই সংহিতা গলা তুলল, "সিক্তা, ওই সুটকেস দুটো গেস্টরুমে নিয়ে আসতে পারবে?"

সিক্তা বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। নিচু হয়ে একটা ভারী সুটকেস তুলল।

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "ও, তুমি! কী নাম?"

আড়চোখে সংহিতাকে দেখে নিয়ে সিক্তা বলল, "সিক্তা।"

"বাঃ। এই নাম তো কখনও শুনিনি। হাইট কত?"

সিক্তা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। সংহিতা হেসে ফেলল, "এই প্রশ্নটাও ও জীবনে কখনও শোনেনি! কী করবে? ফ্যাশন প্যারেডে নামাবে নাকি!"

"না না। অ্যাভারেজ বাঙালি মেয়ের থেকে ও অনেক লম্বা, তাই না?"

গেস্টরুমে স্থিতু হওয়ার পরে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "কাল ওইভাবে মদ গিললে কেন?"

"জানি না। কতদিন পরে হুইস্কি খেলাম নিজেই জানি না। ওদেশে কেউ জোর করলে একটু ওয়াইন খেয়েছি কখনও সখনও। হুইস্কি আমাকে কখনওই টানে না। কাল অনীশদার মৃত্যুর খবর পেয়ে কীরকম নড়ে গেলাম। ওঁর বাড়িতে ফোন করলাম। অনীশদার স্ত্রী খুব খারাপ ব্যবহার করল। প্রায় স্ল্যাং-এর কাছাকাছি শব্দ বলল, তুমি ভাবতে পারো!" মিলা বলল।

"সে কী! কেন?"

"অনীশ সোমের তো প্রচুর মেয়েভক্ত ছিল। লোকটা যে মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করত তা সবাই জানি। এইসব মেয়েরাই বোধহয় মৃত্যুর খবর পেয়ে ফোনের পর ফোন করে গেছে। তাতেই ইরিটেটেড হয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। মন খারাপের সঙ্গে অপমানবোধ মিশে গেলে যে-অনুভূতি হয় সেটা থেকে মুক্তি পেতে হুইস্কির অর্ডার দিয়েছিলাম। যাই বলো, কাল মনে হচ্ছিল শোকটাকে বেশ সেলিব্রেট করছি।" মিলা শব্দ করে হাসল, "ছেলেবেলায় শুনতাম হিন্দুদের আত্মা নাকি শ্রাদ্ধের পর স্বর্গ বা নরকে চলে যায়। শ্রাদ্ধের তো দেরি আছে, তা হলে অনীশদার আত্মা নিশ্চয়ই এখানে আছে। ঘুরপাক খেতে খেতে এইসব কথা শুনছে!"

আচমকা শিরশির করে উঠল সমস্ত শরীর। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "এ কী! তোমার গায়ে কাঁটা ফুটছে কেন? কথাগুলো শুনে ভয় পেলে নাকি। দুর! ওসব স্রেফ কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। খ্রিস্টানদের তো মারা যাওয়ার পরেই, আই মিন জার্নি আফটার ডেথ শুরু হয়ে যায়। তাই ধরলে অনীশ সোম এখন বহু দূরে চলে গেছেন।"

"কোথায় যেতে পারেন তিনি? স্বর্গ না নরকে?" মৃদুস্বরে বলল সংহিতা।

"তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো তা হলে আমার অনেস্ট উত্তর হবে, নরক।"

"বাঃ! কেন?"

"স্বর্গে, যা শুনেছি, কোনও বৈচিত্র্য নেই। সৎ, ভাল এবং সরল মানুষগুলো সেখানে ভগবানের নাম জপ করছে। কিন্তু নরকে যারা যায় তাদের কত বিচিত্র ধরনের চেহারা, কেউ খুনি, কেউ মাতাল, কেউ ধর্ষক, কেউ চোরাকারবারি, কেউ আত্মহত্যা করে গেছে। আমার তো ধারণা পৃথিবীর সব মৃত রাজনৈতিক নেতাদের সেখানে গেলে দেখা যাবে। ছবির সাবজেক্ট হিসেবে এরা কী দারুণ লোভনীয় ভেবে দেখো!" মিলা বলল।

সংহিতা উঠল, "কিন্তু সেখানে গেলে তোমাকেও তো নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।"

"আরে, যতক্ষণ মরছি না ততক্ষণ এরকম ভাবলে মন্দ কী!" মিলা বলল।

"তুমি তো স্নান সেরে এসেছ। খাবার দিতে বলি।"

"খাবার? নাঃ। আজ অনেকটা ব্রেকফাস্ট করেছি।"

"একটু খাও।"

"কী আছে?"

সংহিতা সিক্তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল, "শুক্ত, কলাইডাল, চিংড়িপোস্ত, আড়মাছের কালিয়া।"

"শুক্ত? পোস্ত? শাবাস! কতদিন খাইনি। ঠিক আছে, চলো, আসছি।"

দুপুরের খাওয়ার পর মিলার বৃত্তান্ত শুনল সংহিতা। আপাতত তার ছয় মাসের ডেরা হল ভিয়েনা শহরে। দুটো ঘরের ফ্ল্যাটে সে থাকে। একটাতে আঁকে অন্যটায় বাকি কাজকর্ম। বছরে চারটে এগজিবিশন করে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। সোলো। ছবি থাকলে গ্যালারি চাইলে অন্যদের সঙ্গেও দেয়। ইউরোপে এখন তার পনেরো জন স্টেডি কাস্টমার আছে। এরা ছবি কেনে স্রেফ ব্যাবসা করবে বলে। ভিয়েনার শিল্পবিষয়ক কাগজে তার ছবির কথা প্রায়ই লেখা হয়। ওই পনেরো জন ছাড়াও এগজিবিশনে এসে পছন্দ হলে ছবি কিনে নিয়ে'যায় অনেকেই। ফলে তার টাকাপয়সার অভাব হচ্ছে না। সে স্থির করেছে পঞ্চাশ পর্যন্ত এই জীবনযাপন করবে। তারপর সুইজারল্যান্ডের কোনও ভ্যালিতে ছোট্ট বাড়ি কিনে বাকি জীবনটা থাকবে।

সংহিতা বুঝল মেয়েটা জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছে। এই সাহস ক'টা মেয়ের থাকে! সাহসী হয়েও অনেকে তলিয়ে যায়। মিলা যায়নি এটা ওর কপাল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আর বিয়ে করোনি?"

"আর মানে? তুমি সৌম্যর পরে কাউকে বিয়ে করেছি কিনা জানতে চাইছ? তিন তিনবার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। তিন জনেই ওদেশের ছেলে। এখন বিরক্ত হয়ে গেছি। ছেলেদের বাইরেটা এক এক রকম। একটু পুরনো হলেই প্রত্যেকের ভেতরটা এক রকম হয়ে যায়। জেলাস, পজেসিভ। আমার রোজগারের টাকাকে নিজের বলে ভাবতে খুব পছন্দ করে। প্রত্যেকের ধান্দা তাড়াতাড়ি আমাকে মা বানাবার। একবার যদি সন্তানের মা করে দিতে পারে তা হলে তাদের ভিত বেশ শক্ত হয়। ছয়বার অ্যাবর্ট করতে হয়েছে ওদের জ্বালায়।" মিলা বলল।

"এরকম কেন হবে? কাউকে ভালবেসে বিয়ে করলে তার সন্তানের মা হতে তো স্বাভাবিক ভাবেই ইচ্ছে করবে। তাই না?"

"করবে। যদি বুঝি লোকটার সেই সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্যতা আছে। সবটা আমার ঘাড়ে ফেলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালে আমি মেনে নেব কেন? বিশ্বাস করো, চারবারের পরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে, সন্তান আমার জন্যে নয়। সেই জন্যে একটা নপুংসককে জায়গা দিলাম আমার ফ্ল্যাটে। ও সঙ্গে থাকায় কোনও ছেলে আর বিরক্ত করতে আসছে না। কিন্তু এটাকেও তাড়াতে হবে।"

"সেদিন তো বললে।"

"বিরক্তিকর। শালার যৌনক্ষমতা নেই আবার বৃহন্নলাও নয়। ঠিক আছে। কিন্তু ও যে হোমোসেক্সুয়াল এবং পার্টনারের সঙ্গে মেয়ের ভূমিকা নেয় এটা জানতাম না। জানার পর গা ঘিনঘিন করতে লাগল। দুর! এই, তোমার ঘুম পাচ্ছে না?"

"না তো!"

"অনেকদিন পর পেট ভরতি পোস্ত খেয়ে আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"ঘুমোও। আমি পরদা টেনে দিচ্ছি।"

পরদা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সংহিতা। মিলাকে তার মোটেই খারাপ লাগছিল না। যা সত্যি তা খোলাখুলি বলছে, কোনও প্রিটেনশন নেই। কলকাতার অনেক শিল্পীই মিলাকে অপছন্দ করে। একটা বাঙালি মেয়ে, একটু-আধটু ছবি আঁকার ক্ষমতা নিয়ে ইউরোপে বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে বলে ওকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে অনেকের। যারা মধ্যবয়সি তাদের কেউ কেউ ওর সঙ্গে ভাব করতে চায় দুটো কারণে। এক, শরীর নিয়ে মিলার কোনও ছুঁৎমার্গতা নেই বলে যে-কথাটা চালু আছে তার সুযোগ নেওয়া; দুই, ওর সুপারিশে ইউরোপে এগজিবিশন করা। প্রথমটা সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই কিছু জানা নেই সংহিতার, কিন্তু দ্বিতীয়টায় কেউ সফল হয়নি।

টেলিফোন বাজল। সিক্তা রিসিভার তুলে কথা বলে নিচু স্বরে বলল, "গেট থেকে সিকিউরিটি ফোন করছে।"

এই সময় কেউ আসে না। তা ছাড়া অ্যাপয়ন্টমেন্ট না করে আসারও কথা নয়। অবশ্য এই সরল সত্যটা কোনও কোনও কাগজের সাংবাদিক বুঝতে পারে না। সে রিসিভার তুলে জানান দিল।

"ম্যাডাম, একজন পুলিশ অফিসার এসেছেন, দেখা করতে চান।"

পুলিশ অফিসার কেন আসবে? দেখা করব না বলতে পারল না সে।

মিনিট চারেকের মধ্যে বেল বাজলে সে নিজেই দরজা খুলল।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, "সংহিতা রায়—!"

"হ্যাঁ। বলুন।"

"একটু ভেতরে যেতে পারি?" ভদ্রলোক তাঁর আইডেন্টিটি কার্ড দেখালেন।

তারপর বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই সময় আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। যদি সময় কম নেন তা হলে খুশি হব। বসুন।"

সোফায় বসে অফিসার বললেন, "কাল রাত্রে রিক্তা নামের যে-মেয়েটিকে আমরা আপনার এখানে পৌঁছে দিয়েছি তার ব্যাপারেই কিছু জানার আছে।"

"বেশ, বলুন।"

"ও কি এখন এ-বাড়িতেই আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি যে চিঠি দিয়েছেন, দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন সেটা সঠিক ভাবলেও আমাদের রেকর্ডের জন্যে কিছু তথ্য জানা দরকার। ওকে যদি এখানে আসতে বলেন তা হলে কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।" অফিসার বললেন।

সংহিতা সিক্তাকে ডেকে ওই ঘরে নিয়ে এল।

তাকে আপাদমস্তক দেখে অফিসার বললেন, "তুমি স্টেটমেন্ট দিয়েছ, যে মারা গেছে তার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে কী করছে, কোথায় যাচ্ছে তা তোমাকে কখনও বলেনি। টাকার অভাবে খেতে পেতে না ভালভাবে। তাই ওকে ছেড়ে এসেছ।"

মাথা নাড়ল সিক্তা, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু লোকটা তোমার স্বামী ছিল না। বিবাহিত সম্পর্ক হয়নি।"

সিক্তা চুপ করে থাকল। সংহিতা বলল, "বিবাহিত না হয়েও একসঙ্গে থাকাটা কি অপরাধ? আপনারা যদি সেটাকে অপরাধ মনে করেন তা হলে কি সে কারণে ওকে আটকেছিলেন?"

"না। যতক্ষণ কেউ কমপ্লেন না করছে এ নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামায় না।"

"তা হলে?"

"ওইখানেই সমস্যা হয়েছে। বুঝতেই পারছেন লোকটি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে জড়িত ছিল। মাসের পর মাস তাদের চর হিসেবে কাজ করে গেছে।

ওর ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে যে-গ্রামে বাস করত সেই গ্রামে এরও শ্বশুরবাড়ি। লোকটার সঙ্গে ও গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। আমরা জেনেছি তখন লোকটার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তা হলে তুমি কেন শ্বশুরবাড়ির নিরাপদ আশ্রয় থেকে ওর সঙ্গে পালালে?" অফিসার তাকালেন।

সংহিতাই জবাব দিল, "অফিসার, ভালবাসা প্রবল হলে যুক্তির বাঁধ টেকে না।"

"কিন্তু অভাবে পড়তেই ভালবাসা উবে গেল?" অফিসার মাথা নাড়লেন, "ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, ইনক্লুডিং ওর স্বামীর কাছ থেকে কোনও প্রশংসাবাক্য আমরা আশা করিনি। বউ বাড়ি ছেড়ে গেলে তার নিন্দে লোকে গলা ফুলিয়ে করে। কিন্তু ওর ভাশুর বলছে, মাঝে মাঝেই ওই লোকটার কাছে জঙ্গলমহলের কেউ কেউ মাঝরাতে আসত। ওর ভাশুর বলেছে তখন মাঠে যাওয়ার নাম করে রিক্তা বেরিয়ে যেত। ভোররাত্রে ও যে প্রাকৃতিক কারণে বের হত না তা তারা পরে বুঝতে পেরেছে। তাই ও যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তখন ওরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। আর খোঁজখবর করেনি। ম্যাডাম, এই অভিযোগ সত্যি হলে লোকটা গ্রামে থাকতেই উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এই মেয়েটি তাদের কোনও না কোনও ভাবে সাহায্য করেছে। ভালবাসাটাসা নয়, স্রেফ এক দলের সদস্য বলেই ও লোকটির সঙ্গে ঝাড়গ্রামে এসে থেকেছে।"

সংহিতা বলল, "ওর ভাশুরের কথার প্রমাণ পেয়েছেন?"

"না। এখনও পাইনি।"

"যদি প্রমাণিত হয় ভাশুর সত্যি বলছে তা হলে ওকে অ্যারেস্ট করবেন।"

অফিসার বললেন, "ভাশুর লোকটা ওকে বিপদে ফেলার জন্যেও বলতে পারে।"

"গ্রামের আশেপাশের বাড়ির লোক, ঝাড়গ্রামে যেখানে থাকত সেখানকার লোকজন ওর আচরণে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কিনা তদন্ত করলে জানতে পারবেন।" সংহিতা এবার বিরক্ত হল।

অফিসার সিক্তার দিকে তাকালেন, "তোমার ভাশুর যা বলেছে তা তুমি কি অস্বীকার করছ?"

সিক্তা বলল, "হ্যাঁ। উনি যা চেয়েছিলেন তা পাননি বলে মিথ্যে বদনাম দিয়েছেন।"

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, "থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। একটা অনুরোধ, আমাদের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে আপনার কাছেই রেখে দেবেন।"

"সেটা শেষ করতে কতদিন লাগবে?"

"এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না—।"

"আশ্চর্য কথা! কাল যদি ও কোনও অন্যায় করে তা হলেও ওকে রাখতে হবে? ধরুন, ও চুরি করল, দামি জিনিস ভাঙল, বাজারে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পাঁচ ঘণ্টা কোথাও আড্ডা মেরে এল, আমি ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারব না?" বেশ জোরেই জিজ্ঞাসা করল সংহিতা।

"নিশ্চয়ই পারবেন। কিন্তু সেটা করার আগে লোকাল থানায় যদি ইনফর্ম করেন তা হলে আমাদের সুবিধে হয়। আচ্ছা, নমস্কার।" অফিসার বেরিয়ে গেলেন।

সিক্তা দরজা বন্ধ করল।

মেজাজ গরম হয়ে গেল সংহিতার। খামোকা ঝামেলায় জড়াচ্ছে সে! ও যদি অন্যায় না করে থাকে তা হলে পুলিশ নিশ্চয়ই অনন্তকাল জেলে পুরে রাখত না। ওর অতীত সম্পর্কে যেটুকু জেনেছে তা ওর কাছ থেকেই শোনা। পুলিশ ধরেছে শুনে সাত তাড়াতাড়ি ছাড়ানোর জন্যে অত ব্যস্ত হওয়ার কোনও দরকার ছিল না।

"সিক্তা!" একটু জোরেই ডাকল সংহিতা।

তৎক্ষণাৎ সামনে চলে এল মেয়েটা, জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"তুমি আমাকে যা বলেছ তাতে সত্যি কতখানি ছিল?"

"একটাও মিথ্যে বলিনি আমি।"

"তোমার বাবা-মা তো দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল। তা হলে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাইলে না কেন? সেখানে নিশ্চয়ই থাকাপরাখাওয়ার সমস্যা ছিল না!"

"হ্যাঁ দিদি, ছিল না।"

"তা হলে বাড়ি ছাড়লে কেন?" সরাসরি তাকাল সংহিতা।

মুখ নামাল সিক্তা। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে চাপ দিতে লাগল।

"মানলাম তোমার স্বামী অপদার্থ তাই বলে একটা উটকো লোকের প্রেমে পড়তে হবে?"

"ওই গ্রামেই বাড়ি।"

"সেখানেই থাকত না ঝাড়গ্রাম থেকে যাতায়াত করত?"

"শনিবার আসত সোমবার চলে যেত।"

"কী করত সেখানে?"

"ট্যাক্সি চালাত।"

"তোমার সঙ্গে ওর কে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল?"

সিক্তা ভাবার চেষ্টা করল। সংহিতা বলল, "সত্যি কথাটা বলো। বাড়িতে শান্তি পেতে না, স্বামী অপদার্থ তাই কেউ যখন তোমাকে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল কিছু করতে পেরে বেঁচে গেছ, তাই না?"

"না। আমার শাশুড়ির শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। টেম্পো করে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সবাই কাজে ব্যস্ত বলে আমাকে রেখেছিল তার দেখাশোনার জন্যে। দশ দিন ছিলাম। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আগে মুখ চিনতাম, ওখানে আমাকে দেখে কথা বলেছিল। ওর বন্ধুকে দেখতে হাসপাতালে আসত। আমি শাশুড়ির বিছানার পাশে মেঝেতে রাত্রে শুতাম। ও সবাইকে বলে আমার শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। শাশুড়ি সুস্থ হলে ও ট্যাক্সিতে আমাদের গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল কিন্তু ভাড়া নেয়নি।"

"তা হলে মাঝরাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাদের গ্রামের বাইরে এগিয়ে দিতে?"

"কাউকে না।"

"তোমার বাইরে বের হওয়াটা কি মিথ্যে কথা?"

"না। মাঠে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতাম!" বলেই মুখ নিচু করে ঠোঁট কামড়াল সিক্তা।

"ঝাড়গ্রামে তোমরা তো স্বামী-স্ত্রীর মতো ছিলে। বাচ্চাটাচ্চা হয়নি!"

"না। আমি বলেছিলাম বিয়ে না করলে বাচ্চা চাই না।"

"তোমার কথা শুনত?"

"হ্যাঁ।" সিক্তা নির্বিকার মুখে বলল, "বাচ্চা না হওয়ার ব্যবস্থা নিত।"

"এরকম কতদিন চলেছিল?"

"অনেকদিন। তারপর যেই সে বাইরে রাত কাটাতে আরম্ভ করল অমনি তার মধ্যে পরিবর্তন এল। বাড়িতে ফিরে আসত শুধু ঘুমোবার জন্যে।"

"তুমি কিছু বলোনি?"

"অনেক বলেছি, কেঁদেছি। তখন মিথ্যে বলতে আরম্ভ করল। বলত প্যাসেঞ্জার নিয়ে রৌরকেল্লা যাচ্ছি, বর্ধমান যাচ্ছি। যার গাড়ি চালাত সে এসে ওর খোঁজ করাতে মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেল।"

"ওর কাছে যারা আসত তাদের তুমি চিনতে?"

"প্রথম প্রথম দু'-চারজন ড্রাইভার বন্ধু আসত। পরে হঠাৎ হঠাৎ যারা আসত তাদের চিনতাম না। আমি সামনে থাকলে কথা বলত না ওরা।"

"তোমার সন্দেহ হয়নি?"

মাথা নেড়েছিল সিক্তা, না। বলল, "কীরকম উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম। তখন মনে হত বাড়ি ছেড়ে চলে এসে ঠিক করিনি।"

"তুমি ওর মৃতদেহ দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে মারা গেল?"

"জঙ্গলে, সিআরপি'র গুলিতে। বুকে গুলি লেগেছিল।"

"ওর সঙ্গে ক'জন ছিল?"

"জানি না। ও একাই মারা গিয়েছিল।"

"সিআরপি কেন ওকে গুলি করে মারল তা জানো?"

"থানায় শুনেছি। বিশ্বাস করুন, গ্রামের কেউ কেউ মাওবাদীর দলে নাম লিখিয়েছে, তারা আর গ্রামে থাকে না। পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে অনেক অত্যাচার করেছে খবর পাওয়ার জন্যে, কিন্তু ওর নামে কেউ বলেনি যে, মাওবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।"

"তুমি কি ওকে বলে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছ?"

"হ্যাঁ, বলেছি। কোথায় যাব বলিনি। কিন্তু আমি যে ওর সঙ্গে থাকব না জানার পর ওর একটুও কষ্ট হয়নি, বরং মনে হচ্ছিল ও যেন বেঁচে গেল। আমি যে ওর বোঝা সেটা ওর মুখ দেখে বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি।"

"ওর মৃতদেহ দেখে তোমার কী অনুভূতি হল?"

ঠোঁট কামড়াল সিক্তা, "খুব কষ্ট হচ্ছিল।"

"কষ্ট? কেন? সে তো তোমাকে অবহেলা করেছিল!"

"ঠিকই। কিন্তু—!" মাথা আবার নিচু করল সিক্তা।

"সিক্তা। আমি ধরে নিচ্ছি তুমি যা বললে তার সবটাই সত্যি। তোমার জন্যে আমি দায়িত্ব নিয়ে পুলিশকে চিঠি লিখেছি। আশা করি সেজন্যে পরে আমাকে আফশোস করতে হবে না।"

সংহিতার কথা শেষ হওয়ামাত্র ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াল মিলা। এখন তার পরনে গেঞ্জি আর শর্টস। পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত সিল্কের মতো চকচকে ভাব ছড়ানো রয়েছে।

"খুব গম্ভীর আলোচনা চলছে বলে মনে হচ্ছে?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

"এসো। এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল!" সংহিতা বলল।

"আমার তো এটাই সমস্যা। এক ঘণ্টার বেশি টানা ঘুমোতে পারি না। রাত্রে বারবার উঠে বসি। আবার ঘুম না আসা পর্যন্ত কী যে অস্বস্তি! রাতের পর রাত এই চলছে। ছেড়ে দাও এসব কথা।"

সংহিতা বলল, "সিক্তা, দু'কাপ চা চাই যে!"

সিক্তা উঠে গেল।

"সমস্যাটা কী?"

"ও যাকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছিল সে যে একজন মাওবাদী তা জানত না। লোকটা অবহেলা করায় কলকাতায় চলে এসেছিল কাজ করতে। সেই লোকটাকে পরশু পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে। তারপর ওকে নিয়ে পড়েছিল। ওর সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ আছে কিনা তা তদন্ত করছিল। আমি চেষ্টা করে জামিন হয়ে ছাড়িয়ে এনেছি।"

"ইন্টারেস্টিং। বাঙালি মেয়ের জীবনে সাধারণত এরকম ঘটনা ঘটে না। কিন্তু একটা কথা শুনে খুব ভাল লাগল।" মিলা বলল।

"কোন কথাটা?"

"তোমার এই মেয়েটা অবহেলা মেনে নিয়ে পাপোশের মতো পড়ে থাকেনি। গুড।" চা শেষ করে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "নতুন কাজ শুরু করেছ?"

"হ্যাঁ। ঠিক জুত করতে পারছি না।"

"চলো, দেখি।"

"দেখবে?" ইতস্তত করল সংহিতা, "একেবারে কাঁচা অবস্থায় আছে।"

"তা থাক। তোমার শুরুটা দেখেও তো শেখা যায়।"

"বাজে বোকো না। তুমি গোটা ইউরোপ জয় করেছ ছবি এঁকে, আমার কাছে নতুন করে কী শিখবে!" সংহিতা কথাগুলো বলা সত্ত্বেও মিলাকে নিয়ে আঁকার ঘরে গেল।

যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ নিজের আঁকা ছবি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখাতে আপত্তি ছিল সংহিতার। এমনও হয়েছে যা ভেবে শুরু করেছিল আঁকতে আঁকতে তা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আবার যা আঁকতে চেয়েছিল শেষ হওয়ার পর দেখা গেল বিষয় পালটে গেছে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন তাকে দেখার চেষ্টা করতে নেই বলে বিশ্বাস করত সংহিতা। কিন্তু এখন মিলাকে রূঢ় কথা বলতে পারল না।

স্কেচটার সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গেল মিলা। মিনিটখানেক চুপচাপ দেখে জিজ্ঞাসা করল, "এরা কারা? প্রাগৈতিহাসিক?"

সংহিতা হাসল, কিছু বলল না।

"এরা কি আফ্রিকান? ইংরেজরা ক্রীতদাস করে নিয়ে যাচ্ছে? না, তা নয়। শোনো, আমার কেমন আনক্যানি অনুভূতি হচ্ছে।"

"তাই?"

"মনে হচ্ছে এরা এই পৃথিবীর মানুষ না।"

"বাঃ, এইটুকু মনে হলেই আমি ঠিক পথে হাঁটছি।"

"সত্যি বলো তো, কী আঁকতে চাইছ?"

"যেটা চাইছি সেটা শেষপর্যন্ত আঁকতে পারব কিনা জানি না। তাই এখনই বলা ঠিক হবে না।"

"কিন্তু এতকাল তুমি যা আঁকতে এই ছবি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে।"

"জানি না। স্বপ্নে কিছু দেখেছিলাম। মুশকিল হল স্বপ্নকে মডেল করা যায় না। জেগে ওঠার পর অনেকটাই ভুলে যেতে হয়। অতএব একটা ফাঁক থেকে যাবেই।"

"ভাল না খারাপ স্বপ্ন?"

"মুশকিল, বলতে পারব না। ধরো স্বপ্নে তুমি ঈশ্বরকে দেখলে। তুমি ভাবলে তিনি ঈশ্বর। কিন্তু জেগে ওঠার পর মনে হল ঈশ্বর নয়, শয়তানকে দেখেছ। এখন তুমি যদি আঁকতে যাও পারবে স্বপ্নটাকে ধরতে?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল মিলা, "আমি পারব না, একজন পারতেন।"

"কার কথা বলছ?"

"অনীশদা। ওঁর যেটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। যে-কোনও মানুষের শরীরকে ভেঙেচুরে আবার অন্য মাত্রায় এনে দেওয়া, তাতে উনি যদি আঁকতেন তা হলে কারও কাছে ঈশ্বর মনে হত, কেউ বা শয়তান বলে ভেবে নিত। আহা লোকটা পটাস করে মরে গেল!"

সন্ধের মুখে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কাছে হুইস্কি আছে?"

"আমার তো ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই।" হাসল সংহিতা।

"চলো, বাইরে যাই। কো'নও ক্লাবে—।"

"কেন?"

"খুব ইচ্ছে করছে দু"পাত্র খেতে।"

"তুমি যাও। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।"

বার্মিজ পোশাক পরে মিলা বেরিয়ে গেল।

বই পড়ছিল সংহিতা, ফোনটা এল। মোবাইলে। অন্যমনস্ক ভাবে নম্বর না দেখেই ওটাকে অন করে হ্যালো বলল সে।

"জয়ব্রত বলছি।"

"উঃ, আবার—!" কথাটা শেষ করতে চাইল না সংহিতা।

"আমি জানি তোমাকে আমি বিরক্ত করছি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি কী করব বুঝতে পারছি না। সংহিতা, প্লিজ একবার দেখা করার সুযোগ দাও।"

"জয়ব্রত, তুমি যে আমার কাছে মৃত তা তোমার জানা আছে।"

"জানি। আমি আমার জন্যে দেখা করতে চাইছি না। আমি যদি একা হতাম তা হলে চিন্তা করতাম না। আমি টিকলিকে মেরে ফেলতে পারি না।"

"টিকলি কোথায়?"

"আমার কাছেই আছে। কিন্তু—।"

কথা শেষ করতে না দিয়ে মোবাইল অফ করে দিল সংহিতা। তার ভয় হচ্ছিল জয়ব্রত সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলে তাকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। টিকলি সম্পর্কে তার দুর্বলতার কথা ওর অজানা নয়। কিন্তু এতগুলো

বছর পরে কেন টিকলিকে ব্যবহার করছে জয়ব্রত? সে ব্যবহারই বলবে এটাকে। জয়ব্রতর ধারণা মেয়েটার কথা বললে সে দুর্বল হবেই। আশ্চর্য! যাকে সে পাঁচ কি ছয় বছর পর্যন্ত দেখেছিল সে এখন তিরিশে পৌঁছে গিয়েছে। এই এতদিনের ব্যবধানেও তার মনে কোনও দুর্বলতা বেঁচে থাকতে পারে এটা জয়ব্রত ভাবল কী করে?

টিকলির যদি ওই বয়স এখন হয় তা হলে জয়ব্রতর কাছে থাকবে কেন? এর মধ্যে বিয়ে-থা করে স্বামীর সংসারে থাকার কথা। পাঁচ-ছয় বছরের টিকলি যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। ওই সৌন্দর্য দেখে সে বলত, বড় হলে তুই কত ছেলের চোখ অন্ধ করে দিবি কে জানে! সেই মেয়ে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকবে?

পরক্ষণেই একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। টিকলির যদি বিয়ে হয়ে থাকে তা হলে সে-ই বিয়ে কি ভেঙে গিয়েছে? বেচারা কি আবার তার বাবার কাছে ফিরে এসেছে? কিন্তু টিকলি নিশ্চয়ই পড়াশুনো করেছে। আজকাল অনেক ছেলেমেয়ের বিয়ে নানান কারণে বেশি দিন টিকছে না। কিন্তু তাই বলে কেউ ভেঙে পড়েছে না বা বাবা-মায়ের গলগ্রহ হয়ে বাস করে না। তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নতুন করে জীবনের মোকাবিলা করে। টিকলি যে পড়াশুনো না করে মূর্খ হয়ে বসে ছিল সেটা ভাবতে পারছিল না সংহিতা। তাই জয়ব্রতর বক্তব্য একদম বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না তার।

"আমি টিকলিকে মেরে ফেলতে পারছি না।" কথাগুলো বলার সময় জয়ব্রতর গলা কেঁপে উঠছিল। অত ভাল অভিনয় কি ওর পক্ষে করা সম্ভব? টিকলিকে মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন? কী করেছে সে? একটা তিরিশ বছরের মেয়েকে তার বাবা হঠাৎ মেরে ফেলার কথা ভাবছে কেন? পারছে না বলে হতাশ হয়ে পড়েছে? মাথা নাড়ল সংহিতা। যে-মেয়েকে সে শৈশব অবস্থায় দেখেছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এতগুলো বছর না-দেখার পর তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও দায় তার নেই।

ল্যান্ডফোন বাজল। সিক্তা কথা বলে এসে দরজায় দাঁড়াল, "ড্রাইভার ফোন করছে।"

"কী বলছে?"

"ওই দিদি নাকি আজ রাত্রে ফিরবে না বলে ওকে ছেড়ে দিয়েছে, ও কী করবে?"

"গাড়ি গ্যারাজ করে দিতে বলো।"

সিক্তা চলে গেল ফোনের কাছে।

মিলা বোধহয় আর কোনওদিন থিতু হতে পারবে না। এই মেয়ে কীভাবে ছবি আঁকে তা ঈশ্বরই জানেন। দশ মিনিট পরে ও কী করবে তা নিজেই জানে না। গেল দু'পাত্র হুইস্কি খেতে। কলকাতা যতই আধুনিক শহর হোক, এখনও যুবতী কোনও মহিলা যদি হুইস্কির সন্ধানে কোনও বারে ঢোকে তা হলে সবাই অবাক চোখে তাকাবে। কিছু বছর আগে কোনও মেয়ে হোটেলে একা থাকতে চাইলে অ্যালাউ করা হত না। এখন কোনও বারে একলা মেয়েকে কি মদ বিক্রি করা হয়? সংহিতার জানা নেই। যদি হয় তা হলে তার চারপাশের টেবিলের মানুষগুলোর আলোচ্য বিষয় হয়ে যাবে সে। অবশ্য বার ছাড়া পরিচিত কারও বাড়িতে যেতে পারে মিলা। বোধহয় সেরকমই গেছে নইলে রাত্রে ফিরে আসত। এই শহরে সেরকম কত মানুষ ওর জানা আছে? তিনি বিবাহিত বা সংসারী হলে হয়তো হুইস্কি খাওয়াতে পারেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী কি চাইবেন মিলা তাঁদের বাড়িতেও রাত্রিবাস করুক!

"বলে দিয়েছি।" সিক্তা এসে জানিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, সংহিতা দাঁড়াতে বলল।

"যাকে দেখতে গিয়েছিলে তার সৎকার হয়ে গেছে?"

"বোধহয় না। আমি ফিরে আসার পরে হয়েছে কিনা জানি না।"

"সে কী! তুমি ওকে দেখোনি?"

"হ্যাঁ। দেখিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, চিনি কিনা। বলেছি, চিনি।"

"ঠান্ডাঘরে রেখেছিল?"

"না। আরও অনেকর শরীর পড়ে ছিল সেই ঘরে।"

"সে কী? পচে দুর্গন্ধ বের হবে তো!"

"নাকে আঁচল চেপে ঢুকতে হয়েছিল।"

"ওর মুখাগ্নি করবে কে?"

"জানি না।"

"গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনরা আসেনি?"

"দেখতে পাইনি।"

অদ্ভুত অস্বস্তিতে আক্রান্ত হল সংহিতা। লোকটা দেশবিরোধী কাজ করেছে বলে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরও কি শরীরটা দেশের

শত্রু হয়ে থাকবে? তার দেহ কতদিন পরে চিতায় তোলা হবে? সে সিক্তার দিকে তাকাল, "তুমি আমাকে যা বলেছ তা সত্যি তো?"

"আমি মিথ্যে বলিনি।"

"লোকটা তোমাকে বিয়ে করেনি কেন? তুমি বলোনি?"

"বলেছিলাম।"

"সে কী জবাব দিয়েছিল?"

"বলেছিল আমার বিয়ে না ভেঙে দিয়ে আবার বিয়ে করলে পুলিশ ধরে জেলে ঢোকাবে।" সিক্তা নিচু গলায় বলল।

"সেটা করার চেষ্টা করেছিলে?"

"না। কীভাবে করতে হবে জানতাম না। ও আমাকে সাহায্য করেনি।"

"তা হলে তোমাদের ছেলেমেয়ে হলে কী করতে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সিক্তা। তারপর বলল, "যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করেছিল।"

"ও। এখন যদি পুলিশ সৎকার করতে ডাকে তুমি যাবে?"

"না।" ঝটপট উত্তর দিল সিক্তা, "কেন যাব? আমাকে তো সে তার অধিকার দিয়ে যায়নি। তার বাড়ির লোক ওসব করুক।"

"তা হলে দেখার জন্যে ছুটে গেলে কেন?"

"একসঙ্গে ছিলাম, মনে মায়া ছিল, তাই।"

"ঠিক আছে। আমাকে খেতে দাও।" সংহিতা কথা শেষ করেছিল।

ঘুম আসবে না ভেবে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিল সংহিতা। বিছানায় শোওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরে আমেজ এল। এল ঘুম।

আকাশে এখন হালকা সোনালি আলো। আশপাশে মাত্র সাত-আট জন। বাকিরা কোথায় গেল? সে পাশে তাকাল। হা হা হা করে হাসছিল যে সে নেই। তার জায়গায় বিকৃত চেহারার এক নারী খুব যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এখন দু'পাশের নিষ্পত্র গাছের মতো চেহারার অন্ধকার গায়ে-মাখা প্রতিবন্ধকতা নেই। কেউ হাঁটছে না। অথচ ঠিকঠাক দাঁড়িয়েও নেই। সে তাকাল। কোথাও কিছু নড়ছে না। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে এক ধরনের কষ্ট আসতে আসতেও আসছে না। আচমকা মনে হল মাথার ওপরে কিছু হচ্ছে। সে দৃষ্টি ওপরের দিকে করতেই দেখল একাধিক দিব্যপুরুষ আকাশপথে

সিংহাসনে বসে কোনও গন্তব্য স্থানে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দেখে সে ভয়ে চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ যেন শরীরে আঘাত করল। চোখ না খুলেও সে বুঝতে পারল তার সঙ্গীরাই ভয়ার্ত হয়েছে।

এই সময় আকাশবাণী হল, "তোমার যারা এই স্তর পর্যন্ত আসতে পেরেছ তাদের শেষ বিচারের সময় আসন্ন। এতক্ষণে তোমরা সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছ যেখান থেকে পথ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি পথ তোমাকে স্বর্গে অন্য পথ নরকে নিয়ে যাবে। এই দুটো পথের ঠিক মাঝখানে আকাশছোঁয়া প্রাচীর আছে। সেই প্রাচীরের ওপর কয়েকজন সর্বদা স্থিতি করেন। তাঁরা মুখের লক্ষণানুসারে কে কোথায় যাবেন স্থির করেন। যারা আমাকে অপমান করেছ এবং অন্যদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছ তাদের জন্যে স্বর্গের দ্বার কখনওই উন্মুক্ত হবে না। শুধু তাই নয়, যে পর্যন্ত ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উট যাতায়াত না করতে পারে সে পর্যন্ত তারা স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি পাবে না। কিন্তু যারা আমার ওপর বিশ্বাস হারায়নি, সারাজীবন সৎকর্ম করেছে, তাদের আমি কখনওই যন্ত্রণা দিই না, তারা স্বর্গলোকে চিরকাল বাস করবে। তাদের অন্তরের সমস্ত বিষাদ আমি দূর করব। যারা বলে ঈশ্বরই আমার পথপ্রদর্শক, তাদের আমি স্বর্গের উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করব। সেখানে রয়েছে অফুরন্ত স্বর্গীয় সুখ-সম্ভোগ।

"কিন্তু যারা সত্যত্যাগী, যারা পৃথিবীতে বাস করার সময় যাবতীয় অন্যায় কর্মে লিপ্ত ছিল তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর দুর্ভোগ। তাদের জন্যে শেষ বিচারের দিনে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে। সেটা ধ্বনিত হওয়ামাত্র আকাশে টুকরো বহু ফাটল দেখা দেবে, পাহাড় ধ্বংস হয়ে মরুর মরীচিকা হয়ে যাবে, সেই পাপীদের জন্যে নরক প্রতীক্ষায় থাকবে। সেই নরকে পাপীরা অনন্তকাল অবস্থান করবে। কোনও শীতল পানীয় তাদের জন্যে থাকবে না। তৃষ্ণার্ত হলে ফুটন্ত পুঁজ ছাড়া কিছু পাবে না।

"দ্বিতীয়বার শিঙাধ্বনি হওয়ামাত্র পৃথিবী কেঁপে উঠবে। সেই মহাগর্জনে পাপীদের সমস্ত সত্তা ভয়ংকর কেঁপে উঠবে। সেই সময় তারা সমস্ত কিছু বিস্মৃত হয়ে যাবে। যারা কোনও অন্যায় করেনি তাদের মন প্রফুল্ল হবে, মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু পাপীদের মুখ হবে ধূলিধূসর এবং অন্ধকারে ঢাকা।

"সেই বিচারের দিন যাকে তার পার্থিব জীবনের কর্মতালিকা ডান

হাতে দেওয়া হবে তাকে স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাকে কর্মতালিকা ডান হাতের বদলে পিঠের পিছন দিকে বাঁ হাতে দেওয়া হবে সে নরকে প্রবেশ করবে বিলাপ করতে করতে। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে, ওদের জন্যে কাঁটাগাছ ছাড়া কোনও খাবার থাকবে না। ওদের জন্যে তৈরি আছে আগুনের পোশাক, মাথায় পড়বে প্রচণ্ড ফুটন্ত জল, ওদের চামড়া, শরীর তার স্পর্শে গলে যাবে। এইভাবে তারা দহনযন্ত্রণা কী তা বুঝতে পারবে।

"অতএব তোমরা প্রস্তুত হও শেষ বিচারের মুখোমুখি হতে।"

আকাশবাণী শেষ হতেই চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেল। যারা শুনছিল তারা যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ল। সে বুঝল তার শরীর যেন টলছে। ঠিক তখনই অনুভব করল, কেউ কাঁদছে। কে কাঁদছে? সে তাকাতেই ওই বিকৃত চেহারার নারীকে কাঁদতে শুনল সে। ভাল করে দেখে বুঝতে পারল ওর শরীর স্বাভাবিক নয়। সে কথা বলার চেষ্টা করল, "এই, তুমি কাঁদছ কেন?"

"আ-আমি কোথায় যাব?"

"শুনতে পাওনি? পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করেছে তেমনই বিচারের ফল পাবে।"

"আমি, আমি তো কিছুই করিনি। কিছুই করতে পারতাম না যে!"

"সে কী! কিছুই পারতে না? নাম কী তোমার?"

"টিকলি!" কান্না চাপল স্ত্রীলোকটি।

যেন গভীর জলের নীচ থেকে একটু বাতাসের জন্যে পাগলের মতো ওপরে ওঠার চেষ্টার পর যখন সেটা পাওয়া যায় তখনকার অবস্থা হল সংহিতার। সমস্ত শরীরে ঘাম ছড়িয়েছে। বুক ওঠা-নামা করছে। বিছানায় উঠে বসতে না বসতেই সিক্তা ছুটে এল, "কী হয়েছে দিদি? কী হয়েছে?"

কয়েক মুহূর্ত মেয়েটাকে ঝাপসা দেখল সে। তারপর ধাতস্থ হল। সে তার শোওয়ার ঘরের বিছানায় বসে আছে। সিক্তা তার কপালে জমা ঘাম আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে বলল, "স্বপ্ন দেখছিলে?"

"ঠিক আছে। যাও, শুয়ে পড়ো।"

"উঃ, তুমি যেভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলে, মনে হচ্ছিল কেউ তোমার গলা টিপে ধরেছে। খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলে নিশ্চয়ই। এই ঘরে একজন ঠাকুরদেবতার ছবি রাখো।"

"সে তো আছেই।" বিছানা থেকে নামল সংহিতা।

"ওমা, কোথায়?"

"ওই তো।" দেওয়ালে টাঙানো তার নিজেরই আঁকা রবীন্দ্রনাথের বিশাল ছবিটা আঙুল তুলে দেখাল সে।

"উনি কি ভগবান?"

"আমার কাছে তার চেয়েও বেশি। যাও শুয়ে পড়ো।"

বাথরুম থেকে ফিরে এসে ঘড়ি দেখল সংহিতা। রাত সাড়ে চারটে। হাসল সে। যাঁরা মর্নিংওয়াক করেন তাঁরা হয়তো বলবেন, "ভোর সাড়ে চারটে।"

সিক্তা চলে গেছে তার ঘরে। বিছানার দিকে তাকাল সংহিতা। এখন শুয়ে পড়লে হয়তো ঘুম এসে যাবে। আর ঘুমালেই কি ওই স্বপ্ন দেখতে হবে? তার শেষ বিচারের দিন বেঁচে থাকতে থাকতেই দেখতে হবে? কিন্তু টিকলি? না, তার ভুল হচ্ছে না। সে স্পষ্ট শুনেছে স্ত্রীলোকটি নিজের ওই নামই বলেছে। টিকলি। কিন্তু টিকলি ওইরকম বিকৃত চেহারার স্ত্রীলোক হবে কী করে? টিকলি নামের আর কাউকে তো সে চেনে না। সেই টিকলি তো চার-পাঁচ বছরে ছিল পুতুলের মতো দেখতে, ভবিষ্যতে আরও সুন্দরী হবে বলে নিশ্চিত মনে হত। ওই স্ত্রীলোকটি কী করে সেই টিকলি হবে? হ্যাঁ, টিকলির বয়স এখন ওই রকমই হবে। না, সেই টিকলি কেন এত অল্প বয়সে শেষ বিচারের জন্যে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সে কেন ওখানে পৌঁছেছিল। তার কি শেষ বিচারের দিন আসার বয়স হয়েছে? এই মধ্য পঞ্চাশে তার শরীরে একটিও বলিরেখা পড়েনি, কোমরে চর্বি জমেনি, দ্বিতীয় চিবুক প্রকট হয়নি। এখন তো মানুষ স্বচ্ছন্দে আশির কোঠায় পৌঁছেও সক্রিয় থাকেন।

মুখ ধুয়ে ব্রাশ করতেই শরীর থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল কিন্তু বাইরে আবছায়া অন্ধকার। আজ কী মনে হল দরজা খুলে সিঁড়ি ভেঙে সোজা ছাদে চলে এল সে। বড় ছাদ। চারদিকে নিশ্চুপ বাড়িগুলোর কোনওটাতেই আলো জ্বলছে না। চমৎকার ঠান্ডা হাওয়া বইছে। শরীর জুড়িয়ে গেল সংহিতার। ধীরে ধীরে মনের ভার কমে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, টিকলি এখন কীরকম দেখতে হয়েছে জানলে কেমন হয়। স্বপ্নে দেখা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি ওর মিল হওয়া সম্ভব? না, হতে পারে না। কিন্তু টিকলি ওখানে গেল কী করে? প্রথম যখন সে দলটিকে দেখেছিল, সামনে ঝুঁকে মাথা নিচু করে হাঁটছিল সবাই সেই দলের কেউ তো বিকৃত চেহারার ছিল না। যে নিজেকে টিকলি বলে

দাবি করেছে সে কী করে অতটা দূরে হেঁটে গেল সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

মাথা নাড়ল সংহিতা। জয়ব্রত টেলিফোনে টিকলির কথা বলেছিল। সেই কথাগুলো মন হয়তো গাঢ়ভাবে নিয়েছিল। নিয়ে তার অবচেতনে রেখে দিয়েছিল। সেটাই স্বপ্নে তুলে ধরেছে। স্বপ্ন তো জীবনে দেখা অভিজ্ঞতাকেই নিজের মতো বানিয়ে এবং সেই বানানোটা অজান্তেই ঘটে যায়, ঘুমের মধ্যে দেখা।

কিন্তু আকাশবাণী বলে যা মনে হয়েছিল, যে-কথাগুলো শুনেছিল, সেগুলো খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে এখন। সংহিতা আকাশের দিকে তাকাল। পুব আকাশ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে তার মনে হল, কোথাও বাণীগুলো সে পড়েছিল। কোথায়? চোখ বন্ধ করল সে। তারপর দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল। তার ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলতেই সিক্তাকে দেখতে পেল। দরজার পাশে একটা মোড়ায় বসে আছে। কোনও কথা না বলে সে ভেতরের ঘরে বইয়ের আলমারিগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রচুর বই। সব রকমের। তারপর দুটি বই, একটি বাইবেল অন্যটি গীতার পাতা খুলে লাইন দেখতে লাগল। শেষপর্যন্ত ওই দুটি রেখে দিয়ে তৃতীয় বইটিকে বের করে কয়েকটা পাতা ওলটাতেই বুঝতে পারল, আকাশবাণীর বাক্যগুলো ওই বইতেই রয়েছে। চশমাটা নাকে চাপিয়ে বইটি নিয়ে আবার ছাদে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে মোবাইলের দিকে তাকাল সংহিতা। তারপর সেটিকে নিয়ে আবার সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে এল।

পুব আকাশে এখন আলোর রেখা উঁকি মারছে। পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্রস্তুতি চলছে। সূর্যের প্রান্তরেখা উকি মারল এবার। বহু দিন এই দৃশ্য দেখা হয়নি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বইটির পাতা খুলল সে। "যারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারী, যারা তাদের উপাসনায় বিনম্র, দানশীলতায় উদার, সৎকর্মে উৎসাহী, অভাবগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকে, তারাই হবে স্বর্গের অধিবাসী।" এই গ্রন্থ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে সঠিক পথে চালিত করেছে, সুশৃঙ্খল করেছে।

সূর্য যখন আকাশে প্রকাশিত হল তখন বুকে বইখানি সশ্রদ্ধায় চেপে ধরল সংহিতা। তারপরেই মনে হল, উদার, বিনম্র, সহানুভূতিসম্পন্ন হতে কেন পারবে না সে। কবে সে প্রতারিত হয়েছিল, কবে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার

করা হয়েছিল সেই ক্ষত মনে রেখে জীবনযাপন করার মধ্যেও তো একটা অহংকার কাজ করে। আর সেইসব অন্যায় যে করেছিল তাতে অংশ নেয়নি চার-পাঁচ বছরের একটি শিশু। অংশ নেওয়ার বয়সই তার ছিল না। তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কেন সে হবে না! সূর্যের দিকে তাকাল সে। এখনও কী শান্ত, কত স্নিগ্ধ। যেটুকু দ্বিধা ছিল তা মন থেকে সরিয়ে দিল সংহিতা।

সে এই মুহূর্তে ভুলে গেল এখন ঘড়িতে ক'টা বাজে। সে ভুলে গেল এখনও ঘরে ঘরে ছায়া ছায়া ঘুম। সেই ঘুম ভাঙিয়ে কথা বলার সময় এটা নয়। মোবাইলের বোতাম টিপে সে কানে চাপল। একটু পরেই শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে। বেশ জোরে জোরে। কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না। কেউ সুইচ টিপে বলছে না, হ্যালো! বেজে বেজে থেমে গেল যন্ত্রটা। দ্বিতীয়বার বোতাম টিপল সে। আবার রিং হতে লাগল। যদি ঘুমিয়ে থাকে ওরা তা হলে এই আওয়াজে তো ঘুম ভেঙে যাওয়া উচিত। আবার থেমে গেল শব্দ।

ধীরে ধীরে নেমে এল সংহিতা। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই সিক্তা জিজ্ঞাসা করল, "এখন চা খাবে তো?" সংহিতা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তারপর চেয়ারে বসে মোবাইলের দিকে তাকিয়েই উঠে পড়ল। বইটাকে সযত্নে আলমারিতে রেখে দিল সে। আগে যখন সে পড়েছিল তখন তেমনভাবে বোঝার চেষ্টা করেনি। আজ অন্যরকম দিন।

চায়ের পর আঁকার ঘরে চলে এল সংহিতা। অসমাপ্ত ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যারা হাঁটছে তাদের কারও কোনও পরিচিতি নেই। মাথা নিচু করে থাকায় কারও মুখ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দু'পাশের পরিবেশটা তো ঠিক ভৌতিক ছিল না, ওটা হালকা করতে হবে। কিন্তু ওই মিছিলে কোনও প্রতিবন্ধী মহিলাকে সে আঁকেনি। যে-স্ত্রীলোকটি নিজের নাম টিকলি বলেছিল তার পক্ষে যখন এদের সঙ্গে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয় তখন কী করে শেষ বিচারের দিনের কাছে পৌঁছে গেল? তা হলে কি ওই মিছিলেই টিকলি ছিল, সে দেখতে পায়নি! ওই অবস্থায় যে হাঁটতে পারবে না সে কি গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে!

মিছিলের যে-জায়গাটায় রং পড়েনি, সেই জায়গাটা মুছে ফেলে একটি বিকৃত নারীশরীর আঁকার চেষ্টা করল সংহিতা। প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পরে সে আপাতত হাল ছেড়ে দিল। যা চাইছে তা কিছুতেই হচ্ছে না। অন্য

ফিগারগুলোর পাশে বড্ড সাজানো মনে হচ্ছে। সে স্বপ্নে দেখা টিকলিকে মনে করার চেষ্টা করল। শুধু ঝাপসা অবয়বে যার শরীর বিকৃত বলেই বোঝা যায়, তার বেশি কিছু মনে করতে পারল না।

আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সিক্তা সামনে এল, "ব্রেকফাস্ট দিই?"

ঘড়ি দেখল সংহিতা। ন'টা বেজে গেছে। খাবার টেবিলে বসে সে জিজ্ঞাসা করল, "আজ কী খাওয়াবে?"

"কর্নফ্লেক্স কলা দিয়ে, শশা, পেয়ারা আর জ্যাম মাখানো টোস্ট।"

"বাঃ। নিয়ে এসো।"

বেশ সাজিয়ে আনল সিক্তা। খেতে শুরু করে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বয়স্ক মানুষ, হাঁটতে পারে না, রাস্তায় বসা অবস্থায় ঘষটে ঘষটে চলে এমন কাউকে তুমি দেখেছ?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল সিক্তা, "হ্যাঁ। আমাদের গ্রামেই একজন ছিল।"

"কীভাবে হাঁটত?"

"হাঁটু, দুই হাতে আর পাছায় রবার বেঁধে রাখত। হাতের ওপর ভর করে শরীরটাকে কোনওরকমে টেনে চলত। বাজারের সামনে পৌঁছে বসে ভিক্ষা চাইত। পিঠে কুঁজের মতো উঁচু কিছু ছিল।"

"মুখটা কীরকম?"

"খুব ছোট।"

সংহিতা আর কথা বাড়াল না। যা শুনল তাতে একটা ছবি তৈরি হচ্ছে বটে কিন্তু সেটা তার মনে ধরছে না।

দুটো টেলিফোন এল সাড়ে দশটা নাগাদ, পরপর।

প্রথমটা মিলার। বলল, "খুব রেগে গেছ নিশ্চয়ই?"

হাসল সংহিতা, "কী কারণে?"

"এই যে ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে রাতটা ডুব মারলাম

"বা রে! তুমি তো নাবালিকা নও, নিশ্চয়ই নিজের খারাপ হয় এমন কোনও কাজ করবে না। তা ছাড়া ড্রাইভারকে তো বলেই দিয়েছিলে রাত্রে ফিরবে না।"

"বাঃ! চমৎকার। এই জন্যে তোমাকে এত পছন্দ করি। আমি আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোচ্ছি। একসঙ্গে লাঞ্চ করব। গেটে বলে রেখো।"

মিলা ফোন রাখতে না রাখতেই দ্বিতীয় ফোনটা এল। নম্বরটা দেখে একটু শান্ত হল সংহিতা। বোতাম চালু করে জানান দিল, "হ্যালো!"

"একটা ফোন করতে গিয়ে বুঝলাম তুমি ফোন করেছিলে। রাত্রে এটা সাইলেন্ট করে রেখেছিলাম বলে রিং শুনতে পাইনি। দুঃখিত।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই কিছু বলতে চেয়েছিলে!"

"হ্যাঁ। তুমি টিকলির ব্যাপারে কথা বলেছিলে। জানি না আমাকে সেন্টিমেন্টালি এক্সপ্লয়েট করার জন্যে ওর নাম বলেছ কিনা! সেই চেষ্টা করলে বলব, ভুল করেছ। আমি যাকে চার-পাঁচ বছর বয়সে দেখেছিলাম তার সম্পর্কে কোনও উৎসাহ এতদিন পরে আমার থাকতে পারে না। ওর বয়স এখন নিশ্চয়ই তিরিশের আশেপাশে। এখন এই বয়সে সে আমার সম্পূর্ণ অচেনা। এটা তোমাকে জানাতে চেয়েছি।" সংহিতা বলল।

"ঠিকই। ওর বয়স এখন ওই রকমই। কিন্তু আমি ওকে ব্যবহার করে তোমাকে নরম করতে চাইনি। সত্যি বলতে কী, ওরও তোমাকে মনে রাখার কথা নয়। কিন্তু ওকে নিয়ে আমি যে-সমস্যায় পড়েছি তাতে কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একসময় ওকে খুব আদর করতে। ভাবলাম তুমি যদি কোনও পরামর্শ দিতে পারো—।"

"ও এখন তোমার কাছেই আছে?"

"হ্যাঁ। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।"

"এই বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে গেছে?"

"না। বিয়ে হয়েছিল। সাত বছর হয়ে গেল।"

"তা হলে তোমার কাছে আছে কেন? শ্বশুরবাড়ি কোথায়?"

"হাওড়ায়।"

"সেখানে থাকছে না কেন?"

"ওর স্বামী এবং শাশুড়ি এখন জেলে আছে।"

"সে কী! কেন?"

"আমি তো সত্যি কথা নাও বলতে পারি। যে-বাড়িতে তুমি শেষবার এসেছিলে এখনও সেখানেই আছি। যদি নিজের চোখে সব দেখে যাও তা হলে বুঝতে পারবে আমি কেন তোমার সাহায্য চাইছি। রাখছি।" শেষ দিকে গলা ধরে এল জয়ব্রতর। বুকে হিমস্পর্শ লাগলেও সেটা ঝেড়ে ফেলতে

চাইল সংহিতা। এটা নিছক অভিনয়। একসময় যে-ভুল সে করেছিল সেটা আর করতে চায় না সে।

স্নান করতে ঢুকেও কথাগুলো পাক খাচ্ছিল মনে। এর আগে জয়ব্রত বলেছিল টিকলিকে সে মেরে ফেলতে পারছে না। মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন? একজন মানুষ প্রেমিকার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে পারে, বিশ্বাস নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারে কিন্তু মেয়েকে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে না। অভিনয়ের সংলাপ হিসেবেও নয়। যদি পারে তা হলে তার চেয়ে ঘৃণ্য জীব পৃথিবীতে নেই।

শাওয়ারের নীচে দাঁড়াতেই জল পড়ল শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ কমে এল। শান্ত হয়ে গেল শরীর। না, তাকে বিনম্র, উদার এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। সেই বয়সে তার হারানোর ভয়ডর ছিল, শাশুড়ির অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়েও তার যা হারায়নি, জয়ব্রতর বিশ্বাসঘাতকতা তাকে প্রায় নিঃস্ব করে দিচ্ছিল। শুধু পাগলের মতো একের পর এক ছবি এঁকে শেষপর্যন্ত স্থির হতে পেরেছিল সে। এখন এই বয়সে তো হারাবার কিছু নেই। কাপট্য বুঝতে পারলে নিঃশব্দে সরে আসতে পারে।

মিলা এল বারোটা নাগাদ। চুল উসকোখুসকো, চোখের তলায় কালি। মুখে ক্লান্তির ছাপ। সোফায় বসে সিক্তাকে বলল, "এক কাপ র' কফি, নো চিনি দুধ।"

সংহিতা বলল, "চেহারাটা বেশ খোলতাই হয়েছে।"

"আর বোলো না। বেশ অ্যাডভেঞ্চার করা হল।"

"কীরকম?"

"তুমি প্যাটকে চেনো? সুপ্রিয় পত্রনবীশ?"

"না।"

"তোমার অবশ্য চেনার কথা নয়। আর্ট কলেজে আমার এক বছরের জুনিয়র ছিল। কাল পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে ভাবলাম কোনও বারে ঢুকে দু'পেগ খেয়ে নিই। একটা বারের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি সব টেবিল ভরতি। পাবলিক কথা বলে যাচ্ছে। ওরকম পরিবেশে বসে মদ খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার বাইরে বেরিয়ে আসতেই প্যাটের সঙ্গে দেখা। ওর সঙ্গে আর একজন ছিল। পাশের দোকান থেকে কিছু কিনে প্যাকেট করে নিয়ে

আসছিল। আমাকে দেখেই চেঁচামেচি। শুনলাম ওরা তখন মন্দারমণিতে যাচ্ছে। গাড়িতে প্যাটের বউ বসেছিল। আলাপ করিয়ে দিয়ে প্যাট বলল, চলো না। দুরন্ত যাওয়া হবে। আমরা সি-বিচে রাত কাটিয়ে ভোরে ফিরে আসব। প্যাটের বউ বলল, যে গাড়ি চালাবে সে কিন্তু ড্রিঙ্ক করবে না।"

প্যাট বা তার বন্ধু তখন রাজি হল না স্টিয়ারিং-এ বসতে। শেষপর্যন্ত প্যাটের বউ গাড়ি চালাল। ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার। আমরা তিন জন হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে আসা হু হু বাতাস খেতে খেতে রাত্রের হাইওয়ে ধরে যখন যাচ্ছিলাম তখন কী যে ভাল লাগছিল! মাঝখানে একটা ধাবায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খাবার তুলে নেওয়া হল। তাই খেতে খেতে যখন সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেলাম তখন রাত দেড়টা। আমি শুনেছিলাম ওখানে নাকি সমুদ্র তেমন ঢেউ তোলে না। কিন্তু কাল রাত্রে বড় বড় ঢেউ উঠছিল, গর্জনও। আধমরা চাঁদ ছিল আকাশে, অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছিল চারধার। কোনও মানুষ নেই। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। বালিতে বসে আমরা পান এবং ভোজন করতে লাগলাম। হঠাৎ প্যাট বলল, এক্সকিউজ মি, আমরা একটু ব্যক্তিগত আনন্দ এনজয় করে আসি। ওর স্ত্রীও স্বচ্ছন্দে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে, স্বামীর সঙ্গে। আমার খুব মজা লাগল। বাঙালি তো বেশ স্মার্ট হয়ে গেছে! আগে ভাবা যেত, বলো?"

"তারপর?"

"আমার নেশা হয়ে যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলাম পা টলছে। প্যাটের বন্ধুকে বললাম, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি, আপনি একাই খান। সে কিছু বলল না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল আমি শূন্যে ভাসছি। সংবিৎ সামান্য ফিরতে বুঝলাম লোকটা আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে হাঁটছে। কোনওরকমে প্রতিবাদ করলাম, এ কী! কী করছেন আপনি? আমাকে বালির ওপর শুইয়ে দিয়ে সে বলল, জলে ডুবে যেতেন। এখন জোয়ারের সময়। ঢেউ উঠে এসেছে ওপরে। আপনার প্যান্ট ভিজে গেছে। হাত বুলিয়ে সেটা বুঝতে পেরে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর কোনওরকমে উঠে বসে দেখলাম সমুদ্র ক্রমশ বালির ওপর ছোবল মারছে। হঠাৎ তীব্র বাতাসের মধ্যে ছেলেটির গলা কানে এল, আমি একটা চুমু খেলে আপনি কি কিছু মনে করবেন?"

শোনামাত্র সংহিতার মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল, "সর্বনাশ!"

"না। আমার তখন তা আদৌ মনে হয়নি। উলটে খুশি হয়েছিলাম। কেন জানো? ওরকম নির্জন সমুদ্রসৈকতে মধ্যরাতে কোনও পুরুষ যদি আমাকে অত কাছে পেয়েও নির্লিপ্ত থাকত তা হলে জীবনে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম না। মনে হত লোকটা আমাকে নারী বলে মনেই করে না। বলেছিলাম, একটা নয়, দুটো। তারপর আমি ঘুমোব আর আপনি আমাকে পাহারা দেবেন। একবার জল থেকে বাঁচিয়েছেন, এরপর অন্য বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। সে হেসে বলেছিল, চুমুর বদলে এত কাজ করতে হবে? না করার স্বাধীনতা আপনার আছে। সে তখন আমাকে চুমু খেল। পর পর দু'বার। কিন্তু সেটা খাওয়ার সময় আমাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করল না, জড়িয়ে ধরা দূরের কথা। আমার তখন ইচ্ছে করছিল ও আমাকে জড়িয়ে ধরুক। কিন্তু আজ ফেরার সময় ভাবলাম, এই মানুষটা আলাদা।"

"কী নাম ওঁর?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

"প্যাট ওকে রায় বলে ডাকছিল। তালেগোলে আমি ওকে নাম জিজ্ঞাসা করিনি।"

"টেলিফোন নম্বর।"

"নাঃ।"

"সে কী! একটা লোকের সঙ্গে সারারাত কাটালে, তাকে চুমু খেতে অ্যালাউ করলে অথচ তার নামটা জানলে না?"

"ইট ওয়াজ নট ইম্পর্টেন্ট, অন্তত সেই সময়ে নয়। বিশ্বাস করো, এই জীবনে কত ছেলে আমাকে চুমু খেয়েছে চট করে বলতে পারব না, কালকের ব্যাপারটা আমি কোনওদিনই ভুলতে পারব না। ফ্যান্টাস্টিক।" মিলা চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে। ওর হদিশ নিশ্চয়ই তোমার ওই প্যাটের কাছেই পেয়ে যাবে।"

"প্যাট? ও এখন কোথায় চাকরি করে, কোন ফ্ল্যাটে থাকে তার কিছুই জানি না।"

"তুমি একটা আস্ত পাগল!"

"তাই মনে হচ্ছে। বাট আই অ্যাম হ্যাপি টুডে।"

"সেটা তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।"

সিক্তা এক কাপ কফি নিয়ে এল। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি?"

"এই সময় আমি কফি বা চা খাই না।" সংহিতা সিক্তার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, "আচ্ছা মিলা, চুমু খাওয়ার ব্যাপারে তোমার মত বেশ উদার, তাই তো?"

"মোটেই না। যাকে দেখে আমার ভাল লাগে না সে দেখতে যত সুপুরুষ হোক না কেন আমি অ্যালাউ করব না।" মিলা কফিতে চুমুক দিল।

"তা হলে এই যে বললে এই জীবনে কত ছেলে তোমাকে চুমু খেয়েছে, সবাইকে তোমার ভাল লেগেছিল?"

"অফকোর্স।" মিলা বলল, "তুমিই বলো, একজনকে ভাল লাগল বলে আর কাউকে ভাল লাগলে বলতে পারব না?"

"তা বটে। মিলা, তুমি পরলোকে বিশ্বাস করো?"

"নো, নট অ্যাট অল।"

"বাঃ।" মাথা নাড়ল সংহিতা।

"এই একটা জীবনেই আমি সবক'টা লোকে থেকে যেতে চাই।"

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আঁকাআঁকির কী খবর?"

"এক মাস স্রেফ আড্ডা মারব, যা ইচ্ছে তাই করব। বাকি এগারো মাস ভোর থেকে রাত উৎপাদন করা, এগজিবিশনের জন্যে সময় দেওয়া, ওসব এখন ভাবতে চাইছি না। আচ্ছা, তুমি দেখছি এখন এই ফ্ল্যাটে একা আছ, কেন?"

"অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বেশ আছি।"

"তা তো দেখছি। তোমার যা চেহারা, যা বয়স তাতে তো সঙ্গীর অভাব অনুভব করা উচিত। কেউ প্রেমে পড়েনি নিশ্চয়ই বলবে না।" মিলা হাসল।

"সরাসরি কেউ এসে বলেনি, তবে ইঙ্গিত দিয়েছে কেউ কেউ!"

"তুমি অ্যাকসেপ্ট করোনি?"

"দেখতেই পাচ্ছ।"

"কেন?"

"ইচ্ছেই হয়নি।"

"এখনও জয়ব্রতবাবুর স্মৃতি নিয়ে রয়েছ।"

"দুর। ওসব কথা কবে ভুলে গিয়েছিলাম।"

"গিয়েছিলাম মানে?"

"যখন জয়ব্রতর প্রেমে পড়েছিলাম তখন কুড়ির কোঠায় বয়স ছিল। ওটা এমন বয়স যে, মনে হত প্রেমের জন্যে এক লক্ষ কিলোমিটার হেঁটে যাওয়া যায়! ব্যাপারটাকে অনেকেই বোকামি বলে থাকেন কিন্তু আমি বলি না। ওই যে আবেগ, ওই যে বুকের ভেতর চাপ জড়ানো উন্মাদনা, প্রেম ছাড়া অন্য কিছুতে তৈরি হয় না। ওই সময় মানুষ বড় উদার হয়ে যায়। তাই দুঃখ পেলে, প্রতারিত হলে তার প্রতিক্রিয়া খুব মারাত্মক হয়ে যায় কারও কারও ক্ষেত্রে। সুতরাং আমি মনে করি জীবনে ওই পর্ব না এলে একটা বিশাল দিক অজানা থেকে যায়।" সংহিতা বলল।

"হুঁ। প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রেই বোধহয় এটা হয়ে থাকে।"

"দ্বিতীয়বারের অভিজ্ঞতা হয়নি তাই বলতে পারব না। আমি সরে এসেছি তখন, নিজেকে শেষ না করে কাজে ডুবে গিয়ে দেখলাম মনের ভেতরে আর কোনও হতাশা নেই। আর রক্ত ঝরছে না। যখনই ছবি শেষ করি তখনই মনে হয় ভাগ্যিস প্রতারিত হয়েছিলাম নইলে এই ছবি আঁকতে পারতাম না!"

"কিন্তু তোমার শরীর? তার চাহিদা নেই?"

"এক ভদ্রলোক আমাকে শিখিয়েছেন ওসব থেকে উত্তরিত হতে।"

"তাই বলো। তোমার খুব ভাল বন্ধু?"

"নিশ্চয়ই।"

"অথচ প্রেমিক নন!"

"সুযোগ পাননি।"

"আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"কবে দেবে? আজই দাও না!" উৎসাহিত হল মিলা।

"আজ যে আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে মিলা!"

"কোথায়?"

"এমন একটা জায়গা যার সম্পর্কে তোমার খুব খারাপ ধারণা আছে, কিন্তু বহু বছর পরে জায়গাটা পালটাল কিনা তা তোমার জানা নেই। সেখানে গিয়ে দেখলে ধারণাটা পালটাতে পারে আবার একই থেকে যাবে। একই থেকে গেলে ভবিষ্যতে আর যাওয়ার দরকার হবে না। আমাকে সেরকম জায়গায় যেতে হবে।"

"খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে হচ্ছে।"

"আমার কাছে তেমন গুরুত্ব ছিল না। ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আজ গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে।"

"কী কারণ?"

"সেটা এখনই বলতে পারছি না ভাই।"

"আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?"

"আজ থাক। যদি বুঝি তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ আবার যদি আমার প্রয়োজন হয় তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যাব।"

"সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ো কিন্তু।"

গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সংহিতা। জয়ব্রতর বাড়িতে যখন শেষবার গিয়েছিল সে তখন তার গাড়ি ছিল না। আজ ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিল কোন পথে যেতে হবে। বহু বছর এই এলাকায় সে আসেনি। কলকাতার প্রায় উপকণ্ঠের সেই চেহারা এখন অনেক বদলে গিয়েছে। অনেক নতুন বাড়ি, দোকান, চওড়া রাস্তা জায়গাটাকে তার কাছে প্রায় অচেনা করে দিয়েছে। একটা মোড়ের কাছে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, "এবার কোন দিকে যাব?"

রাস্তাটার নাম বলে সংহিতা জানাল, "বত্রিশ বাই এক নম্বর বাড়িটা খোঁজো।"

পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে রাস্তা ধরে একটু এগোতেই বাড়িটাকে চিনতে পারল সংহিতা। দোতলা বাড়িটায় যে কত বছর চুন বা রং পড়েনি তা ঈশ্বর জানেন। যে-চেহারায় দেখে গিয়েছিল প্রায় সেই চেহারাতেই রয়েছে। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল সংহিতা। বাড়ির একতলার দরজা-জানলা বন্ধ। দোতলার একটা জানলা খোলা। মাত্র দেড় কাঠা জমিতে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল।

দরজার পাশে বেলের বোতাম টিপল সংহিতা। সে লক্ষ করল ওই বেলটিরও বদল হয়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয়বার বোতাম টিপল সে। এবার একটি মহিলাকণ্ঠ জানতে চাইল, "কে?"

"আমি! জয়ব্রতবাবু আছেন?"

এবার দরজা খুলল এক প্রৌঢ়া। খুব রোগা, খাটো চেহারা। মাথা নেড়ে বলল, "বাবু বাড়িতে নেই, ডাক্তারের কাছে গেছেন!"

"কখন ফিরবেন তা বলে গেছেন?"

"মেয়েকে একা রেখে বাবু বেশিক্ষণ বাইরে থাকেন না। আপনি কে?"

সংহিতা একটু ভাবল, "আমি এই বাড়িতে এককালে আসতাম। জয়ব্রতবাবু আমাকে ফোন করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এখানে আসার জন্যে।"

"ও!" প্রৌঢ়া ঠিক বুঝতে পারছিল না।

"টিকলি কোথায়?"

"ওপরের ঘরে।"

"ওর সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি!"

"ও কারও সামনে বের হয় না। আপনি যদি দেখতে চান তা হলে কথা বলবেন না, দেখেই চলে আসবেন। আসুন।" সংহিতা ভেতরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করল প্রৌঢ়া।

একতলার বসার ঘরটা একদম আগের মতো আছে। এতগুলো বছরেও চেয়ারগুলো বদলায়নি। সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে সংহিতা বলল, "ওকে বলুন সংহিতামাসি এসেছে। আমার নাম শুনলে বোধহয় আসতে রাজি হবে। আমি এই ঘরে বসছি।"

"না। আসতে পারবে না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

কিছুটা অবাক, কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে দোতলায় উঠল সংহিতা। বারংবার মনে হচ্ছিল সময় এই বাড়িতে থেমে গেছে। এত বছরে একটুও এগোয়নি। বাড়ির দেওয়ালে রঙের প্রলেপ শেষ কবে পড়েছিল বোঝাই যাচ্ছে না।

একটা দরজার কাছে গিয়ে ঠোঁটে আঙুল চেপে কথা বলতে নিষেধ করল প্রৌঢ়া। তারপর দরজায় শব্দ করে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সরু নারীকণ্ঠ শুনতে পেল সংহিতা, "মাসি!"

প্রৌঢ়া জবাব দিল, "হ্যাঁ গো।"

"কে বেল বাজাল? বাবা?"

"না না। উটকো লোক।"

"দু'বার বাজিয়েছিল, না?"

"হ্যাঁ। দুধ এনে দিই?"

"না।"

"কেন?"

"আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

সরু কণ্ঠস্বর প্রায় বালিকার মতো। টিকলির এখন যা বয়স তাতে এরকম গলার স্বর খুবই অস্বাভাবিক। সংহিতা কয়েক পা এগিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। ফলে এই বিকেলেই একটা আলো জ্বালাতে হয়েছে। ঘরের প্রান্তের খাটে বসে আছে যে তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। মুখে হাত চাপা দিল বিস্ফারিত চোখে।

দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বসা শরীরটার কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সবুজ নাইটিতে, যা প্রায় আলখাল্লার মতো দেখতে, ঢাকা রয়েছে। মাথায় ওই রঙের বড় রুমাল বাঁধা থাকায় চুল আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। দুটো পা সামনের দিকে ছড়ানো যা নাইটির আড়ালে রয়েছে। চোখ দুটো কালো চশমার আড়ালে।

"অনেকক্ষণ বসে আছ এবার একটু শোও।"

"আমার হিসু পেয়েছে!"

"দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।" বলে প্রৌঢ়া দরজার দিকে তাকাল। সংহিতা দ্রুত সরে এল সেখান থেকে। দ্রুত নীচে নামতে গিয়ে সতর্ক হল যাতে শব্দ না হয়। নীচের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে থাকল সে কিছুক্ষণ। এ কী দেখল সে? সেই টিকলি, যে এ-বাড়িতে এলেই ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরত, যাকে দেখলে সে হেসে বলত, বড় হলে তুই কত ছেলেকে যে পাগল করে দিবি কে জানে, সে-ই মেয়ে ওই পোশাকে কালো চশমা পরে ঘরের মধ্যে বসে আছে? কেন? শরীরের কোথাও কোনও নাড়াচাড়া নেই, মনে হচ্ছে একটা বালির বস্তা পড়ে আছে। আকৃতিও বড় হয়ে গেছে প্রচুর।

কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সংহিতা। চলে যাবে? তখনই মনে হল জয়ব্রত যে টিকলিকে নিয়ে সমস্যার কথা বলেছিল সেটা মিথ্যে নয়। মেয়ের ব্যাপারে মিথ্যে বলেনি বাবা। তারপরেই মেরুদণ্ড কনকন করে উঠল সংহিতার। এক লহমার জন্যে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি, কাঁটা ফুটল। গত রাতে স্বপ্নে যে-বিকৃত চেহারার স্ত্রীলোকটিকে সে দেখেছিল, যার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না, সে নিজের নাম বলেছিল, টিকলি। এই টিকলি যে ওপরের ঘরে সমস্ত শরীর, মাথা, চোখ ঢেকে বসে আছে তার এই অবস্থা তো সে কখনওই কল্পনা করেনি। মানুষ যা ভাবে তাই স্বপ্নে ঘুরে আসে, এই কথাটা এক্ষেত্রে আদৌ সত্যি নয়। তা হলে এরকম মিল হল কী করে! হ্যাঁ, সেই টিকলির শরীর বিকৃত ছিল,

পিঠে কুঁজ ছিল, এই টিকলির তা নেই। কিন্তু একেও তো প্রতিবন্ধী বলেই মনে হচ্ছে।

"আপনি কি এখানেই বসবেন?"

মুখ তুলে সংহিতা দেখল প্রৌঢ়া দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, "ওর কী হয়েছে?"

"আপনি শোনেননি?"

"না!"

"বিয়ের শাস্তি পেয়েছে।"

"মানে?"

"স্বামী আর শাশুড়ি মিলে ওর মাথায় শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল। চিৎকার শুনে পাড়ার লোকে ছুটে গিয়ে হাসপাতালে ভরতি করে।"

"সে কী!" চোখ বড় হয়ে গেল সংহিতার।

"মানুষ না, শয়তানেরও অধম। তেনারা পালিয়ে গিয়েছিলেন। পাড়ার লোকজন বাড়িটাকে ভাঙে। শেষে পুলিশ ওদের ধরে। জজসাহেব সারাজীবন জেলে থাকার হুকুম দিয়েছেন। কী হবে তাতে? ও তো কোনওদিন দেখতে পাবে না, হাঁটতেও পারবে না।" প্রৌঢ়া আঁচলে চোখ মুছল।

এই সময় বেল বাজল। প্রৌঢ়া দ্রুত চলে গেল দরজা খুলতে। নিচু গলায় তাকে কিছু বলল প্রৌঢ়া। তারপরেই দরজায় যাকে দেখল তাকে রাস্তায় দেখলে জয়ব্রত বলে চিনতে পারত না। মাথা প্রায় নেড়া। গায়ের রং কালচে। শরীর এত রোগা হয়ে গেছে যে, কাঁধ দুটোকে পাঞ্জাবির হ্যাঙার বলে মনে হচ্ছে। গালের দু'পাশ বসে গেছে।

সংহিতার মনে হল, এই মানুষটিকে সে চেনে না।

জয়ব্রত ম্লান হাসি হাসল। তারপর বলল, "অনেক ধন্যবাদ, শেষপর্যন্ত এলে।" কথাগুলো বলে উলটোদিকের চেয়ারে সে বসল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি প্রায় আগের মতো রয়েছ।"

"আগের মতন কেউ চিরকাল থাকতে পারে না। প্রায় তিন দশক তো এমনি এমনি চলে যায় না। কিন্তু তোমার চেহারা এরকম হল কেন? এই পরিবর্তন তো স্বাভাবিক নয়।" বেশ কেটে কেটে কথাগুলো বলল সংহিতা।

"আমার কথা ছেড়ে দাও।" হাত নাড়ল জয়ব্রত।

"ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে শুনলাম।"

"হ্যাঁ। ওটা রুটিন ব্যাপার। তুমি ওপরে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। ওই পাশবিক কাজ ওরা কেন করল?"

"টাকার জন্যে। বিয়েতে যৌতুক নেয়নি। চাইলে বিয়ে দিতাম না ওখানে। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পরেই টাকা চাওয়া শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে দশ হাজার, বিশ হাজার। মেয়েটা এসে কান্নাকাটি করত বলে দিতাম। কিন্তু আমার সাধ্য যে বেশি নয় তা জেনেও ওরা দু'লক্ষ চাইল। দিতে পারিনি। এই জন্যে অত্যাচার করত খুব। যেদিন মেয়ে প্রতিবাদ করল, থানায় গিয়ে নালিশ করবে বলল সেদিন অ্যাসিড ঢেলে ওকে স্তব্ধ করে দিতে চাইল। প্রতিবেশীরা ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছিল বলে শেষপর্যন্ত প্রাণটা থেকে গিয়েছে। আইন ওদের ঠিক শাস্তি দিয়েছে কিন্তু ওর কথা ভেবে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।" করুণ গলায় বলল জয়ব্রত।

"ওর চিন্তাতেই কি শরীরের এমন অবস্থা হয়েছে?"

"না-না।"

"এখন ও হাঁটতে পারছে না?"

"না। দুটো পা জুড়ে গেছে।"

"ডাক্তার কী বলছে? নিশ্চয়ই এর চিকিৎসা আছে!"

"প্রাণরক্ষা হয়ে যাওয়ার পর আর আমি চিকিৎসা করাতে পারিনি।"

"সে কী?"

"যা ছিল ওকে বাঁচাতেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন সার্জারিতে ওর শরীর আবার আগের আদল ফিরে পাবে। বেশ কয়েকবার সেটা করাতে হবে। আমার পক্ষে তার ব্যয় বহন করা সম্ভব ছিল না।"

"তাই বলে মেয়েটাকে ওইভাবে বাড়িতে ফেলে রাখা হবে?"

"এতদিন তাই তো ছিল, কিন্তু এর পরে কী হবে তাই ভেবে পাচ্ছি না। সংহিতা, আমি তিন দশক তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। কখনও ফোন পর্যন্ত করিনি। পেন্টার হিসেবে তোমার আজকের যে-খ্যাতি তার প্রতিটি স্তর আমি জানি কিন্তু কখনও তোমার এগজিবিশনে যাইনি। লজ্জায় সংকোচে আমি দূরেই থেকে গিয়েছি। এখন সামনে পিছনে কোথাও যাওয়ার পথ নেই। তোমার সঙ্গে যা করেছি তার পরেও আজ পরামর্শ চাওয়া মোটেই শোভন নয়। তবু শেষপর্যন্ত বাধ্য হলাম ফোন করতে।" দু'হাতে মুখ ঢাকল জয়ব্রত।

"চিকিৎসা যখন বন্ধ তখন রুটিন মতো ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে কেন? আমি স্পষ্ট কথা শুনতে চাই, অবশ্য সেটা বলতে যদি অসুবিধে না হয়।"

"আমি টিকলির জন্যে ডাক্তারের কাছে যাইনি।"

সংহিতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"আমার সময় খুব কম। অসুখটা যখন ধরা পড়েছিল তখন চিকিৎসা করাতে গিয়ে খরচের পরিমাণ যা শুনলাম তা আমার সাধ্যের বাইরে। ওই টাকা থাকলে তো টিকলির চিকিৎসা করাতে পারতাম। তবু ধার করে, স্কুল থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে নিজের চিকিৎসা করাতে পারতাম কিন্তু জানলাম তাতে যে সম্পূর্ণ সুস্থ হব তা কেউ সঠিক বলতে পারল না। তাই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেলাম। ভাল ডাক্তার। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা অ্যালাপ্যাথিতে করিয়ে তারপর নিজের ওষুধ দেওয়া শুরু করলেন। ওষুধে কাজ হয়নি বলব না, কিন্তু ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা কমে আসছে। প্রত্যেক দশ দিনে একবার তাঁর কাছে যেতে হয়। রুটিন ব্যাপার। এখন একটাই প্রশ্ন, আমি চলে গেলে মেয়েটার কী হবে? আমি যদি ওকে মেরে ফেলতে পারতাম তা হলে নিশ্চিন্ত হতাম। আমি চলে যাওয়ার পর ওই ঘরে না খেয়ে একসময় ও মারা যাবে। সেটা ভাবলেই ছটফট করে উঠি। কিন্তু বাবা হয়ে মেয়েকে মারব কী করে! ওর সমস্ত শরীর যখন অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিল তখন মাসের পর মাস আমি ওর পাশে থেকে যে-সেবা করেছিলাম তা কি একদিন মেরে ফেলব বলে?" হাঁ করে শ্বাস নিল জয়ব্রত।

"হোমিওপ্যাথির ডাক্তার কোথায় থাকেন?"

"কেন?"

"এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।"

পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করল জয়ব্রত। প্যাকেট থেকে ছোট পুরিয়াগুলো বের করে পকেটে রেখে ওটা এগিয়ে দিল সংহিতার দিকে।

প্যাকেটের গায়ে লেখা ঠিকানা পড়ে উঠে দাঁড়াল সংহিতা, "আমি আজ আসছি।"

জয়ব্রত দাঁড়াল, "টিকলির সঙ্গে কথা বলেছ?"

"না। তার আমাকে মনে রাখার কোনও কারণ নেই। আসছি।"

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে ঠিকানাটা দিল সংহিতা। মিনিট পনেরো পরে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ডাক্তারের চেম্বার পাওয়া গেল। সংহিতা দেখল অনেক মানুষ ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। শুনতে পেল, অ্যাপয়ন্টমেন্ট না করে এলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। বোঝাই যাচ্ছিল, ডাক্তারের চাহিদা আছে।

শেষপর্যন্ত সে ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করে প্যাকেটের ওপর লেখা ফোন নম্বরটায় ডায়াল করল। কিছুক্ষণ বেজে যাওয়ার পর সাড়া পাওয়া যেতেই সংহিতা বলল, "নমস্কার। ডাক্তারবাবু বলছেন?"

"বলছি।"

"আমি একজন চিত্রশিল্পী। আমার নাম সংহিতা। আমি কোনও অসুস্থতার কারণে আপনার কাছে আসিনি। কিন্তু তার চেয়ে জরুরি কথা জানতে চাই। যদি দুই কি তিন মিনিট সময় দেন তা হলে কৃতার্থ হব।"

"আপনি কোথায় আছেন এখন?"

"আপনার চেম্বারের সামনে।"

"আপনি সোজা ভেতরে ঢুকে আমার অ্যাসিস্টেন্টকে নামটা বলুন।"

মোবাইল অফ করে একটু অপেক্ষার পরে পেশেন্টদের সামনে দিয়ে এগিয়ে সে দেখল একজন খাতায় কিছু লিখছেন। তাঁকে নাম বলতেই বললেন, "এখানে একটু দাঁড়ান, পেশেন্ট বেরিয়ে গেলে ঢুকবেন।"

সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষায় থাকা মানুষেরা গুঞ্জন শুরু করল কিন্তু লোকটি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। মিনিট সাতেক পরে এক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা ভেতর থেকে বের হতেই লোকটি তাকে ইশারা করল ভেতরে যেতে।

ডাক্তার বেশ প্রবীণ। তাঁকে নমস্কার করল সে, "আমি সংহিতা।"

"সমস্যাটা কী?"

ওষুধের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল সংহিতা, "এই ভদ্রলোক আপনার কাছে চিকিৎসায় আছেন। দীর্ঘদিন পরে আমি তাঁকে দেখলাম। উনি বলেছেন ওঁর জীবন শেষ হয়ে আসছে। ঠিক কী হয়েছে ওঁর? আজ আপনার কাছে এসেছিলেন তিনি।"

ডান দিকে রাখা লম্বা খাতা খুলে প্যাকেটের নম্বরের সঙ্গে খাতায় লেখা নম্বর মিলিয়ে মাথা নাড়লেন ডাক্তার, "আপনি ওঁর কে হন?"

"সেটা না জানলে কি আপনার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়?" সংহিতা হাসল।

"ঠিক আছে। উনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। এখনও করছি। এখন মনে হচ্ছে হেরে যেতে হবে। সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে।"

ঠোঁট কামড়াল সংহিতা। তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে।

বাড়ির দিকে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভার। চোখ বন্ধ করে বসেছিল সংহিতা। স্পষ্ট হয়ে গেল দৃশ্যটা। প্রচণ্ড খেপে গিয়ে সে আঙুল তুলে বলেছিল জয়ব্রতকে, "তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার সততা নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করেছ, তার ফল তোমাকে ভুগতে হবে।" জয়ব্রত উত্তর না দিয়ে মুখ অন্য পাশে ফিরিয়েছিল। তাতে আরও খেপে গিয়েছিল সে, "জবাব দাও। তুমি— তুমি— বিশ্বাসঘাতক, শয়তান। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমার ভাল হবে না।"

সংলাপটি মনে পড়ামাত্র কেঁপে উঠল সংহিতা। চোখ খুলে ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তা দেখল কয়েক মুহূর্ত। হ্যাঁ, এই কথাগুলো বলেছিল সে, কিন্তু কোনও অভিশাপ উচ্চারণ করেনি ওই সর্বনাশ হয়ে যাবে ছাড়া। তা ছাড়া এই যুগে কেউ অভিশাপ দিলে কারও খারাপ হয়? অপমানিত হয়ে রাগের ঝোঁকে যেসব শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে সেগুলো যদি অভিশাপ হয়ে সত্যি ক্ষতি করে তা হলে ভাবতে হবে আমরা এখনও সত্যযুগে আছি। কিন্তু আজ যা দেখে এল তার চেয়ে সর্বনাশ মানুষের কী হতে পারে!

অভিশাপ সত্যি হোক বা না হোক, আজ খুব খারাপ লাগছিল তার। জয়ব্রত তার সঙ্গে যা করেছিল তা নিশ্চয়ই খুব অন্যায় কিন্তু তার জবাবে সে নিজেও তো কম অন্যায় করেনি। রেগে গিয়ে যা বলেছিল তাই তো সত্যি হয়ে গেল। অবশ্য সে কথাগুলো না বললেও হয়তো ওর এই অবস্থা হত, কিন্তু কে জানে, ন্যাও হতে পারত। একটা অনুশোচনাবোধ তিরতির করে মনের ভেতর ঢুকে পড়ছিল। সেটাকে কাটাতে সোজা হয়ে বসল সংহিতা। সে সেদিন জয়ব্রতকে অভিশাপ দিয়েছিল, টিকলিকে নয়। টিকলি তো কোনও অন্যায় করেনি। তা হলে বেচারা এমন শাস্তি কেন পেল?

"যারা অনুশোচনা করে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন। যে ক্ষমা করে দেয় সে

বীরের কাজ করে।" স্বপ্নে শোনা আকাশবাণী চলকে উঠল মনে। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সংহিতা। আর তখনই মোবাইলটা শব্দ করল। ওটাকে অন করে হ্যালো বলতেই সে শুনতে পেল, "সংহিতা, আমি মিসেস কপুর বলছি। কেমন আছেন?"

নীরবে হাসল সংহিতা। জবাব না দিয়ে বলল, "কী ব্যাপার, বলুন!"

"হ্যাঁ, গতকাল বিকেলে ডক্টর মালহোত্রা এসেছিলেন এখানে। যে ছবিগুলো লাস্ট এগজিবিশনে বিক্রি হয়নি সেগুলো প্যাক করতে আমার লোক ব্যস্ত ছিল। ডক্টর তাঁর মধ্যে থেকে আপনার ওই—এ বিউটিফুল মর্নিং, ছবিটি খুব পছন্দ করে ফেলেন। আপনার রাখা প্রাইস ওঁকে বলা হয়েছিল। একটু আগে উনি কনফার্ম করলেন, কিনবেন। কিন্তু কেনার সময় আপনার সঙ্গে ছবি তুলতে চান।"

প্রস্তাবটা নাকচ করতে গিয়েও সামলে নিল সংহিতা। যে-লোক আট লাখ টাকা দিয়ে ছবি কিনবে সে যদি শিল্পীর সঙ্গে ফটো তুলতে চায় তা হলে আপত্তি করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আজকাল ছবির ক্রেতারা অনেক সাবধান হয়ে গেছে। নামী শিল্পীর আঁকা ছবি জাল হচ্ছে। পরে বিক্রি করতে গিয়ে প্রমাণ করা যাচ্ছে না ছবিটা অরিজিন্যাল না কপি! শিল্পীর স্বাক্ষর ছাড়াও ডিক্লেরাশন দিতে হচ্ছে। ছবির পিছনে শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুললে সেটাকেও ডকুমেন্ট হিসেবে কেউ রাখতে চাইছে।

"ঠিক আছে মিসেস কপুর। সময়টা বলে দেবেন।"

"আপনি এখন কোথায়? এখানে আসা কি সম্ভব হবে?"

"ভদ্রলোক কি ওখানে আছেন?"

"বলেছেন ফোন পেলেই চলে আসবেন।"

"আপনি ফোন করুন, আমি আসছি।"

গ্যালারিতে যখন পৌঁছোল সংহিতা তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। বেশ বড় গ্যালারি। এই শহরে তো বটেই, বাইরের শহরগুলোতেও মিসেস কপুরের সম্পন্ন কাস্টমারের সংখ্যা অনেক। মিসেস কপুর তাকে খাতির করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। দারুণ সাজানো এই গ্যালারি এবং অফিসঘর। চা বা ঠান্ডার প্রস্তাব নাকচ করল সংহিতা। মিসেস কপুর বললেন, "আপনি বলেছিলেন এবার নতুন ছবির এগজিবিশন করা যেতে পারে। কবে করতে চান?"

"এখনই না। আরও কিছুদিন—।"

"দেখবেন, অন্য গ্যালারি যেন সুযোগটা না পেয়ে যায়!" হাসলেন মিসেস কপুর।

জবাবে আলতো হাসল সংহিতা। উত্তর দিল না। অভিজ্ঞতা তাকে এইভাবে এড়িয়ে যেতে শিখিয়েছে।

এই সময় বাইরে থেকে গলা ভেসে এল, "আসতে পারি?"

মিসেস কপুর উঠে দাঁড়ালেন, "আসুন, প্লিজ।"

সংহিতা দেখল বেশ প্রবীণ মানুষটি, মাথার আশি ভাগ টাক, ফরসা, ঘরে ঢুকে হাতজোড় করলেন। সংহিতাকে উঠতে হল নমস্কার ফিরিয়ে দিতে।

মিসেস কপুর বললেন, "বসুন, কী দিতে বলব? ঠান্ডা না গরম?"

ডাক্তার মালহোত্রা মাথা নাড়লেন, "অনেক ধন্যবাদ, আমাকে এখনই ছুটতে হবে। একটা সময়সাপেক্ষ অপারেশন করতে হবে।" তারপর সংহিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ছবিটি খুব ভাল লেগেছে। দেখলেই ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি। আগে আমি ছবি কিনেছি কয়েকটা। কিন্তু এখন নাকি কিনলেই হয় না, ছবিটা যে আইনসম্মতভাবে নিচ্ছি তার প্রমাণও রাখতে হয়।"

মিসেস কপুর বললেন, "হ্যাঁ। খুব জালিয়াতি হচ্ছে। ভাল আঁকেন এমন কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা কপি করলে বুঝতেই পারবেন না আপনি।"

সংহিতার আঁকা ছবির পিছনে ওঁরা তিন জন দাঁড়ালে ফটোগ্রাফার ফটো তুললেন। মালহোত্রা বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভাল লাগত কিন্তু বুঝতেই পারছেন—!"

"অপারেশনটা কী ধরনের?"

"এই পেশেন্টের গাম-এ ক্যান্সার হয়েছিল। মুখের অনেকটা অপারেট করে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেটা দেড় বছর আগে। কিন্তু তার ফলে মুখের চেহারা বীভৎস হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না। আমি চেষ্টা করব মুখটাকে নর্মাল চেহারায় ফিরিয়ে দিতে। একবারে হবে না, শেষ করতে মাস ন'য়েক লেগে যাবে।"

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গে কার্ড আছে?"

"নো। কেন বলুন তো?"

"আমি যদি একজন পেশেন্টকে আপনার কাছে নিয়ে যেতে চাই!"

"মিসেস কপুর আমার নাড়িনক্ষত্র জানেন। ওঁকে বললেই—!"

"নো ডক্টর।" মিসেস কপুর মাথা নাড়লেন, "আপনার অ্যাপয়ন্টমেন্ট চার মাসের আগে পাওয়া যায় না।"

"সাধারণত তাই। আমি সারাদিনে চারজনের বেশি পেশেন্ট দেখি না। কিন্তু যে-শিল্পীর ছবি আমাকে খুশিতে রাখবে তিনি চাইলে আমি পরের দিনই সময় দেব। আচ্ছা, চলি। ওহো, মিসেস কপুর চেকটা পেয়েছেন নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ। থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।" মিসেস কপুর বললেন।

আজ যে মিলা হুইস্কির বোতল ব্যাগে ভরে এনেছিল তা বুঝতে পারেনি সংহিতা। সন্ধে পেরিয়ে বাড়ি ফিরেই মাছ ভাজার গন্ধ নাকে পেল। সিক্তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে জানাল, "নতুনদিদি বললেন কিছু একটা ভেজে দিতে, তাই—!"

বসার ঘরে টিভি চলছে। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড। সোফায় বাবু হয়ে বসে মিলা টিভির দিকে তাকিয়েছিল, ঘরে ঢুকতেই সে হাত নেড়ে বসতে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার। ওই দেখো, ছোট্ট গর্তটায় থিকথিক করছিল ব্যাঙাচি। জল শুকিয়ে আসছে দেখে মা ব্যাং লাফিয়ে চলে গেল দশ ফুট মাটি ডিঙিয়ে পাশের বড় পুকুরে। জল না থাকলে ব্যাঙাচিগুলো মরে যাবে বলে ব্যাংটা পিছনের দুটো পা দিয়ে ক্রমাগত নালা কেটে চলেছে। দেখো।"

সংহিতা দেখল। ছোট্ট গর্তের জল প্রায় শুকনো। বড় ব্যাংটা একটুও না থেমে মাটির ভেতরে নালা তৈরি করতে করতে শেষপর্যন্ত গর্তে পৌঁছে যেতেই পুকুরের জল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল গর্তে। ব্যাঙাচিগুলো প্রাণ বেঁচে যাওয়ার আনন্দে লাফাতে লাগল। কেউ কেউ নালার জল বেয়ে চলে গেল পুকুরে।

সংহিতা মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "দারুণ।"

মিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "একটা ব্যাঙের মনেও যে সন্তানদের জন্যে এত স্নেহ রয়েছে না দেখলে ভাবতে পারতাম না। এ ব্যাপারে প্রাণীরা মানুষের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। একটু খাবে?"

মিলার সামনের টেবিলে হুইস্কির বোতল এবং গ্লাস রয়েছে।

সংহিতা মাথা নাড়ল, "নাঃ। দু'-একবার খেয়ে দেখেছি, রাত্রে ঘুম হয় না, মাথা ধরে। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে কোনও লাভ নেই। তুমি খাও।" সংহিতা বসল।

টিভি বন্ধ করে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "কী হল? এত সময় লাগল?"

একটু ভাবল সংহিতা। বুকের ভেতর যে-ভারটা জন্মেছিল সেটা একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। তার একার পক্ষে তাকে বহন করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মিলা তো জীবনকে দেখে তাৎক্ষণিকের চোখে। কোনও কিছুকেই ও গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না। তারপরেই মনে হল, কিন্তু মিলা ছবি আঁকে। ওর ছবি তো ঠিক উলটো কথা বলে। তা হলে!

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমি শুনতে চাই।"

কথা বলল সংহিতা, "বহু বছর আগে, আমার ডিভোর্সের কয়েক মাস পরে আমি একজনের সংস্পর্শে এসেছিলাম, ভালবেসেছিলাম। সে-ও তখন ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে একা, স্ত্রী চলে গেছেন। কিন্তু আমি প্রতারিত হয়েছিলাম। সেসব গল্প এখন অবান্তর। সেসময় নিজেকে সামলাতে পারিনি। তাকে গালমন্দ করেছিলাম, অভিশাপ দিয়েছিলাম, একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে তারও। তারপর প্রায় তিন দশক কোনও সম্পর্ক ছিল না, তার খবর রাখার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

"কিন্তু এখন তো আমাকে অনেকেই চেনে। গ্যালারিগুলোতে খোঁজ নিলেই টেলিফোন নম্বর পাওয়া যায়। হঠাৎ ক'দিন আগে থেকে সে আমাকে ফোন করতে শুরু করল। প্রথমবার নম্বর না চেনা বলে ধরেছিলাম। তারপর ওই নম্বর দেখলে আর সুইচ অন করিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে নিষেধ করতে গিয়ে শুনলাম যে তার মেয়ে, যাকে চার-পাঁচ বছরে আমি খুব স্নেহ করতাম, তাকে নিয়ে সে খুব বিব্রত হয়ে আছে। এত বিব্রত যে, মেরে ফেলতে পারলে বেঁচে যেত। ব্যাপারটা অসত্য বলে ধরে নিয়েও আমি আজ তার বাড়িতে গিয়েছিলাম।" থামল সংহিতা।

মিলা বলল, "মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেল?"

"সেটা হলে খুশি হতাম।" সংহিতা শ্বাস ফেলল।

"তার মানে?"

"গিয়ে দেখলাম ওর মেয়ের সমস্ত শরীর অ্যাসিডে পুড়ে একটা বেঢপ মাংসপিণ্ড হয়ে গিয়েছে। চোখ অন্ধ, মাথায় কোনও চুল নেই, হাঁটতে পারে না।"

"মাই গড! কী করে হল, ওইটুকু মেয়ে—!"

"তখন ওইটুকু ছিল, এখন তিরিশ পেরিয়েছে। বাবার কাছে টাকার পর

টাকা চেয়ে না পেয়ে মেয়েকে পুড়িয়েছে স্বামী-শাশুড়ি। তারা শাস্তি পেয়েছে, কিন্তু—।"

"উঃ। তুমি দেখলে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু নাইটিতে মোড়া ছিল শরীর, চোখে কালো চশমা, মাথায় রুমাল বাঁধা। সহ্য করা মুশকিল।"

"ওদের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। বুঝতে পেরেছি, এখন এইরকম মেয়ে ভদ্রলোকের কাছে বোঝা হয়ে গিয়েছে!"

"না। এতদিন মেয়ের পাশে ছিল সে। ওকে বাঁচাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। প্লাস্টিক সার্জারি করে চেহারা শেপে আনতে যে-খরচ তা ওর সঞ্চয়ে নেই। তার ওপর সে নিজেই ক্যান্সারে আক্রান্ত!"

মিলা গ্লাস তুলছিল চুমুক দেওয়ার জন্যে, হাত কেঁপে উঠল, নামিয়ে রাখল সেটা। চাপা গলায় বলল, "কী বলছ?"

"কথাটা যে মিথ্যে নয় আমি তার প্রমাণ নিয়ে এসেছি।"

ওদের কথা বলার ফাঁকে সিক্তা এক প্লেট মাছভাজা দিয়ে গিয়েছিল। সেদিকে নজর ছিল না মিলার। এক ঢোকে গ্লাসের বাকিটা গলায় চালান দিয়ে ঠোঁট মুছল হাতের উলটোপিঠে। তারপর বলল, "কিন্তু এতে তোমার কোনও ভূমিকা নেই।"

"না নেই।" মাথা নাড়ল সংহিতা।

"পৃথিবীর অনেক মানুষ গভীর কষ্টের মধ্যে কোনওমতে বেঁচে আছে, কেন বেঁচে আছে তা তারাই জানে না, একজন চলে গেলে অন্য জন মুখ থুবড়ে পড়বে, তুমি কতজনকে নিয়ে ভাববে? আর অভিশাপ দেওয়া? ওটা ফালতু। অল্প বয়সে আমিও কয়েকজনকে অভিশাপ দিয়েছিলাম। তারা সবাই দিব্যি বেঁচে আছে। ফুলেফেঁপে আনন্দেই আছে। আগে বোধহয় শকুনের অভিশাপে গোরু মারা যেত, এখন ঈশ্বরের অভিশাপেও কোনও কাজ হয় না। তুমি ভেবো না, বহু বছর আগে তুমি অভিশাপ দিয়েছিলে বলে আজ ওদের এই দুর্দশা।" মিলা আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল।

"আমি কিছুই ভাবছি না।"

"দ্যাটস গুড। একটা নাও, বেরিয়ে আসতে পারবে।"

"নাঃ। তুমি ডিনার করবে না?"

"এই তো," ভাজা মাছগুলো দেখাল মিলা আঙুল তুলে, "এটাই আমার

ডিনার। আমি আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব।" মিলার কথা একটু জড়িয়ে এল।

"আমি উঠলাম।" সংহিতা দাঁড়াল।

"বাট, বিশ্বাস করো, আমি ওই মেয়েটাকে, কী যেন নাম—, হ্যাঁ, যাকে পোড়ানো হয়েছিল—!"

মিলাকে সাহায্য করল সংহিতা, "টিকলি।"

"হ্যাঁ, টিকলি টিকলি!" আচমকা চুপ করে গেল মিলা। বেরিয়ে এল সংহিতা।

ছায়াছায়া অন্ধকারটা চলে গিয়ে কাচের মতো আলো এখন চারধারে। সে দেখল সংখ্যায় তারা বেড়ে গেছে কিন্তু সেই বিকৃত শরীরের স্ত্রীলোকটি ধারেকাছে নেই। টিকলি। টিকলি কোথায় গেল? যে হাঁটতে পারে না সে উধাও হল কী করে? তার জায়গায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না নিচু হয়ে থাকায়, কিন্তু তিনি যে একজন পুরুষ এবং অতিবৃদ্ধ তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ পায়ের তলায় কাঁপুনি শুরু হল। ক্রমশ সেটা দ্রুত হচ্ছিল আর সেইসঙ্গে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সবাই বসে পড়ল। তবু শরীর ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ নাকে তীব্র কটু গন্ধ প্রবেশ করল। তার দাপটে জ্ঞান হারাল সবাই।

যখন জ্ঞান ফিরে এল, সেটা কতটা সময়ের পর কেউ জানে না, তখন আতঙ্কিত হয়ে হাহাকার করতে লাগল সবাই। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে পশ্চিম আকাশে সূর্য দেখা দিল। সূর্য ওঠার পর আর একবার ভূকম্পন হল এবং সেটা থেমে গেলে একটি ভয়ংকর দর্শন প্রাণী সামনে চলে এল। সে মানুষের মতো কথা বলতে পারে এবং গতিতে কেউ তাকে হারাতে পারবে না। এই প্রাণীর হাতের লাঠি এগিয়ে এসে প্রত্যেকের মুখ স্পর্শ করল। তার ফলে কারও চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে গেল, কারও শরীরে ভয়ংকর কালো রং ছড়িয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ধ্বনিত হল। সে অবাক হয়ে দেখল যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের বেশির ভাগই নেই। কিন্তু সেই বৃদ্ধ আলোকিত মুখ ওপরে তুললেন। এখন পায়ের তলার জমি স্থির। সে লক্ষ করে দেখল যাদের মুখ এবং শরীরের রং কালো হয়ে গিয়েছিল তারা ধারেকাছে নেই।

এই সময় আকাশবাণী হল, "তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা মানবজনমের সময়ে কোনও পাপকার্য করোনি। তোমাদের ওপর যে-অন্যায় অত্যাচার হয়েছে তা নীরবে সহ্য করেছ। তোমরা তৃষিতকে পানীয় দিয়েছ, আহতকে সেবা করেছ। স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি থেকে কখনওই দূরে থাকোনি। সেই কারণেই তোমাদের জন্যে স্বর্গের দুয়ার খোলা হয়েছে। তবে সেখানে পৌঁছোবার আগে শেষবার নিজেকে নির্মল করে নিতে হবে।

"তোমরা জানো না স্বর্গ কী, সেখানে পৌঁছোলে কী দেখতে পাবে। এখান থেকে যাত্রা শুরু করার পরে তোমরা একসময় একটি বিশাল খাদের সামনে উপস্থিত হবে। সেই খাদ বেয়ে তীব্র স্রোতের নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই খাদ এবং নদীর ওপাশে দেখতে পাবে বিশাল বিশাল গাছ এবং দিগন্তছোঁয়া মাঠ। ওই মাঠের কাছে পৌঁছোতে তোমাদের একটি দীর্ঘ সেতু অতিক্রম করতে হবে। সেই সেতু অতিক্রম তারাই করতে পারবে যারা এতকাল যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থেকেছ। স্বর্গে গেলে তোমাদের অপূর্ব ফলমূল পরিবেশন করা হবে। সাদা সুন্দর পাত্রে বিশুদ্ধ সুরা যা অতীব সুস্বাদু কিন্তু নেশা তৈরি করবে না, তোমরা গ্রহণ করতে পারবে। তোমরা যাত্রা শুরু করো।"

আকাশবাণী শেষ হওয়ামাত্র সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। সে দেখল ওই বৃদ্ধ তাঁর অশক্ত শরীরের জন্যে এগোতে পারছেন না। সে তাঁর পাশে পৌঁছে বলল, "আপনি আমার কাঁধে একটি হাত রাখুন, আমি আপনাকে সাহায্য করছি।"

বৃদ্ধ কাতর চোখে তাকালেন, "আমার বোঝা তুমি কেন বইতে চাইছ?"

"আপনি আমার পিতৃতুল্য। আসুন।"

বৃদ্ধের পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। কয়েক পা এগিয়েই তিনি থেমে গেলেন, "একটা কথা না বলে আমি পারছি না। আমি যৌবনে অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলাম। চিকিৎসা করিয়ে একটু সুস্থ হলে হাসপাতালে থাকার সময় লুকিয়ে একটা সিগারেট খেয়েছিলাম। ভয় হচ্ছিল, সেই পাপের জন্যে হয়তো আমাকে নরকবাস করতে হবে।"

সে হেসে ফেলল, "ওটা বোধহয় পাপকাজ নয়।"

"কী বলছ! আমি চিকিৎসা করাতে গিয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করছি, সেটা তো অন্যায়। আর অন্যায় মানেই তো পাপ।" বৃদ্ধ শিউরে উঠলেন।

"তা হলে আপনার মুখ আলোকিত হয়ে উঠল কেন?"

"আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত স্বর্গে পৌঁছোতে পারব না। যত এগোচ্ছি তত দুর্বল হয়ে পড়ছি। তুমি আমাকে না ধরে থাকলে পড়ে যেতাম।" বৃদ্ধ বললেন।

সে লক্ষ করল সবাই এখন মাথা তুলে হাঁটছে। কিন্তু হাঁটার গতি কমে গেছে। পশ্চিম আকাশে সেই যে সূর্য উঠেছিল প্রায় সেখানেই থেকে গিয়েছে। কিন্তু ওই সূর্য একদম অচেনা, পৃথিবীতে থাকার সময় দেখতে পায়নি।

আর-একটু এগোবার পর বৃদ্ধের জন্যে দাঁড়াতে হল। একটু স্বস্তি ফিরতেই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "নরক কীরকম অনুমান করতে পারি, স্বর্গে গেলে আর কী পাব?"

হঠাৎ পিছন থেকে একজন বলে উঠল, "স্বর্গসুখ, যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।"

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হে ঈশ্বর, তুমি মহান, আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যে আমি স্বর্গসুখ লাভ করব। আমি নিজেকে চিরকাল তোমার পায়ে অর্পণ করেছি। তাই আজ আমার কোনও চিন্তা নেই।"

আরও খানিকটা যাওয়ার পর পথটা পাহাড়ের ভেতর ঢুকে বেঁকে যেতে আরম্ভ করল। দু"পাশে নেড়া পাহাড়। পায়ের তলায় ছোট ছোট নুড়ি বিছানো পথ। তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, বৃদ্ধের তো হবেই। বৃদ্ধ বললেন, "পারছি না, আর পারছি না।"

"পারতেই হবে আপনাকে, মনে জোর আনুন।"

"তুমি কেন আমার জন্যে কষ্ট করছ?"

"আমি কিছুই করছি না। ঈশ্বর যা ইচ্ছা করছেন তাই হচ্ছে।"

"একটু দাঁড়াও। উঃ।"

দাঁড়াতে হল। খানিক বাদে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি পৃথিবীতে অনেক ভাল কাজ করেছ, না?"

"জানি না।"

"জানো না! তা হলে তোমার মুখ কালো হয়ে যায়নি কেন? এই পথে না এসে নরকের পথে গেলে না কেন? শেষমুহূর্তে এই মিথ্যে বলার জন্যে স্বর্গের দরজা তোমার জন্যে নাও খুলতে পারে।"

"আশ্চর্য! আমি তো সত্যি জানি না।"

"পৃথিবীতে তুমি কী করতে?"

"মনে করতে পারছি না। আমার কিছুই মনে নেই। কেউ ধরিয়ে দিলে, কোনও নাম বললে তখন মনে আসে।" সে বলল।

আবার হাঁটা শুরু হল। আর একটা বাঁকের কাছে আসামাত্র ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল। বৃদ্ধ উল্লসিত গলায় বললেন, "জলের আওয়াজ হচ্ছে। তার মানে আমরা সেই নদীর কাছে পৌঁছে গিয়েছি।" উত্তেজিত হয়ে তিনি একাই দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

সংহিতার যখন চা খাওয়া প্রায় শেষ তখন মিলা এল। মুখচোখ এখন বেশ ফোলা, ভঙ্গিতে আলস্যের ছাপ। সিক্তা তার চা দিয়ে গেল।

"ঘুম হল?" জিজ্ঞাসা করল সংহিতা।

"সারারাত কীভাবে ঘুমিয়েছি টের পাইনি। ভোরে সেই যে জাগলাম আর এল না। মাথা ধরে আছে।" মিলা বলল।

সংহিতা হাসল।

"হ্যাঁ। ঠিকই। আসলে আমি কোনও নেশাতেই আসক্ত নই অথচ পৃথিবীর প্রায় সব নেশার স্বাদ নিয়েছি। একা মদ খেতে আমার ভালই লাগে না। কাল যে কী হল? কলকাতায় আসার আগে বোধহয় বছর দেড়েক এক পেগও মদ খাইনি।"

"অনেকদিন ছবি আঁকোনি।"

"এখানে এলে তো আমি কাজ করি না। একদম বিশ্রাম।" চায়ে চুমুক দিল মিলা।

সংহিতা মেয়েটাকে ভাল করে দেখল। সংক্ষিপ্ততম পোশাক এখন ওর পরনে। বেশ কিছু বছরের আলাপ কিন্তু কখনও যেচে তার কাছে থাকতে আসেনি।

চা শেষ করে মিলা বলল, "বাঃ। আগের থেকে ভাল লাগছে। ওহো, শোনো, আমি যদি ওদের দেখতে যেতে চাই তা হলে তুমি কি আপত্তি করবে?"

"কাদের?"

"আমি টিকলির কথা বলছি।"

অবাক হল সংহিতা। মদ খেতে খেতে যা শুনেছিল তা ভুলে যায়নি? কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ও যেতে চাইছে কেন?

মিলা বলল, "ভেবেছিলাম কলকাতায় কয়েকদিন থেকে পণ্ডিচেরিতে যাব। ওখানে আমার পরিচিত এক স্প্যানিশ আঁকিয়ে মাস দুয়েক ধরে আছে। যতটা ভাল ছবি আঁকে তার চেয়ে অনেক ভাল প্রেম করতে পারে। আমি কলকাতায় আসব তা ও জেনেছিল। তখন বেশ কয়েকবার ফোন করে অনুরোধ করেছে ওর কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে। সমুদ্রের গায়ে একটা বাড়ি ভাড়া করে আছে। গেলে খুব মজা হবে।"

"পারো বটে।" সংহিতা প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

"হয়তো কালই চলে যেতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার আগে ওই টিকলিকে একবার দেখে যাই। হয়তো ওকে দেখার পর দারুণ কোনও আইডিয়া মাথায় এসে যাবে, কে বলতে পারে।" সংহিতার দিকে তাকাল মিলা, "কী? তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে, একটা মেয়ে অর্ধমৃত হয়ে পড়েছে আর তাকে নিয়ে আমি ছবির বিষয় কী করে চিন্তা করছি!"

"আমি কিছুই ভাবছি না মিলা।" সংহিতা বলল।

"তা হলে?" মিলা তাকাল।

"আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি।"

"ঠিকানা নিয়ে কী করব? ওখানে আমি কে? কেন আমাকে ওরা অ্যালাউ করবে?"

"কী বলতে চাও?" সন্দেহের চোখে তাকাল সংহিতা।

"তুমি ওখানে গেলে আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি।" মিলা বলল।

আপত্তি জানাতে গিয়েও থেমে গেল সংহিতা। সমবেদনা জানানো মানুষের অন্যতম কর্তব্য। তার মনে পড়ে গেল আকাশবাণীর কথা। সব বানানো, সব অলীক। কিন্তু তার মধ্যেও মনে হচ্ছিল একটা সত্যি লুকিয়ে চুরিয়ে আছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি বলো তো, কেন যেতে চাইছ?"

"জানি না। বিশ্বাস করো। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার পর কেবলই মনে হচ্ছে পণ্ডিচেরিতে না গিয়ে টিকলির কাছে যাওয়া উচিত।" মিলা কাপ সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর তার শোওয়ার ঘরে চলে গেল। তার যাওয়া দেখল সংহিতা। এই মেয়েটার সঙ্গে গত রাত অবধি দেখা মেয়েটার কোনও মিল নেই। সত্যি কি নেই?

ড্রাইভার এলে গাড়ি বের করতে বলল সংহিতা। একটা অফ হোয়াইট

শাড়ি আর একই রঙের জামা পরে বাইরের ঘরে এসে সে দেখল মিলা জিন্‌স আর শার্ট পরে বসে সিগারেট খাচ্ছে। সে বলল, "সিগারেটটা ওখানে গিয়ে খেয়ো না।"

"আমি এখনও বাচ্চা মেয়ে নই। চলো।"

সিক্তাকে যা ইচ্ছে তাই রান্না করতে বলে সংহিতা মিলাকে নিয়ে লিফটে উঠল। নীচে নেমে গাড়িতে উঠতে গিয়ে ফোন পেল সে। নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, "ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি কি বাড়িতে আছেন?"

"না। আমি একটা দরকারে বেরিয়েছি। কী ব্যাপার বলুন তো?" সংহিতা অবাক হল।

"ঝাড়গ্রামের ওই কেসটার ব্যাপারে আপনার মেড সার্ভেন্টকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার।"

"আপনি বিকেলে আসুন। আমি থাকব।"

"ও কে ম্যাডাম।" অফিসার লাইন কেটে দিলেন।

মিলার দিকে তাকাল সংহিতা। চুপচাপ জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছে। সে বিষয়টা নিয়ে মিলার সঙ্গে কথা বলার দরকার মনে করল না।

আজ দরজা খুলল জয়ব্রত। খুলে বেশ অবাক হল।

সংহিতা বলল, "আমরা ভেতরে ঢুকলে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না!"

"না না। এসো, আসুন।" সরে দাঁড়াল জয়ব্রত।

"এর নাম মিলা। ছবি এঁকে খুব খ্যাতি পেয়েছে। বছরের বেশির ভাগ সময় বিদেশে থাকে। সেখানেই ওর এগজিবিশন হয়। আর ইনি, টিকলির বাবা।" সংহিতা বলল।

মিলা নমস্কার জানালে হাতজোড় করল জয়ব্রত। তারপর ওদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার শরীর কেমন আছে।"

জয়ব্রত সংহিতার দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিল, "ভাল, ভালই।"

সংহিতা বলল, "গতকাল তোমার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কিন্তু ভাল বলেননি।"

মাথা নাড়ল জয়ব্রত, "আমি ভাল থাকার চেষ্টা করি। প্রতিটি সকালে ঘুম

ভেঙে যাওয়ার পর ভাবি, আর একটা দিন পাওয়া গেল। দিনটা ভালভাবে কাটাতে হবে।”

মিলা জিজ্ঞাসা করল, “আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?”

“কেন?” জয়ব্রত সোজা হয়ে তাকাল।

“শুনলাম, ওর কোনও ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না।”

“হচ্ছে না কারণ সম্ভব হচ্ছে না।”

“এখন ও যে-অবস্থায় আছে তাতে চিকিৎসা করালে কাজ হবে?”

“জানি না। দিন দিন ওর অবস্থাও খারাপ হচ্ছে। আগে মোটামুটি ভালই কথা বলত। এখন ন্যাজাল ভয়েসে কথা বলছে। আমার ডাক্তারকে বলেছিলাম, তিনি সব শুনে একটুও উৎসাহ দেখাননি।”

মিলা অবাক হল, “মানে? একজন ডাক্তার উৎসাহ দেখাননি? তাঁর কর্তব্য পেশেন্টকে চিকিৎসা করা!”

জয়ব্রত বলল, “উনি বলেছিলেন হোমিওপ্যাথি ওষুধে টিকলির চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তাই পেশেন্টকে দেখে কোনও লাভ হবে না।”

“হোমিওপ্যাথি!” ঠোঁট থেকে অদ্ভুত স্বরে বেরিয়ে এল শব্দটি।

“কিছু মনে করবেন না, ওই চিকিৎসায় অনেককেই সুস্থ হয়ে যেতে দেখেছি, এই আমিও তো এতদিন ভাল আছি। চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।”

“গোড়া থেকেই হোমিওপ্যাথি করাচ্ছেন?”

“না, প্রথমে অ্যালাপ্যাথি করিয়েছিলাম। কেমোও হয়েছিল। কিন্তু তারপর—।” কথা শেষ করল না জয়ব্রত।

মিলা সংহিতার দিকে তাকাল। চুপচাপ বসে সংহিতা জয়ব্রতকে দেখছে। মিলা বলল, “চলো, টিকলির কাছে যাই।”

সংহিতা বলল, “কাল আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল।”

মিলা জয়ব্রতকে বলল, “আপনি মেয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবেন।”

একটু ইতস্তত করল জয়ব্রত। সেটা দেখে মিলা বলল, “শুনলাম আপনি নাকি বলেছেন ওকে মেরে ফেলতে পারলে আপনি হালকা হতেন। নিজের মেয়ে বলে পারছেন না। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই ততটা কঠিন হবে না!”

উঠে দাঁড়াল জয়ব্রত, "চলুন।"

দোতলায় উঠতেই সেই প্রৌঢ়াকে দেখা গেল। টিকলির ঘর থেকে বেডপ্যান নিয়ে বেরিয়ে আসছে। জয়ব্রত তাকে জিজ্ঞাসা করল, "হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।" প্রৌঢ়া পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেল।

জয়ব্রত প্রথমে ঘরে ঢুকল। খুব আন্তরিক গলায় বলল, "মাগো, তুমি কি গান শুনবে?"

সংহিতা আর মিলা ঘরে ঢুকে দেখল টিকলির এক দিকে মাথা হেলানো। জয়ব্রত ওপাশে রাখা টেপরেকর্ডারে ক্যাসেট ভরে সুইচ অন করল। কয়েক সেকেন্ড বাদে গান বাজল, "এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।" সংহিতা লক্ষ করল টিকলির পোড়া মুখের চামড়া গান শোনামাত্র একটু নরম হয়ে গেল। গান শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রটা বন্ধ করে জয়ব্রত বলল, "তুমি যখন ছোট্ট ছিলে তখন একজন এই বাড়িতে খুব আসত। তোমাকে আদর করত। তোমার কি কারও কথা মনে পড়ে?"

মুখ তুলতে চেষ্টা করল টিকলি। কিন্তু আটকে যাওয়া চামড়ায় বোধহয় চাপ লাগতেই নামিয়ে নিল। মাথা নাড়ল সে, না।

"একটু ভাবো। ওর নাম ছিল সংহিতামাসি।"

এবার একটা নাকি স্বরে কথা শোনা গেল, "হলুদ শাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

মিলা সংহিতার দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল সংহিতা, হ্যাঁ।

"আজ তিনি আর তাঁর বন্ধু এই বাড়িতে এসেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান, তুমি কি কথা বলবে?" জয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর দিল না টিকলি। পাথরের মতো বসে রইল। জয়ব্রত ওদের দিকে তাকাল, "মনে হচ্ছে টিকলি কথা বলতে চাইছে না।"

মিলা এগিয়ে গিয়ে টিকলির পাশে বসল, "টিকলি, তুমি কথা বলবে না?"

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে টিকলি বলল, "এতদিন কোথায় ছিলে?" গলার স্বর বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও অভিমানের ছোঁয়া পাওয়া গেল।

মিলা সংহিতার দিকে তাকাল। সংহিতা মাথা নেড়ে মিলাকে কথা বলতে ইঙ্গিত করল।

"টিকলি খুব অন্যায় করেছি। কী করব বলো। কাজের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিল যে।"

"এতদিন!"

"হ্যাঁ। আর শোনো, আমার সঙ্গে একজন বান্ধবী এসেছে। কথা বলবে?"

"তোমরা কেন এসেছ? আমি বুঝতে পারি আমাকে মানুষের মতো দেখায় না।"

সংহিতা এগিয়ে গেল কাছে। হাঁটু মুড়ে বসে বলল, "কে বলল তোমাকে? ভালভাবে চিকিৎসা করালে তুমি আবার আগের মতো হয়ে যাবে।"

"বাবা বলে না, কিন্তু কাজের মাসি বলে, চিকিৎসা করতে যে টাকা লাগবে তা বাবার নেই। আমি যদি মরে যেতাম, বাবা যদি তখন আমাকে না বাঁচাত তা হলে খুব ভাল হত। চশমার নীচ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে এল গালে।

মিলা নিজের রুমালে ওর গাল মুছিয়ে দিল, "না, কাঁদবে না। আমরা তো এসেছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি গান শুনতে খুব ভালবাসো?"

কথা না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল টিকলি।

"কী গান?"

"রবীন্দ্রনাথের গান।"

আরও পাঁচ মিনিট পরে দু'বেলা এসে দেখা করবে কথা দিয়ে মিলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সঙ্গে সংহিতা এবং জয়ব্রত।

নীচে নেমে জয়ব্রত বলল, "কিছু মনে করবেন না, আপনি বলে এলেন যে, দু'বেলা এসে ওর সঙ্গে দেখা করবেন। এর ফলে ও আপনাকে আশা করবে। আশাভঙ্গ হলে ও মানসিক আঘাত পাবে। কথাটা না বললেই পারতেন।"

মিলা বলল, "আপনি কী করে ভাবলেন আমি ওকে মানসিক আঘাত দেব? কথাটা আমি আন্তরিকভাবেই বলেছি।"

"মানে? আপনি রোজ দুবেলা আসবেন?"

"চেষ্টা করব।"

"কিন্তু ও আপনাকে সংহিতা বলেই জেনেছে।"

"নামে কী এসে যায়? আমি না হয় ওর কাছে সংহিতাই থাকলাম।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" জয়ব্রত বিড়বিড় করল।

"আপনি তো এতদিন ধরে ওর পাশে আছেন, এবার আমাদের বুঝতে দিন।"

দুপুরের খাওয়ার পর সংহিতা বলল, "সত্যি, তুমি আমাকে আজ অবাক করে দিয়েছ।"

"কিছুই করিনি।" মিলা মাথা নাড়ল।

"কিন্তু তুমি কী করতে চাইছ?"

"আমি এখনও জানি না।"

"তা হলে তুমি আগামীকাল পণ্ডিচেরিতে যাচ্ছ না?"

"নাঃ। কিছুদিনের মধ্যে তো যাওয়া যাবে না। তুমি দেখেছ, যতই কাপড়ের আড়াল থাকুক ওর শরীর একটা মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়। যাঁরা মূর্তি তৈরি করেন তাঁদের কাজ করতে দেখেছি। যেভাবে কেটে কেটে তারা একটা অবয়ব তৈরি করে বোধহয় সেইভাবে টিকলির শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।" মিলা বলল।

সংহিতা শুনল। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করল, "টিকলির ব্যাপারে তুমি এত ইন্টারেস্ট নিচ্ছ কেন? তোমার তো নিশ্চয়ই এসব করার কোনও কথাই ছিল না।"

"কখনও কখনও বোধহয় এমন হয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি তো মেয়েটাকে অল্পবয়সে দেখেছিলে। তুমি কিছু অনুভব করছ না?" মিলা তাকাল।

"অবশ্যই। মেয়েটাকে দেখে খুব খারাপ লেগেছে। শরীর তো বটেই। ওর চোখও তো পুড়ে গেছে। সেখানে কোনওদিন আলো ফুটবে কিনা সন্দেহ। আমাকে ওর মনে নেই। কিন্তু হলুদ শাড়ির কথা মনে রেখেছে। যে-কোনও মেয়েকে সংহিতা হিসেবে মেনে নিতে ওর আপত্তি নেই, দেখলে তো! আমি শুধু ভাবছি, জয়ব্রত আজ নয় কাল চলে যাবে। তখন টিকলির কী হবে। অনাথ আশ্রম রয়েছে। কিন্তু ওর মতো শরীরের অনাথদের জন্যে এদেশে কোনও আশ্রম আছে কিনা আমি জানি না।" সংহিতা মাথা নাড়ল, "ওর জন্যে জয়ব্রতর বেঁচে থাকা খুব জরুরি।"

মিলা বলল, "কলকাতায় তো ক'দিনের জন্যে আসি। এখানকার ডাক্তার মহলের সঙ্গে কি তোমার জানাশোনা আছে?"

"আছে। তাঁরা কেউ জেনারেল ফিজিশিয়ান, কেউ হার্ট বা হাড়ের ডাক্তার, কেউ গাইনি। ওহো, গতকাল আমার সঙ্গে ডক্টর মালহোত্রার আলাপ হয়েছিল। উনি ঠিকঠাক বলতে পারেন।"

"একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট করো না?"

"তুমি যাবে?"

"আমরা দু"জনেই যাব। একটা চেষ্টা করা যাক। তোমার সঙ্গে ভদ্রলোক যাই করে থাকুক না কেন তারপর প্রায় তিন যুগ চলে গিয়েছে। তুমি নিজেই বলেছ সেসবের কোনও অনুভূতি বেঁচে নেই। তা হলে ওই মেয়েটির কথা ভেবে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলি, হয়তো ক্লিক করলেও করতে পারে।"

মিলার অনুরোধে মিসেস কপুরকে ফোন করে ডক্টর মালহোত্রার মোবাইল নম্বর নিয়ে সংহিতা একটু ভাবল। তারপর নিজেই ফোন করল। ডক্টর মালহোত্রার সহকারী জানালেন যে, তিনি এখন অপারেশন থিয়েটারে আছেন। সংহিতা নিজের নাম এবং ফোন নম্বর ভদ্রলোককে দিয়ে বললেন, "ডক্টর যখন ফ্রি হবেন তখন যেন একবার ফোন করেন।"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "হু ইজ হি?"

"আমার সঙ্গে গতকাল পরিচয় হয়েছে। শুনলাম ডাক্তার হিসেবে ওঁর খুব খ্যাতি আছে। টিকলির ব্যাপারটা বোধহয় ওঁর বিষয়েই পড়বে।"

মিলা চলে গেল নিজের ঘরে।

সংহিতা উঠল না। তার মনে হচ্ছিল মিলার এই উদ্যোগের কারণ বোধগম্য হচ্ছে না। এবং সেই উদ্যোগ নিতে সে সংহিতা সাজতেও দ্বিধা করছে না। কিন্তু সংহিতা কেন মিলার মতো উৎসাহিত হচ্ছে না? সে টিকলিকে শৈশবে দেখেছিল। এখন টিকলি জানছে তার ছোটবেলার সংহিতামাসি অনেক বছর পরে ফিরে এসেছে। এই মিথ্যেটার বদলে সত্যিটাও হতে পারত। সে কি অতীতের অপমান ভুলতে পারছে না? আচ্ছা, অতীতে যদি জয়ব্রত তাকে অপমান না করত, তার বিশ্বাসকে মর্যাদা দিত তা হলে সংহিতা কি ওই বাড়ির বউ হয়ে এতদিন থাকতে পারত? তখন সংসার এবং মেয়ের দায়িত্ব তাকে নিতে হত। সেসব সামলে ছবি আঁকার উৎসাহ কি পেত? তা না পেলে আজকে ভারতজুড়ে তার যে-নাম তা সম্ভব হত না। বাবা সেই ভেঙে পড়ার দিনগুলোতে পাশে থেকে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ওই কাজে ডুবে গিয়েছিল বলেই সে ধীরে ধীরে সব ভুলতে পেরেছিল বলে এতদিন মনে করেছে। কিন্তু সত্যি কি ভুলতে পেরেছে? কার লেখা কবিতা এখন মনে পড়ছে না, লাইনটা ছিল, "ক্ষমা করতে শেখো"।

আশ্চর্য! ক্ষমা না করলে এতগুলো বছর সে চুপচাপ থেকে গেল কেন?

টেলিফোন বাজল। ওটা অন করামাত্র ইংরেজিতে প্রশ্ন এল, "কে আমাকে

ফোন করেছিলেন? আমার অ্যাসিস্টেন্ট নামটা ঠিক উচ্চারণ করতে পারছে না। আমি ডক্টর মালহোত্রা!"

সংহিতা হাসল, "আমি সংহিতা।"

"ওহো! আপনি! বলুন, কী ব্যাপার?" ডক্টর মালহোত্রা সহজ গলায় বললেন।

"আমার খুব পরিচিত একটি মেয়ে যাকে আমি চার-পাঁচ বছর বয়সে দেখেছিলাম, তার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইছি। বিয়ের কিছু পরে, ধরুন, বছর আটেক আগে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকরা অত্যাচার এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, শেষপর্যন্ত তারা ওর মাথা-শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। মেয়েটা শেষপর্যন্ত বেঁচে গিয়েছে কিন্তু তার সর্বাঙ্গ পুড়ে, গলে একটা চর্বি-মাংসের স্তূপ হয়ে গিয়েছে। হাত-পা শরীরের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে, চোখ অন্ধ এবং মাথার চুল পুড়ে আর বোধহয় তৈরি হয়নি। ওর বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলে আর চিকিৎসা করাতে পারেননি। এতদিন পরে এরকম পেশেন্টকে কি আপনার চিকিৎসাশাস্ত্র সাহায্য করতে পারে?"

সংহিতা কথা শেষ হতেই ডক্টর মালহোত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, "অপরাধীরা এখন কোথায়?"

"জেলে। বিচারক তাদের শাস্তি দিয়েছেন।"

"দেখুন, মেয়েটিকে না দেখলে আমি কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না। ঠিক সময়ে ব্যাপারটা যত সহজ ছিল তা এতদিন পরে না থাকাই স্বাভাবিক। ওয়েল, আপনি আগামীকাল সকালে লাউডন স্ট্রিটের দ্য থার্ড আই নার্সিংহোমে ওকে ভরতি করে দিন। আমি ওদের বলে দিচ্ছি। আপনি যখন রেফার করছেন তখন যে করেই হোক আগামীকালই ওকে দেখতে যাব। ঠিক আছে। কাল সন্ধেবেলায় ফোন করবেন। বাই।" ডক্টর ফোন ছেড়ে দিলেন।

সংহিতা ফোন রেখে মিলার ঘরে গেল। দরজায় দাঁড়াতেই সে চমকে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। ওর পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। দ্রুত ওর পাশে চলে এসে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আরে! কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেল। ডান হাতে চোখ মুছল মিলা। তারপর মুখ না তুলে বলল, "কী জানি! হঠাৎ কাঁদতে ইচ্ছে করল।"

"এ কী! কোনও কারণ ছাড়াই কাঁদতে ইচ্ছে করল বলে তুমি কাঁদছ?"

"অনেকদিন কাঁদিনি। শেষ কবে কেঁদেছিলাম তা মনেও নেই।"

"আমি কখনও শুনিনি কেউ অনেকদিন কাঁদা হয়নি বলে একটু কেঁদে নিচ্ছে!"

এবার উঠে বসল মিলা। জলের দাগ গাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "এই ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হল যদি আমার অবস্থা টিকলির মতো হত তা হলে কী করতাম? শরীর বলতে যা থাকবে তা কাপড়ের আড়ালে রেখে অন্ধ হয়ে মাথায় রুমাল বেঁধে বছরের পর বছর বসে থাকতে হত? জানি না শোওয়া সম্ভব হত কিনা! একটা গাছ হেঁটে চলে বেড়ায় না কিন্তু তার ডালপালা বড় হয়, পাতা বাতাসে নাচে, ফুল এবং ফল হয়। নিজের প্রাণটাকে সে তার মতো উপভোগ করে। ওসবের কিছুই তো করা সম্ভব হত না। সঙ্গে সঙ্গে বুকে কাঁপুনি এল। তখন কাঁদলাম। বিশ্বাস করো, আজ এই কান্নাটা কাঁদতে খুব ভাল লেগেছে। এখন নিজেকে বেশ হালকা বলে মনে হচ্ছে।"

"পাগল!" হেসে মাথা নাড়ল সংহিতা, "তুমি যার কথা ভেবে এত কল্পনা করলে সে হয়তো এসব কিছুই ভাবছে না। যাক গে, ডক্টর মালহোত্রা ফোন করেছিলেন। উনি টিকলিকে আগামীকাল সকালে লাউডন স্ট্রিটের দ্য থার্ড আই নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে বলেছেন। কালকেই ভরতি করিয়ে দিতে হবে।"

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল মিলা, "দারুণ খবর। নার্সিংহোমটা কোথায় তুমি জানো?"

"না। তবে ওই রাস্তায় গেলে যে-কেউ নিশ্চয়ই বলে দেবে।"

"কাল অ্যাডমিট করালে ডক্টর দেখবেন কবে? কিছু বলেছেন?"

"কালই। সন্ধ্যায় ফোন করতে বলেছেন।"

"তা হলে তুমি এখনই জয়ব্রতবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দাও। ওঁরা যেন সকালেই টিকলিকে তৈরি করে রাখেন।"

"তুমিই বলো।"

"ওঃ। তুমি এখনও—! নম্বরটা বলো।"

সংহিতার বলা নম্বরে ফোন করল মিলা, "হ্যালো! আমি মিলা বলছি। চিনতে পারছেন। বাঃ। শুনুন, টিকলির ব্যাপারে আমরা একজন বিখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আগামীকাল সকালে ওকে নার্সিংহোমে ভরতি করতে বলেছেন। প্রথমে নিশ্চয়ই ওকে পরীক্ষা করে দেখবেন।

লাউডন স্ট্রিটের দ্য থার্ড আই নার্সিংহোম। আপনার আপত্তি নেই তো?" সরাসরি জানতে চাইল সে। তারপর স্পিকার ফোন অন করে দিল।

"উনি বাড়িতে এসে দেখতে পারবেন না?" জয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল।

"ওঁর মতো ব্যস্ত ডাক্তার সেই সময়টা পাবেন না।"

"কিন্তু...।" থেমে গেল জয়ব্রত।

"বলুন?"

"প্রথমত, ওকে মুভ করানো মুশকিল। দোতলা থেকে নামিয়ে গাড়িতে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া গাড়ির সিটে বসে থাকতেও পারবে না।"

"এটা কোনও সমস্যা হল জয়ব্রতবাবু? নার্সিংহোমের অ্যাম্বুলেন্স যাবে, লোকজন স্ট্রেচারে শুইয়ে নীচে নামাবে। অ্যাম্বুলেন্সের বেডে শুয়েই নার্সিংহোমে যাবে।"

"ও! কিন্তু সমস্যা হল আমার পক্ষে বাজেট না জানলে হ্যাঁ বলা সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"সংহিতাকে আমি আমার আর্থিক অবস্থার কথা বলেছি।"

"শুধু পরীক্ষা করার জন্যে সামান্য টাকা লাগবে। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনার কাজের লোকটিকে বলবেন ওকে সকাল সকাল তৈরি রাখতে।"

"কিন্তু—!"

"আচ্ছা জয়ব্রতবাবু, আপনি কি চান না মেয়েটা সুস্থ হয়ে উঠুক?"

"নিশ্চয়ই চাই।"

"তা হলে আর কথা বাড়াবেন না। নমস্কার।" ফোন অফ করে মিলা বলল, "অদ্ভুত! দারিদ্র্যের অহংকার থেকে কেউ কেউ এখনও মুক্ত হল না।"

"অহংকার কেন বলছ? অক্ষমও চায় না অসম্মানিত হতে।" সংহিতা বলল।

"আমরা ওঁকে অসম্মানিত করছি?"

"যে যেভাবে নেবে—! যাক গে। নার্সিংহোমে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স বুক করে দেওয়া উচিত।"

সংহিতা উঠে বসার ঘরে গিয়ে টেলিফোন নম্বরের বই বের করে

নার্সিংহোমের লিস্ট দেখতেই দ্য থার্ড আই পেয়ে গেল। সে রিশেপসনে ফোন করে ডক্টর মালহোত্রার নাম বলতেই ভদ্রমহিলা খুব গুরুত্ব দিয়ে জয়ব্রতর বাড়ির ঠিকানা নোট করে নিয়ে বললেন, "কাল সকাল আটটায় অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যাবে ম্যাডাম। ডক্টর মালহোত্রা খবর দিয়েছেন পেশেন্টকে ভরতি করে নিতে।"

সংহিতা ফোন রেখে দিয়ে বলল, "মিলা, জয়ব্রত একটা কথা ঠিকই বলেছে। টিকলিকে ঠিকঠাক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে কত খরচ হবে তা জানা দরকার ছিল।"

"হ্যাঁ। জানা থাকলে সুবিধে হবে। কাল নার্সিংহোমে গিয়ে খোঁজ নিলে জানা যাবে।" বলেই মিলা সংশোধন করল, "ওরাই বা কী করে বলবে! ডক্টর খানিকটা আন্দাজ দিতে পারবেন।"

বিকেল পাঁচটা নাগাদ পুলিশ অফিসার এলেন। মিলা তার কিছুক্ষণ আগে ড্রাইভারকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে কাছাকাছি একটা মল-এ। টুকটাক কেনাকাটি করতে।

মুখোমুখি বসে অফিসার বললেন, "আপনার মেডকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"আবার?" বিরক্ত হল সংহিতা।

"এরকম কেসে সঠিক তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এই অপ্রিয় কাজটা করতে হয়। ওকে একবার এখানে আসতে বলুন।"

সংহিতা গলা তুলে ডাকতেই সিক্তা এসে দাঁড়াল দরজার এপাশে।

অফিসার একটা নোটবই বের করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হরিহর মাহাতো তোমার কে হয়?"

সিক্তা অবাক হল প্রথমে। বলল, "তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল।"

"তার মানে, সে তোমার স্বামী!"

"হুঁ!"

"যে-লোকটার সঙ্গে তুমি ঝাড়গ্রামে ছিলে সে তোমার কে হয়?"

"কেউ না।"

"তা হলে তার সঙ্গে একই ঘরে অতদিন থাকলে কেন?"

সংহিতা হাত তুলল, "অফিসার, এই প্রশ্নটা আপনি করতে পারেন না।

দু'জন অ্যাডাল্ট মানুষ একসঙ্গে কেন থাকল তা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"না ম্যাডাম। একজন বিবাহিতা মহিলা যদি অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বাস করে তা হলে তাকে ব্যভিচারিণী বলা হয়।"

"যদি কোনও বিবাহিত পুরুষ অনাত্মীয়া কোনও মহিলার সঙ্গে বাস করেন, তাঁর সন্তানের পিতা হন তা হলে তাকে কী বলা হয় অফিসার?"

"প্রচণ্ড অপরাধ। তাকে জেলে যেতেই হবে।"

"তাই? আমাদের দেশে এরকম বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা কম নয়। বিশেষ করে ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে তাঁরা দিব্যি আছেন। কই, তাঁরা তো জেলে যাননি?" সংহিতা বলল, "আপনি অন্য প্রশ্ন যদি থাকে তা হলে করুন।"

সিক্তার দিকে তাকালেন অফিসার, "তুমি এর আগে আমাদের বলেছ যে, তোমার ভাশুররা অত্যন্ত অত্যাচার করত। তারা তোমাকে প্রলোভন দেখাত। তুমি তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবে?"

সিক্তা বলল, "আমার জায়েরা সব জানত।"

"তারা অস্বীকার করেছে। তোমার স্বামীও বলেছে এ ব্যাপারে কিছু জানে না।"

"আমি কী বলব! ওর বুদ্ধি তো খুব কম।"

"কম?" হাসলেন অফিসার, "মাওবাদীদের এজেন্ট হিসেবে যে কাজ করতে পারে তার বুদ্ধি নেই বলে কী করে বিশ্বাস করব? আর তুমি সেটা জানতে!"

"অসম্ভব। সে কখনওই ওই কাজ করতে পারে না। ক্ষমতাই নেই।"

"তাই? তা হলে ওর ঘরে মাওবাদীদের পোস্টার কী করে পাওয়া গেল?" অফিসার হাসলেন, "এক সময় হয়তো হাবাগোবা ছিল কিন্তু পরে বদলে গেলেও আগের স্বভাবটাই লোকজনদের দেখাত হরিহর। গোপনে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। তুমি তো বিয়ের পর তার সঙ্গে একঘরে থাকতে। এই পরিবর্তন, মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা তুমি নিশ্চয়ই জানতে।"

"না। আমি কিছুই জানি না। এখনও বিশ্বাস করি না।"

"তুমি মিথ্যে বলছ!"

"ঠিক আছে, প্রমাণ করুন আমি মিথ্যে বলছি।" হঠাৎ খেপে গেল সিক্তা।

"তোমার ভাশুররাই কথাটা বলেছে। ওই ড্রাইভার লোকটার সঙ্গে ভাব হওয়ার পর হরিহর যাতে কোনও বাধা না দেয়, কোনও হল্লা না করে তাই দু'জনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। তারপর আন্দোলনের কাজে যাচ্ছ বলে ড্রাইভারের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলে। হরিহর সেটা বিশ্বাস করেছিল কারণ তখন সে মাওবাদীদের গুপ্তচর হিসেবে উত্তেজিত থাকত।" পুলিশ অফিসার আবার নোটবই-এ চোখ রাখলেন।

"আমি কারও সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিইনি।" সিক্তা বলল।

"তা হলে তোমার ভাশুররা মিথ্যে বলেছে?"

সিক্তা মাথা নাড়ল, "ওরা কী বলেছে আমি জানব কেমন করে?"

"ওরা মিথ্যে বলেনি। ওদের দেওয়া ইনফর্মেশন পেয়ে আমরা হরিহরের ঘরে যাই। তার তক্তাপোশের তলায় মাওবাদীদের হাতে লেখা পোস্টারের বান্ডিল রাখা ছিল। ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসার সময় কোনও কান্নাকাটি করেনি, প্রতিবাদও নয়।"

"ভালই করেছেন। এই কারণে কি ওকে সারাজীবন জেলে আটকে রাখবেন?"

"মানে?" অফিসার বিরক্ত হলেন।

"সারাজীবন যদি ও না ফিরতে পারে তা হলে ওর ভাগের জমি দাদারা নিজেদের করে নেবে। মাওবাদীদের গুপ্তচর বলে কাউকে ধরিয়ে দিলে তো তাদেরই লাভ।"

"বেশ তো, তাকে কোর্টে তোলা হয়েছে। ধরা পড়ার পর থেকে সে একটা কথাও বলেনি। চারদিন পরে বিচারক আবার শুনবেন। তখন তুমি এসব কথা তাঁকে বোলো। কিন্তু তোমার ভাশুররা যদি একটাও প্রমাণ আমাদের দিতে পারে তা হলে তোমাকে জেলের ভাত খেতে হবে।" অফিসার নোটবই বন্ধ করলেন।

সংহিতা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "আপনারা এটা কী করছেন বলুন তো! যারা মানুষ খুন করছে বিনা কারণে, যারা দেশদ্রোহিতা করছে তাদের মোকাবিলা করতে পারছেন না, কিন্তু নিরপরাধ কিছু মানুষকে জেরা করার নামে নাজেহাল করে ভাবছেন প্রচুর কাজ হচ্ছে! দিস ইজ ব্যাড।"

"ম্যাডাম, আপনি জানেন না, জঙ্গলমহলে যাদের নিরপরাধ বলে আপাত

চোখে মনে হয় তারাই মাওবাদীদের শক্তি জোগাচ্ছে।”

“আপনি হরিহরকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন?”

“কেন?”

“ও যে হাবাগোবা নয় তা একজন ডাক্তারই বলতে পারেন।”

“না, তা করা হয়নি।”

“চমৎকার। আপনার কী মনে হয়, কোনও হাবাগোবা লোক গুপ্তচরের কাজ ঠিকঠাক করতে পারে?”

“তা সম্ভব নয়।”

“তা হলে ওর তক্তাপোশের তলায় মাওবাদীদের পোস্টার অন্য কেউ লুকিয়ে রেখে আপনাদের খবর দেওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক?” সংহিতা বলল, “হরিহরের দাদাদের থানায় ধরে এনে জেরা করলে আপনাদের কাছে নতুন তথ্য আসতে পারে।”

“নিশ্চয়ই করব।” মাথা নাড়লেন অফিসার, “কিন্তু একজন মাওবাদীর সঙ্গে দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করেও এই মেয়েটি কিছুই জানতে পারল না, এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।”

“আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। কিন্তু সব স্বামী কি বাইরে কী করছেন তা ফিরে এসে স্ত্রীকে জানান? আপনি যে-পুলিশ অফিসার হিসেবে যেসব তদন্ত করছেন তা স্ত্রীকে রোজ বলেন? আপনিই ভেবে দেখুন!”

“না। সরকারি চাকরিতে গোপনীয়তা রাখতেই হয়।”

“মাওবাদীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ।”

“ঠিক আছে। যদি হরিহরের বিরুদ্ধে কেস ওঠে তা হলে ওকে কোর্টে যেতে হবে।”

“অবশ্যই যাবে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।”

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, “আপনি একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তার ওপরে একজন বড়সাহেব আপনার কথা বলেছেন। আমি কথা দিচ্ছি প্রমাণ ছাড়া কোনও স্টেপ নেব না।”

অফিসার চলে গেলে দরজা বন্ধ করে সিক্তা কাঁদতে বসল। সংহিতা বিরক্ত হল, “কী হচ্ছে এটা?”

“আমাকে তুমি ছাড়িয়ে দাও।”

“তারপর?”

"আমার জন্যে পুলিশ তোমাকে বারে বারে বিরক্ত করছে। আমার কপালে সুখ সহ্য হবে না, কোথাও শান্তিতে থাকতে পারব না!"

"প্রেম করে যার সঙ্গে ঘর ছাড়লে তার সম্পর্কে খোঁজখবর করোনি কেন?"

"কেউ বলতে পারত না। সবাই বলত ও ভাল রোজগার করে। ভাল মানুষ। আর ঘর যদি না ছাড়তাম তা হলে এতদিনে আমার সর্বনাশ করে ওর দাদারা বদনাম দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। কতবার ওকে বলেছি এই কথা। শুনে বোকার মতো তাকিয়ে থেকেছে। বোঝেইনি।"

"এরকম ছেলের সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিল কেন?"

"অনেক জমি আছে, খাওয়াপরার অভাব নেই দেখে ঘাড় থেকে নামাতে চাইল।"

"আমি ছাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে?"

"ঝাড়গ্রামের মাসির কাছে ছাড়া যাওয়ার তো জায়গা নেই। মাসি রাজি না হলে আমি খারাপ হয়ে যাব।" কান্না মেশানো গলায় বলল সিক্তা।

"খারাপ হয়ে কী করবে?"

"মদ খাব, সিগারেট খাব, সব মেনে নেব।"

জোরে হেসে ফেলল সংহিতা। কান্না থামিয়ে বড় চোখে তাকে দেখল সিক্তা।

সংহিতা বলল, "তুমি তো দেখতে পাচ্ছ মিলাকে। ও মদ খাচ্ছে, সিগারেট টানছে। তা হলে ও কি খারাপ হয়ে গেছে?"

উত্তর দিল না সিক্তা। মাথা নিচু করল।

সংহিতা হাসল, "আসুক সে। তাকে বলতে হবে সে একটা খারাপ মেয়ে।"

"না।" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সিক্তা, "না, বোলো না। উনি খুব ভাল।"

"তা হলে এই যে বললে—!"

"আমি আগে কাউকে দেখিনি। মিলাদিদিকে বললে আমি মুখ দেখাতে পারব না।"

"ঠিক আছে। কাল থেকে অনেক ছুটোছুটি আছে, ঝামেলা বাড়িয়ো না। যাও।"

রাত্রে মিলার সঙ্গে কথা বলল সংহিতা। প্লাস্টিক সার্জারির ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। টিকলির শরীরকে তৈরি করতে নিশ্চয়ই অনেকবার অপারেশন টেবিলে নিয়ে যেতে হবে। প্রথম কথা, এইসব করার সময় যদি ওর প্রাণসংশয় হয় তা হলে জয়ব্রত তাদেরই দায়ী করবে। দ্বিতীয়ত, খরচের পরিমাণ না জেনে এগোনো উচিত হবে না। জয়ব্রত যে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারবে না তা জানিয়ে দিয়েছে।

মিলা সংহিতার সঙ্গে একমত হল। বলল, "তুমি ঠিকই বলছ। হয়তো ওকে দেখার পর আমার ভেতরের আবেগ সক্রিয় হয়েছে। কাল ডক্টর কী বলেন তা শোনা যাক। আমি কিন্তু অন্য কিছু ভাবছি। টিকলির এই চিকিৎসা নিশ্চয়ই বছরখানেক ধরে চলবে। এর মধ্যে যদি জয়ব্রতবাবুর কিছু হয়ে যায় তা হলে কী হবে? মোটামুটি চেহারা ফিরে পেলেও ওর চোখ নিয়ে সমস্যাটা থাকছে। সে দুটো কী অবস্থায় আছে, অপারেশন করে ঠিক করা যায় কিনা তা আমরা কিছুই জানি না। জয়ব্রতবাবু না থাকলে কোথায় ফিরে যাবে সে?"

"আমি জানি না। জয়ব্রত ওর জন্যে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করেছে কিনা!"

"যাক গে। এসব ভাবনা ভেবে তো কোনও লাভ নেই। কালকের দিনটা যেতে দাও। ডক্টরের কথা শোনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।" মিলা উঠে গিয়েছিল।

ভোর ভোর উঠতে হবে বলে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরেছিল ওরা। খাওয়ার আগে একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়েছিল সংহিতা। ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর পাঁচটা। একটানা ঘুমোনোয় শরীর বেশ ঝরঝরে। আর তখনই খেয়াল হল, আজ রাত্রে সে স্বপ্নটা দেখেনি। এরকম তো গত কয়েকদিন হয়নি। একটু একটু করে সে শেষ বিচারের দিন পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ বিচারের পরেও কয়েকটা স্তর আছে। তা হলে সেসব স্তরের স্বপ্ন সে দেখল না কেন? যদি গোটা স্বপ্নটা একটা সিডিতে রেকর্ডেড থাকত আর রোজ একটু একটু করে দেখা যেত তা হলে—! না, আমি স্বপ্ন দেখব বললেই স্বপ্ন দেখা যায় না। এই পৃথিবীর অনেক মানুষ হয়তো কোনও দিনই স্বপ্ন দেখেনি। যে-কোনও রকম স্বপ্ন! স্বপ্ন কী তাই তারা জানে না। কিন্তু তার স্বপ্নের শেষটা যদি আর কখনও না দেখতে পায়! খুঁতখুঁত করতে লাগল মন।

অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে টিকলি এল নার্সিংহোমে। সঙ্গে জয়ব্রত। সংহিতা লক্ষ করল, আজ জয়ব্রতকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে। টিকলিকে যখন নামানো হচ্ছে তখন মিলা এগিয়ে গেল ওর পাশে, "টিকলি, কষ্ট হয়নি তো আসতে?"

রুমালে ঢাকা মাথা, কালো চশমার আড়ালে চোখ, গলা থেকে পায়ের পাতা অবধি নাইটিতে ঢাকা, টিকলি শরীর না নাড়িয়ে বলল, "না। তুমি কে? হলুদ শাড়ি?"

"হ্যাঁ।" মিলা উত্তর দিল।

টিকলিকে ভরতি করে নিল নার্সিংহোম। ওর বিছানার পাশে বসল জয়ব্রত, "এবার তুই ঠিক হয়ে যাবি মা।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি। নইলে এঁরা এতদিন পরে তোর জন্যে কেন আসবেন?"

"এরা? হলুদ শাড়ির সঙ্গে আর কে?"

মিলা আর সংহিতা ওদের কথা শুনছিল। মিলা জবাব দিল, "আমার বন্ধু।"

"আচ্ছা, আমি কি আবার দেখতে পাব?" টিকলি জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা সবাই তাই আশা করছি।" মিলা জবাব দিল।

"তখন আমি চোখ খুললেই বাবা আর তোমাকে চিনতে পারব। তুমি কি এখনও হলুদ শাড়ি পরে এসেছ?" টিকলি জিজ্ঞাসা করল।

"না গো। আজ পরিনি। কিন্তু যেদিন তুমি প্রথম দেখবে, সেদিন অবশ্যই পরব।"

ভরতির ব্যাপারে যা কিছু সই-সাবুদ তা সংহিতাই করল। নার্সিংহোম আপাতত কুড়ি হাজার টাকা আগাম হিসেবে নিল। সংহিতাই তার ক্রেডিট কার্ড মারফত পেমেন্ট করল। মিলা তখন টিকলির কেবিনে ছিল। নীচে নেমে এসে জানতে পেরে বলল, "আমার মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস তুমি ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে রেখেছিলে। আমি তো একদম খালি হাতে চলে এসেছি।"

"বেশ করেছ। চলো, এখন আর এখানে থেকে কোনও লাভ হবে না। এঁদের কাজ এঁরাই করুন। বরং সন্ধেবেলায় আসা যাক। ডক্টর মালহোত্রা তখন জানাবেন বলেছেন।" সংহিতা কথাগুলো বলে চারপাশে তাকাল, "জয়ব্রত কোথায়?"

মিলা মুখ ঘুরিয়ে দেখল। জয়ব্রত রিসেপশনের কাছেপিঠে নেই। বলল, "একটু আগে তো কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন।"

"ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া উচিত।" সংহিতা এগিয়ে গেল খোঁজার জন্যে। মিনিট চারেক পরে ওরা বুঝতে পারল জয়ব্রত নার্সিংহোমের ভেতরে নেই। সংহিতা বলল, "দেখলে? সব গেছে কিন্তু জেদ এখনও যায়নি। ওই শরীর নিয়ে একাই ফিরে গেছে।"

মিলা বলল, "জেদ বোলো না। ভদ্রলোক বোধহয় এখন তাঁর অতীতের ব্যবহারের জন্যে খুব লজ্জিত বোধ করছেন। এ নিয়ে আর কথা না বলাই ভাল।"

ওরা নার্সিংহোমের বারান্দায় বেরিয়ে আসামাত্র ড্রাইভারকে দেখতে পেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে। সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার?"

"ম্যাডাম, ওই ভদ্রলোককে আমি গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছি।" ড্রাইভার বলল।

"কোন ভদ্রলোক?" সংহিতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"ওই যে, যাঁর মেয়েকে ভরতি করতে আপনারা এসেছেন।"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছ মানে? উনি চাননি?"

"না না। আমি দেখলাম উনি নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এই এইখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর কোনওরকমে এক পা-দু'পা ফেলে এগোতে গিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম ওঁর শরীর খারাপ হয়েছে। তাই গাড়ি এখানে এনে ওঁকে তুলে বসিয়ে দিলাম একপাশে। উনি সেই থেকে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। আমি কী করব তা বুঝতে পারছিলাম না।" ড্রাইভার জানাল।

ওরা দ্রুত গাড়ির কাছে চলে এল। পিছনের সিটে দরজার গায়ে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছে জয়ব্রত। সংহিতা সেদিকের জানলায় চলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "শরীর খুব খারাপ লাগছে?"

চোখ খুলল জয়ব্রত, "তেমন কিছু নয়। দিন কয়েক হল মাঝে মাঝে ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে। আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

"তোমার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

"জানি না।"

সংহিতার মনে পড়ল। সে তার মোবাইলের ব্যবহৃত নম্বরগুলো থেকে সেই হোমিওপ্যাথের নম্বর বের করে বোতাম টিপল। ভদ্রলোক ফোন ধরতে সে জয়ব্রতর শারীরিক অবস্থাটা জানাল। ডাক্তার বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হচ্ছে এখন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করালে ওঁর কষ্ট খানিকটা কমবে। এক কাজ করুন। ওঁকে একজন হেমাটোলজিস্টের কাছে নিয়ে যান। আমি নাম ফোন নম্বর সব বলছি, নিয়ে নিন।"

সেটা মোবাইলে লোড করে নিয়ে সংহিতা বলল, "ওর ডাক্তার তো হাত তুলে নিল। এই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বলল।"

কথাগুলো মিলাকে বলছিল সে, কিন্তু জয়ব্রত বলে উঠল, "কোথাও যেতে হবে না। আমাকে যদি তোমরা দয়া করে পৌঁছে দাও বাড়িতে—, প্লিজ।"

সংহিতা মিলার দিকে তাকাল। মিলা ইশারায় তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওঁকে এখনই হাসপাতালে ভরতি করা দরকার। মুশকিল হল, কোন হাসপাতালে ওঁর চিকিৎসা হতে পারে তাই জানি না।"

সংহিতা বলল, "ঠাকুরপুকুরের ক্যান্সার হসপিটালের সুখ্যাতি আছে। কিন্তু তারা তো ওর পুরনো রেকর্ড জানতে চাইবে। তা ছাড়া কোনও ডাক্তার রেফার না করলে ওরা ভরতি করবে কিনা তাও জানি না।"

"কিন্তু একটা চেষ্টা করা দরকার। টিকলির সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওঁর বেঁচে থাকা দরকার। এতদিন ওই কেমোর পর আর কোনও চিকিৎসা হয়নি, রোগ কী অবস্থায় আছে কে জানে। চলো, যাই ঠাকুরপুকুরে।"

মিলা সামনে বসল। সংহিতা জয়ব্রতর সঙ্গে পিছনে, দূরত্ব রেখে।

ভাগ্য সাহায্য করল। ঠাকুরপুকুরের একজন ডাক্তার সংহিতাকে দেখেই এগিয়ে এলেন, "আপনি? কী ব্যাপার?"

কোনও একটা অনুষ্ঠানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বলে মনে করতে পারল সংহিতা। সে ব্যাপারটা খুলে বলতেই ডাক্তার বললেন, "কোনও সমস্যা নেই, চলুন, ভরতি করিয়ে নিতে বলছি। তবে আজই ওর পাস্ট রেকর্ড দিয়ে যাবেন।"

মিলা বলল, "গোড়ার দিকে অ্যালোপ্যাথি করিয়েছিলেন, কেমোও হয়েছিল। কিন্তু তা বহু বছর আগে। তখনকার বিভিন্ন টেস্টের রিপোর্ট

যদি পাওয়া যায় তা হলে কি তা কাজে লাগবে? এতগুলো বছর তো হোমিওপ্যাথের কাছে চিকিৎসায় ছিলেন। এই সময় কোনও কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে কিনা তা জানি না।"

"সর্বনাশ। এরকম বোকামি কেউ করে! আসুন।"

ডাক্তারের নাম সৌমিত্র দত্ত। তিনি উদ্যোগ না নিলে ভরতি করা সম্ভব হত না। জয়ব্রত সমানে প্রতিবাদ করে যাচ্ছিল। সে হোমিওপ্যাথিতে ভাল আছে। তা ছাড়া বাড়িতে মাসি ছাড়া কেউ নেই। সেটাও তো সমস্যা।

কিন্তু দুই মহিলা ওর কথায় কর্ণপাত করল না। ডক্টর সৌমিত্র দত্ত বললেন, "আমরা আজই সব কিছু পরীক্ষা করছি। চোখের তলা, আঙুল দেখে মনে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন বেশ কমে গিয়েছে। আপনারা ওঁর অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা জমা দিয়ে যান। আমার কার্ডটা রাখুন। রাত ন'টার পর ফোন করবেন।"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার এক্সপেরিয়েন্স কী বলে?"

"কিছুই প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না। আমরা ভাল কিছু হোক এই আশা করছি।"

সংহিতাকে আবার ক্রেডিট কার্ডের সাহায্য নিতে হল। এবারও কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়ে দিল ও। গাড়িতে বসে মিলা বলল, "অনেক খরচ হল তোমার!"

হেসে উঠল সংহিতা, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই ডক্টর মালহোত্রার ফোন এল, "ম্যাডাম, আমি ঘণ্টাখানেক ফ্রি আছি। আপনি কি এর মধ্যে একবার নার্সিংহোমে আসতে পারবেন?"

মিলার দিকে তাকাল সংহিতা। তারপর বলল, "নিশ্চয়ই।"

"ধন্যবাদ।" ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

সংহিতা বলল, "ডক্টর মালহোত্রা এখনই কথা বলতে চাইছেন।"

"তাই? ঠিক আছে, তুমি রেস্ট নাও, আমি যাচ্ছি।" মিলা উঠে দাঁড়াল।

"ভদ্রলোক তোমাকে চেনেন না। আমাকে তো তোমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিতে হবে।"

সংহিতার কথা শেষ হতেই মিসেস কপুরের ফোন এল। প্রথমে তিনি জানালেন যে, ডক্টর মালহোত্রার চেক এসে গেছে। সংহিতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে

তিনি জমা দিয়ে দিতে পারেন। কাগজপত্র তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তারপর মিসেস কপুর জিজ্ঞাসা করলেন, "আর দেরি করা ঠিক হবে না। এখনই এগজিবিশন করলে ঠিক কতগুলো ছবি পাওয়া যাবে?"

"আমি এখন ছবিতে মন দিতে পারছি না মিসেস কপুর। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কয়েকদিন পরে কথা বলব।" সংহিতা দ্রুত ফোন রাখল।

নার্সিংহোমের চেম্বারে ইজিচেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ডক্টর মালহোত্রা। সংহিতারা ঘরে ঢুকলে বললেন, "আসুন, আসুন, আমি একটু এখানেই বসে কথা বললে নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে অভদ্র ভাববেন না।"

"না না। বিশ্রাম নিন আপনি। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।" সংহিতা বলল।

"গোটা দিনে এই সময়টুকুই নিজের জন্যে রাখি। তারপরেই তো ছুটতে হবে। মনে হল, এই সময়েই আপনার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারি। বসুন।"

কিছুটা দূরের চেয়ারে বসে সংহিতা মিলার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিল। মিলা যে কত ভাল শিল্পী, বিদেশে বেশ নাম করেছে ইত্যাদি বলায় ডক্টর মালহোত্রা বললেন, "খুব খুশি হলাম। একদিন সময় বের করে আপনার কাজ দেখতে হবে।"

মিলা বলল, "টিকলির ব্যাপারে আপনার ওপর নির্ভর করে আছি।"

"টিকলি? ও, মেয়েটি! আপনার কে হয় ও?"

"আমার কেউ হয় বলতে পারছি না। গতকালই সংহিতার সঙ্গে গিয়ে ওকে প্রথম দেখলাম।"

"আই সি!" ডক্টর মালহোত্রা বললেন, "দেখুন, অনেকটা সময় চলে গিয়েছে। পুড়ে যাওয়া শরীরের চর্বি, মাংস দুর্ঘটনার এক বছরের মধ্যে যে-অবস্থায় ছিল এখন তা নেই। আমি ডাক্তারি পরিভাষা ব্যবহার না করে বলছি অবহেলায় ফেলে রাখায় শরীরের ওইসব অনেক শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সব প্রথম আমাকে জানতে হবে আপনারা কী চাইছেন?"

মিলা বলল, "ওকে অপারেশনের মাধ্যমে স্বাভাবিক চেহারায় ফিরিয়ে আনা যায় না?"

"কাজটা এখন খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহী। ওকে অন্তত দেড় বছর চাই আমার।"

"এই দেড় বছরে কতগুলো অপারেশন হবে?"

"আই ডোন্ট নো। কাজে না নামলে বলতে পারব না। প্রথম ছয় মাসের পর ছবিটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার দক্ষিণা ছাড়াও প্রচুর খরচ হবে।"

"আন্দাজ পেতে পারি?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

"এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব। অন্তত দশ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা রাখা উচিত।"

"যা করার আপনি করুন। টাকার জন্যে আটকাবে না।" মিলা উঠে দাঁড়াল। সংহিতা অবাক হয়ে তাকাল মিলার দিকে। মিলা ক্রমশ অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

এখন চারধারে তপ্ত বাতাস, পায়ের তলার জমিও উত্তপ্ত। সে অবাক হয়ে দেখল সেই বৃদ্ধ তার পাশে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন নিচু গলায় বলল, "আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি, কিন্তু প্রতিদিন একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করতাম, একজন গরিব অসুস্থকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে দিতাম। এই কারণে আমি কি এখন ক্ষমা পেতে পারি না?"

আর একজন কথা বলল, "যদি কেউ পরিকল্পনা করে ভাল কাজের দ্বারা পাপ ঢাকতে চায়, তা হলে তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। তারপর ঈশ্বর বিচার করবেন সে পাপমুক্ত হয়েছে কিনা! আমি শুনেছি নরকের আগুন খুব ভয়ংকর। বহু হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত হওয়ায় সেই আগুনের রং কালো হয়ে গিয়েছে। সেই আগুনের তুলনায় পৃথিবীর আগুন অনেক শীতল, আরামদায়ক। সেই আগুনে প্রবেশ করতে হবে পাপীদের। সেই আগুনে রয়েছে অগ্নিসর্প। তাদের আকৃতি বিশাল। আছে ঘোড়ার মতো চেহারার বিছে। ওরা কামড়ালে বিষ ভয়ানক যন্ত্রণা ছড়িয়ে দেবে।"

এই সময় ঝড় উঠল। আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। আর্তনাদ প্রবল হওয়ায় শিউরে উঠল সে। আমি কী করেছিলাম? আমি কোনওদিন কাউকে আঘাত দিইনি। কখনওই গর্বিত বোধ করে কাউকে অবহেলা করিনি। জীবনে সুরাপান থেকে দূরে থেকেছি। যে-ব্যাপারে আমার কোনও জ্ঞান নেই সে-ব্যাপারে কাউকে কখনও উপদেশ দিইনি। আমি কখনওই আত্মহত্যার কথা ভাবিনি। আমি মানুষ দূরে থাক, কোনও জীবকেই হত্যা করিনি। আমার ওপর যে-অন্যায় অবিচার হয়েছিল, তা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু, হ্যাঁ,

আমি আহত এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে সেই অন্যায়কারীকে অভিশাপ দিয়েছিলাম। একমাত্র সেই কারণেই কি আমাকে নরকের প্রচণ্ড আগুনে প্রবেশ করে অগ্নিসর্পের কামড় খেতে হবে?

সে যখন এইসব ভাবছিল তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। সে অনুভব করল, বৃদ্ধ তার ডান হাত শক্ত করে ধরে রেখেছেন। ক্রমশ সে এবং তাকে ধরে রাখা বৃদ্ধ একটা চুম্বকের টানে যেখানে গিয়ে পৌঁছোল সেখানে ত্রয়োদশীর আলো ছড়ানো। সেই পাহাড়ি পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই জলের শব্দ আবার কানে এল। বাঁক নিতেই অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ সাঁকো ঝুলে আছে। সাঁকোর নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উন্মত্ত জলের ধারা। আকাশবাণী হল, "তোমরা নিশ্চয়ই এখন আগুনের তাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছ। তোমরা স্বচ্ছন্দে ওই নদীর জল পান করে তৃষ্ণা দূর করতে পারো।"

সে দেখল বৃদ্ধ তাকে ছেড়ে ওই শরীর নিয়ে দৌড়ে গেলেন নদীর কিনারে। আঁজল ভরে জল নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ঈশ্বর, তুমি মহান।"

সে ধীরে ধীরে জলের কাছে গেল। কীরকম সাদাটে জল! সে পান না করে জলে নামল। একটু একটু করে সে এগিয়ে যেতেই জল তার বুক স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর হালকা হয়ে গেল, মনে হল সমস্ত ক্লেদ শরীর থেকে দূর হয়ে গেল। সে নদীতে ডুব দিতেই স্নিগ্ধ হয়ে গেল মন। যেন হৃদয়ের পূর্বগগনে সূর্য উঠল। সে ফিরে এল পাড়ে। আর তখনই আকাশবাণী হল, "তোমাদের জন্যে এই মুহূর্তে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রবেশের আগে তোমাদের শেষ পরীক্ষা দিতে হবে। ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে তোমাদের। যে-মুহূর্তে সাঁকোতে পা রাখবে, সেই মুহূর্তে বহু নীচে বয়ে যাওয়া নদীর জল আগুনের চেয়ে উত্তপ্ত হয়ে যাবে। যদি পূর্বজীবনের কোনও পাপের জন্যে ওই সাঁকো থেকে পড়ে যাও তা হলে নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।"

সে অবাক হয়ে দেখল সমস্ত শারীরিক অসুবিধে উপেক্ষা করে বৃদ্ধ দৌড়োতে লাগলেন সাঁকোর দিকে। যাওয়ার আগে তার দিকে একবারও তাকালেন না। পড়ি কি মরি করে বৃদ্ধ দৌড়োতে চেষ্টা করলেন সাঁকোর দিকে। অবাক হয়ে ওঁর যাওয়া দেখল সে।

ঘুম ভেঙে যেতে জানলার বাইরে অপূর্ব মোলায়েম আকাশ দেখতে পেল সংহিতা। কিন্তু স্বপ্ন বুকের পাঁজরে যে-চাপ তৈরি করেছিল, তা এখনও মিলিয়ে যায়নি। সে বড় বড় শ্বাস ফেলল। তারপর বিছানা ছেড়ে চলে এল জানলার পাশে। সূর্য ওঠেনি, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গোটা আকাশজুড়ে তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। সংহিতা চোখ বন্ধ করতেই শব্দ দুটো মনে এল, হৃদয়ের পূর্বগগনে সূর্য উঠছে। না, এভাবে কোনওদিন ভাবেনি সে। সামনের আকাশে লালের সঙ্গে সোনারং মিশছে। স্বপ্নে শব্দ দুটো তৈরি হলেও তাকে চাক্ষুষ করার অবকাশ পায়নি সে। মনে হল, এই যে সামনে যা দেখছে তার সঙ্গে বোধহয় তেমন কোনও পার্থক্য নেই।

কিন্তু এই স্বপ্নগুলো দেখছে কেন সে? টিভি ধারাবাহিকের মতো পরপর স্বপ্নগুলো আসছে না। কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে, কখনও সামনে। কিন্তু আজ স্বপ্ন শেষ হল যেখানে, সেখান থেকেই স্বর্গে যাওয়ার সাঁকো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তা হলে কি ঈশ্বর নামক মহাশক্তিমান তার জন্যে স্বর্গের ব্যবস্থা করে রেখেছেন! ওইসব অগ্নিসর্প অথবা অগ্নিবিছের কামড় তাকে খেতে হবে না?

হেসে ফেলল সংহিতা। কৈশোর পার হওয়ামাত্র যার বিয়ে হয়েছিল অথচ প্রেম পায়নি এবং সেই বিয়ে ভেঙে গেল বিনা অপরাধে, মহাশক্তিমান ঈশ্বর তার সেই ক্ষতিপূরণ করলেন না অবহেলায়, তার জীবনে বাবাই তো ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ডিভোর্সের পর সারাক্ষণ পাশে থেকে ডিপ্রেশনের অন্ধকার থেকে টেনে তুলে নতুন করে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একটু একটু করে যখন পায়ের তলায় মাটি জমছিল ঠিক তখনই জয়ব্রতর সঙ্গে আলাপ। সরকারি কলেজে ছবি আঁকা শেখাত সে। ওর সম্পর্কে কিছুই না জেনে মনে হয়েছিল জয়ব্রতর সঙ্গ পেলে সে অনেক কিছু পাবে। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা শেখাতে পারেন, কাজটা জানেন ভালভাবেই কিন্তু নিজে সৃষ্টি করতে পারেন না। কোথায় যেন পড়েছিল, জীবনে কখনও খেলেননি এমন মানুষ কোচ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। নিজে জলে না নেমেও বিখ্যাত সাঁতারু তৈরি করেছিলেন কেউ কেউ। দীর্ঘকাল আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করেছেন অথচ নিজে ছবি আঁকেননি, আঁকলেও তাঁর কোনও এগজিবিশন হয়নি এমন উদাহরণের অভাব নেই।

সংহিতা যখন জেনেছিল ভদ্রলোক বিবাহিত এবং একটি সন্তানের জনক

তখন বিষণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু যেই জানল সেই মহিলা জয়ব্রতকে ত্যাগ করে প্রেমিকের সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে, তখন সমস্ত বিষণ্ণতা উধাও হয়ে আকর্ষণের তীব্রতা বাড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল ওই একলা মানুষের পাশে তার থাকা উচিত। আর জয়ব্রত তাকে গ্রহণ করেছিল সুন্দরভাবে। সংহিতা বুঝেছিল, জয়ব্রতর মনে তার জন্যে ভালবাসা তৈরি হয়েছে। কিন্তু কখনওই জয়ব্রত শোভনসীমার বাইরে পা বাড়ায়নি। একা নিঝুম দুপুরে ঘরে বসে সে ছবি নিয়ে কত কথা বলে গেছে, তাকে উৎসাহ দিয়েছে, কিন্তু কখনওই তার শরীরের দিকে হাত বাড়ায়নি। বরং টিকলিকে এগিয়ে দিয়েছে তার সামনে। মনে হয়েছিল টিকলিকে সে বোঝাতে চায় মা চলে যাওয়ার ক্ষতি অনেকটা পূর্ণ করে দিতেই সংহিতার আসা।

সূর্য উঠল। মাথা নাড়ল সংহিতা। সেসব দিন কবে চলে গিয়েছে। এখন মনে করা মানে পুরনো সাদা কাগজে শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগে আঙুল বোলানো। কিন্তু তারপর? প্রায় তিন দশক সে ছবির পর ছবি এঁকে গিয়েছে। একটু একটু করে গোটা ভারতের শিল্পরসিকরা তার নাম জেনেছে। এখন তার ছবি অনেকের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তার কোনও অর্থাভাব নেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাকে হারাতে হয়েছে বাবা এবং মাকে। যাওয়ার আগে মা অবশ্য তার সাফল্যের খানিকটা দেখে গিয়েছেন। তিনিই স্বামীর বাড়ি বিক্রি করে মেয়ের কাছে এসে ছিলেন শেষ কয়েকটা বছর।

তারপর শূন্যতা। এই ফ্ল্যাটে ঢোকার পর আর কেউ তার পাশে নেই। সিক্তার আগে দু'বছর, ছয় মাস, কখনও কয়েকদিন একের পর এক মেয়ে এসেছে এই ফ্ল্যাটে কাজ করতে। তাদের সবার নাম এখন মনেও নেই। কিন্তু তাদের উপস্থিতি এক ধরনের নিরাপত্তার আভাস দিলেও তারা তো সঙ্গী হতে পারে না।

আশ্চর্য ব্যাপার, তৃতীয়বার কোনও পুরুষের সান্নিধ্যের কথা সে ভাবতেই পারল না। প্রচুর স্তুতি, প্রচুর আয়োজন এই জীবনে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও মন সায় দেয়নি। কেউ কেউ আড়ালে তার সম্পর্কে বাঁকা কথা বলে। ফ্রিজিড উওম্যান। যার কোনও উত্তাপ নেই। ওর সঙ্গে থাকা মানে ডিপফ্রিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বসে থাকা। ঘুরে ঘুরে কথাগুলো কানে আসত। অনীশদার ছবি তার ঠিকঠাক পছন্দ হত না। কোনও এগজিবিশনে দেখা

হলেই বলতেন, গলা খুলে তার প্রশংসা করতেন। লোকটার যত দুর্নামই থাক, কখনওই তাকে বিব্রত করেননি। তবে তাঁর মুখে কিছু আটকাত না। একদিন বললেন, "ওহে, শুনলাম পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমকে তুমি কবরে শুইয়ে দিয়েছ।"

"বুঝলাম না!" সে হেসে ফেলেছিল।

"ছেলেছোকরারা বলছিল। প্রেম থেকে তুমি এক লক্ষ হাত দূরে। তা আমি বললাম, তা হলে ওর ছবিতে এত প্রেম থাকে কী করে!"

"কী জবাব পেলেন?"

"অশিক্ষিতরা কী জবাব দেবে? শুধু একজন বলল, ওর প্রেম বরফ হয়ে গেছে। কাছে গেলেই উত্তর মেরুর বাতাসটাকে টের পাওয়া যায়। আমি বললাম, কই, আমি তো কখনও টের পাইনি। বরং ওকে আমার মরূদ্যান মনে হয়।" বলে হো হো করে হেসে ওঠেন, "বেশ আছ, স্বধর্মেই থেকো চিরদিন।"

কিন্তু আফশোস হয় এখন। এইরকম থাকার কথা কি তরুণ বয়সে ভাবতে পারত? ছবি আঁকার সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়গুলোতে যে একাকী মনে হয় তা অস্বীকার করবে কী করে? বারংবার নিজেকে বুঝিয়েছে, দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ঢের ভাল। যা কিছু কষ্ট তা সে নিজের বুকেই রেখে দিয়েছে কিন্তু প্রত্যাঘাত করেনি, কারও সঙ্গে নতুন করে জড়াতে চায়নি।

তখনই মিলার কথা মনে এল। মিলার কোনও শেকড় নেই। ওর যা ভাল লাগে তাই করে, তার জন্যে কারও কাছে কৈফিয়ত দেয় না। সিগারেট খায়, নেশা করে, যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে তাৎক্ষণিক সম্পর্কে জড়ায়। কলকাতা আর ভিয়েনা তার কাছে ভিন্ন শহর নয়। ওর সঙ্গে অন্য কোনও বাঙালি শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়কের বিন্দুমাত্র মিল নেই। কলকাতায় এসেই সে জানিয়েছিল, এক বিদেশি বন্ধুর সঙ্গে কয়েকদিন বাস করতে পণ্ডিচেরিতে যাবে। ওর ক্ষেত্রে এরকমটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মেয়ে টিকলির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দিল? ডক্টর মালহোত্রা যে-বিপুল খরচের কথা বলেছেন, তা এককথায় মেনে নিয়েছে। মিলার আর্থিক সংগতির কথা তার জানা নেই। আজ ইউরোপের এক ইউরো মানে ভারতের প্রায় পঁয়ষট্টি টাকা। ডলারের থেকে ঢের বেশি। তাই মিলা ওখানে ছবি এঁকে যা রোজগার করে তা নিশ্চয়ই প্রচুর। কিন্তু প্রচুর হলেই অপরিচিত একটি

অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার জন্যে খরচ করতে হবে? ও নিজে যে-জীবনযাপন করে তার সঙ্গে এই মানসিকতার সম্পর্ক কতখানি? মিলা কত সহজে টিকলির কাছে সংহিতা সেজে গেল। সংহিতা সাজলে টিকলি তাকে গ্রহণ করবে বলে ওই অভিনয় করল সে। কী লাভ ওর?

মিলা চা খেতে এল বারমুডা আর গেঞ্জি পরে। চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, "আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, তুমি না বলবে না।"

সংহিতা বলল, "বেশ তো শুনি।"

"টিকলির ব্যাপারে যা খরচ হবে, তার দায়িত্ব আমাকে নিতে দাও।"

"কেন?"

"কেন আবার? ধরে নাও, ইচ্ছে হয়েছে। কিছুদিন মূর্তি গড়ার চেষ্টা করেছিলাম। বুঝতে পারলাম ওটা আমার জন্যে নয়। টিকলি এখন মাংসের তাল। ডক্টর মালহোত্রা তাকে মূর্তি বানাবেন। আমি ওই কাজে সাহায্য করব।" মিলা চায়ের কাপ নামাল।

"দু'দিন আগে এটা তোমার জানা ছিল না।"

"ছিল না। আমি আগামীকালের কথা ভাবি না। আমি প্রতিদিনের জন্যে বাঁচি। আজ মনে হচ্ছে এই কাজ করলে তা আমাকে সুখ দেবে। ব্যস, আই ওয়ান্ট টু ডু দিস।"

"আগামীকাল যদি মনে হয় কাজটা করতে ভাল লাগছে না, তখন কী হবে?"

"তা হলে তুমি আমাকে চেনোনি। আমি যে-কাজটা ধরি তা শেষ না করে ছাড়ি না। এই যে আমি ভিয়েনায় থাকি, ইউরোপে ঘুরে বেড়াই, কারণ কলকাতায় গোটা বছর পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না। কোনও পুরুষকে বেশি দিন ভাল লাগে না, আমি কী করব? এইভাবে ষাট বছর দিব্যি চালিয়ে দিতে পারব।" মিলা বলল।

"এই ছটফটানির পিছনে কি কোনও আঘাত বা দুঃখ আছে?"

"বিন্দুমাত্র নয়। আমি একটা থিয়োরিতে বিশ্বাস করি। কিছুদিন একসঙ্গে থাকার পর পরিস্থিতি যদি আমাকে বাধ্য করে ছেড়ে চলে যেতে তখন একটুও দুঃখ পাই না। উলটে ভাবি, কিছু ভাল ভাল মুহূর্ত পেয়েছি বলেই তো একসঙ্গে ছিলাম। সেই ভাল মুহূর্ত পাওয়ার জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই।

ভেবে দেখো, ওই সব মুহূর্তগুলো যা আমি এতকাল পেয়েছি, তা একসঙ্গে আমার মনে এলে কী আনন্দ যে হয়!"

"বুঝলাম। ষাট বছর পার হলে?"

"ফাইন। একটা নির্জন ঘুমঘুম পাহাড়ি শহরে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকব। আর কুয়াশা দেখব।" শব্দ করে হেসে উঠল মিলা।

"সত্যি তোমার তুলনা নেই!"

"ছাড়ো! তোমাকে কিন্তু এখনই বেরুতে হবে।"

"কোথায়?"

"আশ্চর্য! ভুলেই বসে আছ। কাল জয়ব্রতবাবুকে হাসপাতালে ভরতি করে এসেছ, আর খোঁজ নিয়েছ?"

"নিয়েছিলাম কাল সন্ধ্যায়। নতুন খবর পাইনি।"

"ভদ্রলোক একা রয়েছেন। ওঁর বাড়িতেও খবর দিতে হবে। নিশ্চয়ই হাসপাতালে ওঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া দরকার।" মিলা বলল।

সংহিতা অবাক গলায় বলল, "তুমি যে এত প্র্যাকটিকাল জানতাম না। চলো।"

জয়ব্রতর কাজের মহিলাটি ওদের দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। গতকাল বাপ-মেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে চলে যাওয়ার পর আর কোনও খবর নেই। গোটা রাত সে জেগে কাটিয়েছে। সংহিতা অনেক বুঝিয়ে ওকে শান্ত করল। জয়ব্রত দিন কয়েকের মধ্যে চিকিৎসা করিয়ে ফিরে আসবে, টিকলির ফিরতে একটু দেরি হবে। মিলা প্রৌঢ়ার হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলল, "তোমার খাওয়ার জন্যে এ থেকে বাজার করে নিয়ো। আর ওরা যদ্দিন না আসে বাড়িটাকে দেখো।"

টাকা হাতে পেয়ে প্রৌঢ়া খুশি হল।

জয়ব্রতর ব্যবহারের জন্যে যা দরকার তা একটা প্যাকেটে নিয়ে ওরা যখন আবার গাড়িতে উঠল, তখনই টেলিফোন এল নার্সিংহোম থেকে। ডক্টর মালহোত্রা আজ দুপুরেই প্রথম অপারেশনটা করবেন। কিন্তু তার আগে পেশেন্টের বাবাকে নার্সিংহোমে এসে কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে। সংহিতা জানাল, "পেশেন্টের বাবা খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি

হয়েছেন। তাঁর বদলে আমি সই করলে হবে?”

“আপনার নাম।”

নাম বলতেই মহিলা বললেন, “হ্যাঁ, পারেন। ডক্টর মালহোত্রা আপনার নামই রেকর্ডে রেখেছেন। প্লিজ, এগারোটার মধ্যে চলে আসুন।”

ওরা প্রথমে টিকলির নার্সিংহোমেই গেল। অপারেশন করার জন্যে যেসব সই প্রয়োজন হয় সংহিতা তা করে দিল। তাদের জানানো হল, “ডক্টর মালহোত্রা ঠিক একটার সময় কাজ শুরু করবেন। আপনারা সেই সময় থাকলে ভাল হয়।”

যদিও তখন ভিজিটার্সদের পেশেন্টের কাছে যাওয়ার সময় হয়নি, তবু আজই অপারেশন হবে বলে ওদের অনুমতি দেওয়া হল। কেবিনে ঢুকে ওরা দেখল টিকলি বেডে বসে আছে, সামনে পা দুটো, পেছনে বালিশের পাহাড়। মিলা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “বসে থাকতে ভাল লাগছে?”

টিকলির মুখ ঈষৎ ফিরল, “হলুদ শাড়ি?”

“হ্যাঁ।”

“আমার শুতে ভাল লাগে না। তুমি কোথায় ছিলে?”

“আমাকে তো এখানে থাকতে দেবে না, তাই বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম।”

“তোমার বাড়িতে কে কে আছে?” টিকলি জিজ্ঞাসা করল।

“কেউ নেই। আমি একা।” মিলা বলল।

“তা হলে তুমি আমাদের বাড়িতে চলে এসো।”

“তুমি সেরে ওঠো, হাঁটাচলা করো, তখন যাব।”

এই সময় নার্স কেবিনে ঢুকলেন, “আমি ওকে অনেকবার বলেছি। ডক্টর মালহোত্রা এমন একজন ডাক্তার যিনি কখনওই হেরে যান না। তুমি আবার হাঁটতে পারবে, বসতে পারবে, আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে লাগবে তোমাকে।”

“হলুদ শাড়ি, নার্সদিদি ঠিক বলছে?”

“একদম ঠিক।” মিলা বলল।

নার্স বলল, “ওমা! এ কী কথা। তোমার মাসির কি নাম নেই?”

“থাক নাম। আমি হলুদ শাড়ি বলেই ডাকব। আচ্ছা হলুদ শাড়ি, আমি কি আবার দেখতে পাব?” টিকলি যেন এখন একটু ক্লান্ত।

"নিশ্চয়ই। আগে শরীরটা ঠিক হয়ে যাক, তারপর চোখের চিকিৎসা হবে।"

সংহিতা চুপচাপ শুনছিল। নার্স মিলাকে একটা টুল এগিয়ে দিলে সংহিতা ইশারায় মিলাকে বাইরে আসতে বলল। মিলা বেরিয়ে এলে সংহিতা বলল, "তুমি ওর কাছে থাকো। তুমি কাছে থাকলে ও মনে জোর পাবে। আমি ঠাকুরপুকুর থেকে ঘুরে আসি। যদি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তা হলে তোমাকে তুলে বাড়ি চলে যাব। লাঞ্চ করে আবার একটার মধ্যে এখানে আসতে হবে।"

মিলা একটু ভাবল, তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভেতরে চলে গেল।

এখনও শহরে ব্যস্ততা প্রবল হয়নি। গাড়ি ছুটছিল ঠাকুরপুকুরের দিকে। মিলার কথা ভাবলেই অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে সংহিতার। সেটা না মজার, না খারাপ কিছুর। মেয়েটা কী সহজে টিকলির কাছে সংহিতা হয়ে গেছে। আজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বারমুডা ছেড়ে শাড়ি পরে এসেছে এবং সেই শাড়ির রঙে হলুদ রয়েছে। ও যেন একটু একটু করে মিলার স্বভাব ভুলে সংহিতা হয়ে যেতে চাইছে। মুশকিল হল, সংহিতা বুঝতে পারছে না সে কেন খুশি হতে পারছে না!

ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে পৌঁছে ব্যাগ থেকে কার্ডটা বের করল। গত রাতে সে দু'বার ফোন করেছিল, প্রতিবারই শুনেছে আউট অফ রিচ। গাড়ি থামামাত্র সে কার্ডের নম্বরে ফোন করল। এবার ডাক্তারের গলা পাওয়া গেল, "হ্যালো।"

"নমস্কার। আমি সংহিতা বলছি। গতকাল আমার পরিচিত একজনকে...।"

তাকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কাল পেশেন্টকে ভরতি করিয়ে একদম নিপাত্তা হয়ে গেলেন?"

"অনেক ঝামেলার মধ্যে আছি ডাক্তার। কিন্তু আমি আপনার কথামতো রাতে ফোন করেছিলাম। আউট অফ রিচ বলছিল।" সংহিতা জবাব দিল।

"আপনি কখন আসতে পারবেন?"

"আমি এসেই গিয়েছি। আপনাদের হাসপাতালেই আমি।"

"ওঃ। আমার নামটা নিশ্চয়ই কার্ডে দেখেছেন। চলে আসুন।"

ডাক্তার একা ছিলেন না। ওই ঘরটিতে আরও তিন জন ডাক্তার বসে গল্প করছিলেন। সংহিতাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "কিছু মনে করবেন না, জয়ব্রতবাবুও শুনলাম আর্ট কলেজে পড়াতেন। কিন্তু উনি আত্মহত্যা করতে চাইছেন কেন? এতদিন চিকিৎসা না করিয়ে থাকা তো আত্মহত্যার শামিল। আপনারা এটা অ্যালাও করলেন?"

মাথা নাড়ল সংহিতা, "বহু বছর যোগাযোগ ছিল না। কয়েকদিন আগে জানতে পারলাম যে, উনি অসুস্থ।"

"কিছু মনে করবেন না, জয়ব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার—।"

"পরিচিত।" কথা শেষ করতে দিল না সংহিতা।

"ওঁর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন?"

খুব দ্রুত দ্বিধা সরিয়ে দিয়ে সংহিতা বলল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু উনি এখানে থাকতেই চাইছেন না।"

"আমি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আসুন।"

ডাক্তার ওকে যে-ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে আরও তিন জন পেশেন্ট রয়েছেন। সংহিতা দেখল জয়ব্রতর শরীরে রক্ত এবং স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। তাকে দেখে জয়ব্রত বলল, "আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।"

"কেন?"

"আমি হোমিওপ্যাথিতেই ভাল থাকব।" জয়ব্রত অন্য দিকে তাকাল।

"ছেলেমানুষি করার বয়স কি এখনও গেল না?" সংহিতা নিচু গলায় বলল।

ডাক্তার বললেন, "আপনি কথা বলুন। যাওয়ার আগে দেখা করে যাবেন।"

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সংহিতা লক্ষ করল বাকি তিন জন পেশেন্টের মধ্যে এক জন তার দিকে তাকিয়ে, বাকি দু'জন ঘুমোচ্ছেন।

সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি চিকিৎসা করাতে চাইছ না কেন?"

"কারণ এই চিকিৎসার খরচ চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"বেশ। তুমি কেন আমাকে বারংবার ফোন করেছিলে?"

"আই অ্যাম সরি।"

"সরি মানে? আমাকে হ্যামার করে করে বাড়িতে নিয়ে গেছ কেন?"

"টিকলির ব্যাপারটা নিয়ে কী করব বুঝতে পারছিলাম না, তাই।"

"তুমি ওকে মেরে ফেলতে পারতে! বাপ হয়ে মেয়েকে মারতে না পারার কান্না কাঁদার কী দরকার ছিল! মেরে জেলে যেতে। বিচারের আগেই মৃত্যু এসে যেত।"

"আমি পারিনি।" দু'পাশে মাথা দোলাল জয়ব্রত।

"কিন্তু তুমি তাই করতে চাইছ?"

"মানে?"

"আজ মেয়েটার প্রথম অপারেশন হবে। যিনি করবেন তাঁর বিশ্বাস টিকলি আবার আগের চেহারায় ফিরে যাবে। হয়তো চোখের দৃষ্টিও ফিরে পেতে পারে। কিন্তু তুমি যদি আত্মহত্যা করো তা হলে মেয়েটার কী হবে? যে-মুহূর্তে জানতে পারবে তুমি নেই সেই মুহূর্তেই ও ভেঙে পড়বে। তুমি বেঁচে আছ, অনেকটা সুস্থ হয়েছ জানলে ও লড়াই করতে জোর পাবে। নার্সিংহোম ওকে টানা রাখবে না। মাঝে মাঝেই ওকে বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। তখন কোন বাড়িতে যাবে? যে-কোনও মানুষই চাইবে নিজের বাড়িতে যেতে। তুমি পৃথিবীতে না থাকলে ও সেখানে কার কাছে থাকবে?" একটানা প্রশ্ন করে গেল সংহিতা।

উত্তর দিল না জয়ব্রত। চোখ বন্ধ করল।

"ও হাঁটাচলা করুক, নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসুক, তুমি চাও না?"

"চাই।"

"তা হলে ততদিন তোমাকে পৃথিবীতে থাকতে হবে।"

"কিন্তু এই চিকিৎসার তো বিপুল খরচ—!"

"ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"অসম্ভব!"

"কেন?"

"আমি তোমার কাছে কী করে হাত পাতব?"

"হাত পাতার কথা উঠছে কেন?"

"আমাকে বেঁচে থাকতে হবে তোমার দয়া নিয়ে। আমার ভুলের জন্যে যে-তুমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে একদিন, সেই তুমি আজ আমাকে বাঁচাতে এসেছ? নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না সংহিতা।" চোখ দিয়ে জল

গড়িয়ে এল জয়ব্রতর।

"সন্তানের জন্যে বাবা-মাকে অনেক ত্যাগ করতে হয়। আমার বাবাও সব ছেড়ে দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। টিকলির জন্যে যদি এটুকু করো তা হলে মেয়েটা বেঁচে যাবে। ওর জীবনের চেয়ে কি তোমার এই মানসিকতা বেশি মূল্যবান?"

জয়ব্রত অনেকক্ষণ কথা বলল না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কতদিনে ও সুস্থ হবে?"

"আমি ডাক্তার নই যে, সময়টা বলতে পারব।" উঠে দাঁড়াল সংহিতা।

"আমাকে এখানে কতদিন থাকতে হবে।"

"এখানকার ডাক্তার যতদিন থাকতে বলবেন। প্লিজ জেদ ধোরো না। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। তোমার কিছু জিনিস এই প্যাকেটে নিয়ে এসেছি। কাজের লোককে বুঝিয়ে বলেছি। সে ঠিক থাকবে। আমি আবার কাল আসব।" ঘর থেকে বেরিয়ে এল সংহিতা।

ডাক্তার রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করতে হল ঘণ্টাখানেক। মুখোমুখি হলে তিনি বললেন, "জয়ব্রতবাবু যদি আগে আসতেন তা হলে অবস্থা এতটা খারাপ হত না। আমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে। ওর শরীরে রক্ত বাইরে থেকে দিলে তেমন কাজ হবে না। ওঁর শরীরকেই রক্ত তৈরি করতে হবে, যে-কাজটা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে বলে ধারণা করছি। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।"

"বলুন।"

"ওঁর টাইপের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাবে এমন একজন ডোনার দরকার যার বোনম্যারো বের করে জয়ব্রতবাবুর শরীরে স্থাপন করতে হবে। এই অপারেশন এখন আর তেমন কঠিন নয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন একজন সুস্থ লোক তার একটা কিডনি ডোনেট করে অসুস্থ মানুষকে বাঁচাতে পারেন। যিনি দান করলেন তাঁর ক্ষতি হয় না বলাই যেতে পারে। বোনম্যারোর ক্ষেত্রেও ডোনারের কোনও ক্ষতি হয় না। জয়ব্রতবাবুর ক্ষেত্রে অপারেশন যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব তত ওঁর পক্ষে ভাল হবে।" ডাক্তার বললেন।

"কিন্তু ডোনার কোথায় পাব?"

"আত্মীয় বন্ধুদের বলুন। তবে শর্ত হল ওঁর টাইপের সঙ্গে ডোনারের মিল থাকা অত্যন্ত জরুরি। টাকার বিনিময়ে ডোনার হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু

আমি সাজেস্ট করব আত্মীয় বন্ধুদেরই অ্যাপ্রোচ করুন। দেখুন, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সেরকম কয়েক জনকে পাওয়া যায় কিনা। পেলে আমরা তাঁদের পরীক্ষা করব।"

সংহিতা ভেবে পাচ্ছিল না কে বোনম্যারো ডোনেট করতে রাজি হবে!

সে মাথা নাড়ল, "আমি চেষ্টা করব।"

"ও হ্যাঁ, আপনি একবার অফিসে গিয়ে কথা বলুন।" ডাক্তার চলে গেলেন।

অফিস থেকে বলা হল যে-ইঞ্জেকশনগুলো এখন জয়ব্রতকে দেওয়া হচ্ছে তার দাম বেশ বেশি। তাকে আরও বিশ হাজার এখনই জমা দিতে বলা হল। ব্যাগ খুলে ক্রেডিট কার্ড বের করে দিল সংহিতা।

ঠিক পৌনে একটায় নার্সিংহোমে পৌঁছে গেল সংহিতা। মিলা বলল, "তোমাকে ডক্টর মালহোত্রা দেখা করতে বলেছেন। উনি এসে গিয়েছেন।"

"তুমিও চলো।" সংহিতা এগোল।

"জয়ব্রতবাবু কেমন আছেন?"

"চিকিৎসা শুরু হয়েছে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বেটার লেট দ্যান নেভার। চেষ্টা করছেন ডাক্তার। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে।" সংহিতা দাঁড়াল।

"কী?"

"ডোনার চাই যিনি বোনম্যারো ডোনেট করবেন। যে-কেউ হলে চলবে না, যাঁর সঙ্গে ওর সব কিছু মিলে যাবে তাঁকেই দরকার। কোথায় পাব তাঁকে?"

মিলা বলল, "আগে টিকলির অপারেশন হোক তারপর ওটা নিয়ে ভাবব।"

ডক্টর মালহোত্রা তাঁর চেম্বারে বসে ল্যাপটপে ব্যস্ত ছিলেন। সংহিতাদের দেখে যন্ত্রটা বন্ধ করে বললেন, "ভাল খবর। মেয়েটির রক্ত কোনও সমস্যা তৈরি করবে না। ওই অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়ে থাকলে রক্তে চিনি বেড়ে যায়, ইউরিক অ্যাসিডও সীমা ছাড়ায়। বাট আওয়ার টিকলিকে অলমাইটি কোনও প্রবলেম দেননি। আশা করছি আজ খানিকটা কাজ করে ফেলতে পারব।"

সংহিতা বলল, "আমি এই চিকিৎসার কিছুই জানি না। একদম নির্বোধের

মতো প্রশ্ন করছি, আপনি কি আজ জুড়ে থাকা শরীরের অঙ্গগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করবেন?"

"প্রথমেই তো ওর রূপ নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা উচিত। তাই না?" ডক্টর মালহোত্রা বললেন, "ওহো! যে জন্যে আপনাকে খবর দিতে বলেছিলাম সেটা মিটে গেছে। টিকলির ব্লাড গ্রুপ খুব কমন নয় আবার রেয়ার বলাও চলে না। নার্সিংহোম সেই সমস্যার সমাধান করেছে। আপনাদের এক জন যদি ব্লাড ডোনেট করেন তা হলে নার্সিংহোম প্রয়োজনে পেশেন্টদের সাহায্য করতে পারবে।"

মিলা বলল, "নিশ্চয়ই। আমরা অফিসে গিয়ে কথা বলছি।"

এই সময় ইন্টারকমে ডক্টর মালহোত্রাকে জানিয়ে দেওয়া হল, ওটিতে সবাই তৈরি। ডক্টর সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আজ দুপুরে খাওয়া হয়নি। মিলা তা সত্ত্বেও আজই রক্ত ডোনেট করতে চেয়েছিল, সংহিতার আপত্তিতে আগামী কাল দেবে বলে ঠিক করেছিল। টিকলিকে ঘুমন্ত দেখে এসেছে ওরা। বিকেলের চা ফ্ল্যাটে বসে খেতে খেতে মিলা বলল, "ভিয়েনাতে আমি রান্না করে খেতাম। আমার ফেবারিট ডিশ কী ছিল বলো তো?"

সংহিতা তাকাল। মিলা বলল, "নরম ভাত, মাখন, ডিমসেদ্ধ আর আলুসেদ্ধ।"

"বিশ্বাস করি না। রোজ এই খেলে তোমার ফিগার এমন থাকত না। এতদিনে ফুটবল হয়ে যেতে। ঘি বা মাখন আমি শেষ কবে খেয়েছি তা ভুলেই গিয়েছি।"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিক্তা শুনছিল, বলল, "আজ রাত্রে করব?"

মিলা বলল, "দারুণ হবে। সারাদিন তো না খেয়ে আছি, ব্যালান্স হয়ে যাবে।"

সংহিতা সিক্তার দিকে তাকিয়ে হাসল, "তাই করো। গোবিন্দভোগ আছে তো?"

"আছে।" উৎসাহিত সিক্তা ভেতরে চলে গেল।

সংহিতা বলল, "সিক্তার মুখখানা দেখলে? আজ ওকে কী রাঁধব তা

ভাবতে হবে না, পরিশ্রমও বেঁচে যাবে। ভিয়েনাতে ভাল চাল পেতে?"

"বাসমতী।" মিলা বলল, "হ্যাঁ, জয়ব্রতবাবুর ব্যাপারটা বলো।"

"আমি অনেক ভাবছি কিন্তু কূল পাচ্ছি না। পরিচিত কাউকে ব্লাড ডোনেট করতে বললে আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কিডনি বা বোনম্যারো দিতে কে রাজি হবে? কাগজে কিডনি চেয়ে বিজ্ঞাপন চাওয়া হয়। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষ কি তাতে রেসপন্স করে? অত্যন্ত গরিব মানুষ যার অন্য কোথাও টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে-ই টাকার বিনিময়ে রাজি হতে পারে। তা ছাড়া লোকে এতদিনে জেনে গিয়েছে যে, একটা কিডনি শরীর থেকে বাদ গেলে কেউ মারা যায় না। বোনম্যারো সম্পর্কে কোনও ধারণা পাবলিকের নেই।" সংহিতা বলল।

"কিন্তু কিডনি দেওয়ার চেয়ে বোনম্যারো দেওয়া অনেক সহজ, কোনও ঝুঁকি নেই। আমি ভিয়েনাতে দুটো কেসের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।" মিলা বলল।

"একটু বুঝিয়ে বলো তো!"

"সরল করে বলছি। আমাদের শরীরের হাড়ের মধ্যে যে-মজ্জা আছে তা রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে। সেই রক্ত শরীর পরিশোধিত করে নেয়। লিউকেমিয়া পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মজ্জা অকেজো হয়ে আসে। ফলে রক্ত উৎপাদন কমতে শুরু করে, শ্বেতকণিকা বাড়তে শুরু করে। বাইরে থেকে পেশেন্টকে রক্ত দিলে প্রথম দিকে একটু কাজ হলেও পরে শরীর তা নিতে পারে না। তখন পেশেন্টের হাড়ের ভেতর তাজা মজ্জা ঢুকিয়ে দিলে দেখা যায় আবার ধীরে ধীরে নতুন রক্ত তৈরি হচ্ছে। সাধারণত কুঁচকি থেকে হাঁটুর ওপরটা, হাঁটুর তলা থেকে গোড়ালির ওপর পর্যন্ত যে-হাড় আছে, যা বেশ মোটা এবং শক্ত, তাদেরই ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া দরকারে কাঁধ থেকে কনুই, কনুই থেকে কবজির হাড়ও একই কাজে লাগে।"

চুপচাপ শুনছিল সংহিতা, এবার মাথা নাড়ল, "কেউ রাজি হবে না।"

"আমার মনে হয় বিজ্ঞাপন দিলে অনেক ডোনার পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু ডাক্তার বলেছেন যে, উনি প্রফেশন্যাল ডোনারদের চান না।" সংহিতা বলল, "তা ছাড়া লোকটাকে জয়ব্রতর টাইপ হতে হবে।"

মিলা বলল, "বিজ্ঞাপনটা দিয়েই দেখো। হয়তো ডোনার লাখ চার-পাঁচ চাইবে। টিকলির জন্যেই জয়ব্রতবাবুর বেঁচে থাকা দরকার।"

সংহিতা ওর পরিচিত একজন সাংবাদিককে ফোন করল যিনি খুব নামকরা খবরের কাগজে কাজ করেন। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, "বিজ্ঞাপনটায় কী থাকবে বলুন।"

সংহিতা বললে সেটা লিখে নিয়ে ভদ্রলোক পড়ে শোনালেন। সংহিতা বলল, "বিজ্ঞাপনের চার্জ কত যদি জানিয়ে দেন তা হলে আমি পাঠিয়ে দেব।"

"বিজ্ঞাপনের কপি, বিল নিয়ে একজন যাবে, তার হাতে দিয়ে দেবেন।"

আজ রাত্রে স্বপ্নটা দেখল না সংহিতা। রাত্রে একটার বদলে দুটো ঘুমের বড়ি খেয়েছিল সে। অনভ্যস্ত নরম ভাত হয়তো ঘুমটাকে গভীর করেছিল। একটানা ঘুমিয়ে যখন সিক্তার ডাকে চোখ মেলল তখন শরীর বেশ ঝরঝরে।

একটু বেশি ব্রেকফাস্ট সেরে মিলার সঙ্গে বেরিয়ে আগে নার্সিংহোমে পৌঁছেছিল তারা। টিকলি এখনও ঘুমিয়ে আছে। নার্স বললেন, "ভোরবেলায় সেন্স ফিরে এসেছিল, ডক্টর মালহোত্রা বলে গিয়েছিলেন ঘুমের ওষুধ দিতে। এখন যত ঘুমোবে তত ভাল।"

আজ মিলা তার ক্রেডিট কার্ড থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নার্সিংহোমে অগ্রিম হিসেবে জমা দিল। সংহিতা লক্ষ করল মেয়েটার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

আজ জয়ব্রতকে অনেকটা ভাল দেখাচ্ছিল। টিকলির খবর পেয়ে ওর মুখে খুশি ছড়িয়ে পড়ল, "কখন জ্ঞান আসবে?"

মিলা বলল, "জ্ঞান এসে গিয়েছে। এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।"

সংহিতা বলল, "একটা কথা জানিয়ে রাখি, টিকলির চিকিৎসার যাবতীয় খরচ মিলাই দিচ্ছে। ও টিকলিকে সুস্থ দেখতে চায়।"

অবাক হয়ে তাকাল জয়ব্রত। অদ্ভুত গলায় বলল, "আপনি তো ওকে কখনও দেখেননি?"

মিলা হাত ওপরে তুলল, "ঠিকই। তবে এ নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমার জীবনে কোনও ইচ্ছে প্রবল হলে আমি সেটা পূর্ণ করতে চাই। টিকলির ব্যাপারে যা করছি তা ওই ইচ্ছের জন্যে। আমার মনে হল করলে ভাল লাগবে। আর এ নিয়ে কথা নয়।"

"কী বলব আমি? টিকলির কপালে শুধু দুঃখকষ্ট ছাড়া কিছু ছিল না বলে

ভাবতাম, এখন দেখছি ভুল ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি তো অনেক ভাল আছি। যেসব ইঞ্জেকশন, ওষুধ এখানে দিচ্ছে তা বাড়িতে গিয়েও তো দেওয়াতে পারি। তাই না?" প্রশ্নটা সংহিতাকে।

মিলা বলল, "গতকাল এসেছেন আর আজই যাই যাই করছেন? আপনার মেয়ে কিন্তু এরকম ছেলেমানুষি করেনি। আপনাকে তো এখনও ব্লাড দিচ্ছে। কোর্স শেষ হোক তারপর ওসব ভাববেন।"

জয়ব্রত ছেলেমানুষের মতোই কথা বলল, "আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কীরকম খরচ হয়েছে?"

"কেন?"

"জাস্ট, কৌতূহল হল।"

মাথা নাড়ল সংহিতা, "আমরা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।"

"ও। শোনো, দোতলায় টিকলির পাশের ঘরে গিয়ে খাটের নীচে একটা বড় প্যাকেট পাবে। দেখো, যদি কাজে লাগে।" জয়ব্রত বলল।

"কী আছে ওতে!"

"নিজের চোখেই দেখো।" চোখ বন্ধ করল জয়ব্রত।

বিজ্ঞাপনের কথা শুনে ডাক্তার বললেন, "আর কী করবেন! যারা আবেদন করবে, দেখবেন, তাদের মধ্যে কোনও প্রফেশনাল ডোনার না থাকে। এমনিতেই খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। এই যে ওঁকে কথা বলতে দেখছেন, কোনও কোনও দিন বেশ ফ্রেশ দেখাবে ওঁকে, কিন্তু তার সঙ্গে শরীরের ভেতর যে-ক্ষয় চলছে তার কোনও সম্পর্ক নেই। ওগুলো সাময়িক ব্যাপার। যদি তিন-চার দিনের মধ্যে অপারেশনটা করতে পারতাম তা হলে লড়াই করার সময় পাওয়া যেত।"

সংহিতা তাকাল, "তেমন এমার্জেন্সি হলে আমি রাজি আছি।"

"আপনি?" ডাক্তার তাকালেন।

"বললেন তো, কোনও ক্ষতি হবে না।"

"না। তবে ডোনার অল্পবয়সি হলে ভাল হয়। ঠিক আছে, আপনার কয়েকটা টেস্ট আমরা নেব। দেখা যাক। আসুন।"

প্রথমেই বিপত্তি হল। সংহিতার ব্লাড গ্রুপ একদম আলাদা। ওর বোনম্যারো জয়ব্রতর কোনও কাজে লাগবে না। ডাক্তার বললেন, "প্রাথমিক শর্ত হল

দু'জনের একই ব্লাড গ্রুপ হতে হবে। তারপর আরও কয়েকটা টেস্ট মিলে গেলে ডোনারকে অ্যাকসেপ্ট করব আমরা।"

মিলা শুনছিল। বলল, "জয়ব্রতবাবুর সঙ্গে আমারও ব্লাড গ্রুপ মিলছে না।"

ডাক্তার বললেন, "আপনাকে বলেছিলাম জয়ব্রতবাবুর রক্তের গ্রুপ বিরল নয় আবার পেতে অসুবিধেও হয়। বিজ্ঞাপনে ব্লাড গ্রুপ মেনশন করেছিলেন?"

"না।" সংহিতার খারাপ লাগল ভুল করায়।

"তা হলে তো ঠগ বাঁছতে গাঁ উজাড় হবে।"

মিলা বলল, "আজকের কাগজে বোধহয় বিজ্ঞাপন বের হয়নি। বেরোলে ওই ভদ্রলোক ফোন করতেন। না বেরোলে ওঁকে বলো ব্লাড গ্রুপ অ্যাড করে দিতে।"

তখনই ফোন করল সংহিতা। সে শুনে আশ্বস্ত হল কারণ কাল খুব চাপ থাকায় বিজ্ঞাপনটা ছাপা যায়নি। আগামীকাল অবশ্যই বের হবে। সংহিতা ভদ্রলোককে জয়ব্রতর ব্লাড গ্রুপটা জানিয়ে বলল যাতে বিজ্ঞাপনে দিয়ে দেওয়া হয়।

দুপুরে ডক্টর মালহোত্রার ফোন এল, "ম্যাডাম। একটু আগে পেশেন্টকে দেখে এলাম। আই অ্যাম হাপি। এখন কিছুদিন ওর পিছনে লেগে থাকতে হবে। আমি মনে করছি, মাসখানেকের মধ্যে হাত আর আঙুল ফিরে পাবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।" সংহিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"আরে না না। মেয়েটির শরীর আমাদের সঙ্গে খুব কোঅপারেট করছে। বাই।"

বিকেলে নার্সিংহোমে গিয়ে টিকলির কেবিনে ঢুকতেই নার্স বলে উঠলেন, "এই যে, হলুদ শাড়ি এসে গেছেন। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর শুধু দুটো প্রশ্ন। বাবা কোথায়? হলুদ শাড়ি কেন আসছে না? নিন কথা বলুন।"

পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়েছে টিকলিকে। মিলা পাশে বসল, "কেমন আছ?"

"খুব ব্যথা।" নির্জীব গলায় উত্তর দিল টিকলি।

"তুমি তো অনেক কষ্ট করেছ। এখন ভাল হয়ে যেতে আর একটু কষ্ট সহ্য করো।"

"আজ ডাক্তারবাবু বলেছে—!"

"কী বলেছেন?"

"আমি এক মাস পরে নিজের হাতে খেতে পারব।"

"বাঃ! তাই তো চাই।"

"আমার বাবা কোথায় গো?"

"তুমি কি জানো তোমার বাবার শরীর খারাপ?"

"জানি। বাবা আমার পাশে বসে কাঁদত আর বলত আমি মরে গেলে তোর কী হবে? আমি বলতাম, তুমি মরার আগে আমিই মরে যাব। কিন্তু আমি যখন ভাল হয়ে যাচ্ছি, তখন বাবাও ভাল হয়ে যাবে, তাই না?"

"ঠিক। কিন্তু বেশি কথা বলছ।"

"বেশ চুপ করছি, শুধু বলো বাবা কোথায়।"

"হাসপাতালে। আমরা জোর করে ভরতি করেছি।"

"আমরা মানে? তোমার সঙ্গে কে আছে?"

"তোমার আর এক মাসি।"

"ভাগ্যিস তোমরা এলে।" শ্বাস ফেলল টিকলি।

রাত্রে আজও দুটো ঘুমের বড়ি খেল সংহিতা। আজও সে স্বপ্ন দেখেনি। না দেখলে শরীর বেশ তাজা লাগে। তখনই মনে পড়ল অনেকদিন আঁকার ঘরে ঢোকা হয়নি। ছবিটা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে।

আজ সকালে মিলা চা খেতে এল শাড়ি পরে। চোখ কপালে তুলল সংহিতা, "এ কী সাজ আজ?"

"এটা তোমার শাড়ি। ওই ঘরের আলমারিতে ছিল।"

"দেখছি।"

"ফর এ চেঞ্জ—!" হাসল মিলা।

চা খেতে খেতে সংহিতা বলল, "তুমি অনেকদিন আটকে আছ। টিকলির চিকিৎসা তো এখন রুটিনে চলবে। যাও, পণ্ডিচেরি ঘুরে এসো।"

"তাড়াতে চাইছ কেন বলো তো?" মিলা রেগে গেল।

"তাড়াব কেন? তুমি এইরকম জীবনযাপনে কি অভ্যস্ত! বনের পাখিকে কি খাঁচায় ভাল লাগে?"

হাসল মিলা, "ধরে নাও এটা আমার অজ্ঞাতবাস। কেউ জানে না আমি কোথায় আছি! আমার মোবাইলের সুইচ অফ করে রেখেছি।"

সংহিতা অবাক হল "কেন?"

"ওই জীবন আগে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমি এখন টিকলির সঙ্গ পেতে চাই। ধরে নাও, ফর এ চেঞ্জ!" হাসল মিলা।

বিজ্ঞাপনটা কাগজে ছাপা হয়েছে। সংহিতার ল্যান্ডলাইন নম্বরে প্রথম ফোন এল সকাল আটটায়। একজন ভদ্রলোক জানতে চাইলেন অন্য গ্রুপের রক্ত হলে চলবে কিনা! তাঁকে না বলতে হল। দ্বিতীয় ফোনে সংহিতাকে বোঝাতে হল বোনম্যারো ব্যাপারটা ঠিক কী! শুনে "ওরে বাবা" বলে ফোন রেখে দিলেন ভদ্রমহিলা। তৃতীয় ফোন করলেন যিনি তিনি নিজের বয়স বললেন, "বিরাশি।" বিরাশি শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল সংহিতা। ভদ্রলোক বললেন, "বিরাশি শুনে অবাক হবেন না। আমি যে-কোনও যুবকের মতো সচল আছি। রোজ ভোরে আট কিলোমিটার হাঁটি। সম্প্রতি শেয়ারে বিশাল লস করেছি। তাই আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়েছে। আমি যদি ডোনেট করি, তা হলে কীরকম টাকা পাব?"

সংহিতা বলল, "আপনার ফোন নম্বর এবং নাম বলুন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, তারপর আপনাকে জানাব।"

"বেশি দেরি করবেন না প্লিজ।" নাম ও ফোন নম্বর বলে থামলেন ভদ্রলোক।

বেলা দশটার সময় ওরা বের হল। তখন পর্যন্ত আর ফোন আসেনি। সংহিতা ভেবেছিল প্রচুর ফোন আসবে তাই নিজের মোবাইল নম্বর বিজ্ঞাপনে দেয়নি। সে সিক্তাকে বলল, "তুমি এই প্যাডে যারা যারা ফোন করবে তাদের নাম আর ফোন নম্বর লিখে রাখবে। বলবে দুপুরে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব। পারবে তো?"

সিক্তা মাথা নাড়ল, "পারব।"

আজ নার্সিংহোমে পৌঁছে সংহিতা বলল, "তুমি টিকলির কাছে থাকো আমি ঠাকুরপুকুর থেকে ফেরার পথে তোমাকে নিয়ে যাব।"

ঘড়ি দেখল মিলা, মাথা নেড়ে নেমে গেল।

ঠাকুরপুকুরে যাওয়ার পথে সংহিতার বেশ মজা লাগছিল। টিকলি জানছে যে, তার দেখা হলুদ শাড়ি আবার ফিরে এসেছে। চার বছর বয়সে দেখা মুখ, মনে না থাকাই স্বাভাবিক। মিলা খুব সুন্দরভাবে ওর কাছে সংহিতা হয়ে গেছে। যদি টিকলি নাম জিজ্ঞাসা করে তা হলে মিলা নিশ্চয়ই নিজের নাম বলবে। চার বছরের স্মৃতিতে সংহিতা আর মিলার মধ্যে পার্থক্য এখন থাকা সম্ভব নয়।

ডাক্তার সজোরে মাথা নাড়লেন, "অসম্ভব। ওই বয়সের মানুষকে দিয়ে চলবে না। আপনাদের ডোনার আনতেই হবে। আমি আজ থেকেই কেমো শুরু করেছি। দুই সপ্তাহের কোর্স শেষ হলে অপারেশন করব। আমি জানি না ভদ্রলোক ধকলটা নিতে পারবেন কিনা! নিতে পারলে এবং বোনম্যারো পেলে আমি ওঁর বেঁচে থাকার ব্যাপারে আশাবাদী।"

"কিন্তু আমি ডোনার পাব কোথায়?"

"খোঁজ করুন। এ নেগেটিভ ব্লাড একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। বি নেগেটিভ হলে আমি এতটা উৎসাহী হতাম না। ওটা খুব কম মানুষের রক্তে দেখা যায়। আপনি তো কয়েকটা দিন সময় পাচ্ছেন।"

"আর কোনও উপায় নেই?" ডুবে যাচ্ছে এমন মানুষের গলা সংহিতার।

"ছিল। যদি ওঁর বয়স অনেক কম হত। তা হলে এখনই আমি ওঁর শরীর থেকে ম্যারো বের করে কেমো শুরু করতাম। কেমো যেমন রোগটাকে বাড়তে দেয় না তেমনি সমস্ত প্রতিরোধক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। ওঁর শরীর থেকে নেওয়া ম্যারো কতগুলো প্রসেসের মাধ্যমে উন্নত করে আবার শরীরে স্থাপন করলে সেটা কাজ শুরু করে দিত। কিন্তু এই বয়সে সেটা সম্ভব নয়।" ডাক্তার বললেন।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জয়ব্রতর কাছে গেল সংহিতা। জয়ব্রতর চোখ বন্ধ। নলগুলো সক্রিয় রয়েছে। আজ ওর মুখটাকে খুব সাদাটে মনে হল। একজন নার্স পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করলেন।

আজ সকাল থেকে টিকলির জ্বর এসেছে। সামান্য জ্বর। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীরমুখে মিলা জানাল। সংহিতা তাকাল, "হঠাৎ?"

"নার্স বলল এরকম নাকি হতেই পারে। শরীরে কাটাকুটি হয়েছে তো!"

"ডক্টর মালহোত্রার সঙ্গে কথা বলবে?"

"দেখি, বিকেলে একবার আসব। তখনও জ্বর থাকলে—!"

"তোমার সঙ্গে টিকলির আজ কথা হয়নি?"

"হয়েছে। খুব সামান্য। ওর বাবার খবর কী?"

"কেমো শুরু হয়েছে।"

"সেটা তো অনেককাল আগে হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। অপারেশনের আগে নাকি দরকার।"

"বিরাশি বছরের ভদ্রলোকের কথা বলেছ?"

"হ্যাঁ। কাজে লাগবে না। দেখো, যাদের টাকা নেই তারা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। তার যুক্তি আছে। যার মাসে তিন হাজার টাকা রোজগার সে বাইপাস সার্জারির কথা ভাববে না। ওষুধ খেয়েই মরে যাবে। যার ক্ষমতা আছে সেও তো মাঝে মাঝে অসহায় হয়ে পড়ে, একজন ডোনারের অভাবে জীবন চলে যাচ্ছে তা পকেটে টাকা নিয়েও দেখতে হয়।"

"এদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

"জয়ব্রতর বাড়িতে। সেই প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে কথা বলে আসা দরকার।"

"ও হ্যাঁ। বুড়ির বোধহয় কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, নইলে একা ওখানে পড়ে থাকত না। শোনো, নার্সের কাছে শুনলাম টিকলির অপারেশন আপাতত চারটে দফায় হবে। প্রথম দফা হয়ে গেছে। বাকি রইল তিনটে।"

"তারপর বাড়িতে নিয়ে আসা যাবে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু—!" মিলা থেমে গেল। তারপর বলল, "আগে হোক। আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবি না। তখন যা পরিস্থিতি হবে তেমনই করা যাবে।"

প্রৌঢ়া দরজা খুলে হাউমাউ করে উঠল। বলল, "তোমরা কেউ আমাকে খবর দাও না। একা একা ভূতের মতো বসে থাকি আর ভাবি। মেয়েটা কেমন আছে?"

সংহিতা বলল, "বেশ ভাল আছে। একবার অপারেশন হয়েছে। ক'দিন পরে নিজের হাতে খেতে পারবে।"

"সত্যি? ও মা দুর্গা, তোমার কাছে মানত করেছি—।"

"দাঁড়াও। তোমার নিজের খাওয়া দাওয়া ঠিক হচ্ছে?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

"যা দিয়ে গেছ তাতে তো অনেকদিন চলে যাবে। আচ্ছা, তুমি, তোমরা, বাবুর এই ফোনে আমাকে খবর দিতে পারো না?" ঘর থেকে জয়ব্রতর রেখে যাওয়া মোবাইল নিয়ে এল প্রৌঢ়া।

সেটা লক্ষ করে মিলা বলল, "চার্জার কোথায়?"

"মানে?" প্রৌঢ়া বুঝতে পারল না।

"একটা তার তোমার বাবু পিছনে ঢোকায়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।" সেটা নিয়ে এল প্রৌঢ়া। মিলা চার্জে বসিয়ে দিয়ে বলল, "রোজ অন্তত আধঘণ্টা এইভাবে চার্জ করিয়ে রাখবে। তা হলেই কথা বলতে পারবে।"

সংহিতা প্রৌঢ়াকে বলল, "আমি একবার ওপরের ঘরে যাব।"

"যাও না।"

সংহিতা একাই ওপরে চলে এল। টিকলির পাশের দরজায় একটা প্রায় ছন্নছাড়া ঘর দেখতে পেল সে। কোনও কিছু গোছানো নেই। বিছানার চাদরেও ময়লাটে ছাপ। ওই প্রৌঢ়া করে কী? এই ঘরে কোনও বোহেমিয়ান শিল্পী বাস করলে বলার কিছু থাকে না কিন্তু জয়ব্রত কি বোহেমিয়ান? কখনওই নয়।

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাতে তাকাতে সে নিচু হয়ে খাটের তলায় চোখ রাখল। রাজ্যের জিনিসপত্র ধুলোয় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। ওখানে যে কতকাল ঝাঁট পড়েনি তা কে জানে! জয়ব্রত বলেছিল এই খাটের নীচে নাকি একটা প্যাকেট আছে, সেটা দেখতে হবে। হাত লাগাবে কিনা ভাবছিল সংহিতা, মিলার গলা পেল, "এ কী! ওভাবে বসে আছ কেন?"

"বিশল্যকরণী খুঁজছি।" সংহিতা হাসল।

"মানে?"

"খাটের নীচে প্রায় গন্ধমাদন পর্বত আছে। তার ভেতরে একটা প্যাকেট রেখেছেন জয়ব্রতবাবু। সেটা বের করে দেখতে হবে।" সংহিতা বলল।

পিছন থেকে প্রৌঢ়া এগিয়ে এল, "আমি দেখছি।"

মিলা বিরক্ত হয়ে বলল, "এই ঘরের এমন অবস্থা কেন?"

"কী করব দিদি। বাবু আমাকে এই ঘরে ঢুকতেই দিত না।" প্রৌঢ়া নিচু হয়ে জিনিসপত্র টেনে বের করতে লাগল। সুটকেস, যার রং ধুলো ঢেকে

দিয়েছে। কয়েকটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি, প্রচুর বই এবং পত্রিকা। সব শেষে বের হল ধুলোমাখা রোল করে রাখা একটা লম্বা প্যাকেট।

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কী?"

মিলা বলল, "আগে ওপরের ধুলো ঝেড়ে নাও।"

প্রৌঢ়া পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করল, "প্যাকেট ছিঁড়ব?"

মিলা বলল, "আমাকে দাও।"

লম্বাটে পিজবোর্ডের নলের মুখ খুলল সে। বলল, "মনে হচ্ছে ছবি।"

"ছবি?" সংহিতা অবাক হল। তার মনে পড়ল একসময় ওইরকম শক্ত পিজবোর্ডের বড় নলের মধ্যে ছবি পাঠানো হত। ততক্ষণে মিলা সন্তর্পণে ভেতর থেকে গোল করে রাখা ক্যানভাস বের করে ফেলেছে। সেটাকে টানটান করতেই চমকে উঠল সংহিতা! সে এতটাই অবাক হল যে, মেঝেতে বসে পড়ল। মিলা ছবি দেখে বলল, "বাঃ! দারুণ ছবি। কার আঁকা? এই ছবি জয়ব্রতবাবু এঁকেছিলেন? তুমি আগে দেখেছ?" প্রশ্নটা করে সংহিতার দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, "কী হল?"

সংহিতার মুখ তখন চৌচির। কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে। দু'হাতে মুখ ঢেকেও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। মিলা গলার স্বর নামাল, "ছবিটা তুমি চেনো?"

"হ্যাঁ।" ঠোঁট কামড়াল সংহিতা, "চিনি। খুব চিনি।"

"জয়ব্রতবাবু এত চমৎকার ছবি আঁকতেন?" মিলা মুগ্ধ হয়ে বলল।

উঠে দাঁড়াল সংহিতা, "এটা ওঁর আঁকা ছবি নয়।" ছবিটার চারটে কোণ এবং পিছন দিকটা ভাল করে দেখে বলল, "কোথাও ওঁর সিগনেচার নেই। অন্তত ওই অন্যায়টা উনি করেননি।"

"একটু খুলে বলো, আমি বুঝতে পারছি না।" খাটের ওপর ছবিটাকে রাখল মিলা।

"ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

"হ্যাঁ। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এটা তুমি এঁকেছ?"

নীরবে মাথা নাড়ল সংহিতা, হ্যাঁ।

"এত ভাল ছবি এভাবে পড়ে আছে কেন?"

"কী করে বলব! আমি জানতাম ছবিটা হারিয়ে গিয়েছে। জয়ব্রত নিজে যদি খাটের তলায় প্যাকেট খুলতে না বলত তা হলে জানতামই না।"

"কী করে হারিয়েছিল?"

"আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ছবির বিপণন আদৌ উন্নত ছিল না। এত গ্যালারিও তখন ছিল না। অ্যাকাডেমি বা দু'-একটা জায়গায় নিজেদের উদ্যোগে যে-এগজিবিশন হত তাতে দর্শক আসত হাতে গোনা, ক্রেতা খুব কম। সেসময় একটা ভাল ছবি পাঁচ হাজারে বিক্রি হলে আমরা খুব খুশি হতাম। আমাদের আগে অনেক বড় শিল্পী তো ফুটপাতের পাশের রেলিং-এ ছবি ঝুলিয়ে প্রদর্শনী করেছেন। ওই সময় জয়ব্রত আমাকে বলে দিল্লিতে একটা এগজিবিশনে ছবি দিতে। এই ছবিটা সে আমার কাছ থেকে নিয়েছিল দিল্লিতে পাঠাবে বলে।

"মাঝে মাঝে খোঁজ নিতাম ছবিটার ব্যাপারে। সে বলত ছবি বিক্রি হয়নি। যারা এগজিবিশন করেছিল তারা ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ছবিটার দেখা তখন পেলাম না। জয়ব্রত জানিয়েছিল ছবিটা নিয়ে যিনি ট্রেনে কলকাতায় ফিরছিলেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কেউ বোধহয় চুরি করে নিয়ে গেছে। শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এর মাস কয়েক পরে একটা স্যুভেনির আমার হাতে আসে। দিল্লিতে যে-এগজিবিশন হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য ছবিও সেখানে ছাপা হয়েছে। আমি দেখলাম আমার ছবিও ছেপেছে ওরা কিন্তু শিল্পীর নাম অমৃতা গুপ্তা। আমি অবাক হয়ে জয়ব্রতর কাছে ছুটে গেলাম। স্যুভেনির দেখে সে বলল, এটা ভুল করে হয়েছে। এটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অমৃতা গুপ্তা কে? সে বলেছিল ওই নামের কাউকে চেনে না। আমার মনে সন্দেহ হল। আমি অমৃতা গুপ্তার খবর জোগাড় করলাম। সে দিল্লির মেয়ে। জয়ব্রতর পূর্বপরিচিত। দিল্লিতে গেলে তার বাড়িতে সে ওঠে। ফোন নম্বর জোগাড় করে আমি অমৃতার সঙ্গে কথা বললাম। সে স্পষ্ট বলল, ছবিটা যখন আমার নামেই প্রদর্শিত হয়েছে তখন এ নিয়ে কথা বলব না। আপনার যদি কিছু জানার থাকে তা হলে জয়ব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।"

"আপনি জয়ব্রতর কথা বলছেন কেন? আমি জানতে চাইলাম।"

"ও আমার হয়ে ছবি কালেক্ট করে। সাধারণত আমি ওকে বলি হাফডান ছবি পাঠাতে। আমি ফিনিশ করে নেব। এ বছর—!"

"আপনি কি এর জন্যে ওকে পে করেন?"

ভদ্রমহিলা খুব জোরে হাসলেন, বললেন, "এই পৃথিবীতে কেউ কোনও

কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করে বলে শুনিনি। লাইন কেটে দিয়েছিল অমৃতা।”

“সেটা এমন বয়স যে, নিজের সৃষ্টির ওপর প্রচণ্ড মায়া জন্মে যায়। আমার আঁকা ছবি অন্যের নামে প্রদর্শিত হয়েছে, স্যুভেনির ছাপা হয়েছে, ছবিটা যে আমার তা প্রমাণও করতে পারব না। পাগলের মতো ছুটে গেলাম জয়ব্রতর কাছে। আমি যত অভিযোগ করি তত সে হাসে। বলে, সামান্য একটা ছবি যেটা হারিয়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? তোমার আঁকা ছবি দেখে যারা কপি করতে ওস্তাদ, তারা এমন কপি করে দেবে যে, বুঝতেই পারবে না, কোনটা আসল কোনটা নকল। ভুলে যাও।”

“কত টাকা পেয়েছ তুমি?”

“টাকা? আমি কী করে টাকা পাব?”

“আমার ছবি ওর নামে চালাবার সুযোগ দিয়ে—!”

“কী আজেবাজে কথা বলছ?”

“আমি অনেক ঝগড়া করেছি, কেঁদেছি, কিন্তু সে স্বীকার করেনি। কী করে অমৃতার নামে আমার ছবি প্রদর্শিত হল? না, ভুল হয়ে গিয়েছে। উদ্যোক্তারাই নাকি ভুল করেছে।

“কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে ওর দু’জন ছাত্রী আমার কাছে এল। তাদের আঁকা অর্ধসমাপ্ত ছবি জয়ব্রত দেখতে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। তারপর আর প্রমাণের দরকার হয়নি। যাকে ভালবেসেছিলাম সে এত বড় বেইমানি করবে কল্পনা করতে পারিনি।”

মিলা চুপচাপ শুনছিল। বলল, “এই ছবিটা যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে এখানে এল কী করে?”

“আমি জানি না।” সংহিতা বলল।

“জয়ব্রতবাবু কি নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে এটা দিল্লি থেকে ফেরত এনেছেন?”

“কিছুই জানি না। তবে মহিলা নিশ্চয়ই বিনা পারিশ্রমিকে কিছু করেননি। যে-টাকায় কিনেছিলেন বিক্রি করার সময় অনেক বেশি চাইবেন। জয়ব্রত সেটা জোগাড় করে কেন ছবি কিনবে? কিনলে এভাবে ফেলে রাখবে কেন?” বলতে বলতে সংহিতার খেয়াল হল, “আচ্ছা, ওই পাখির দুই পায়ের মধ্যে বাংলা ‘স’ লেখা আছে কিনা দেখো তো?”

মিলা দেখল। পাখিটা একটা ভেসে যাওয়া কাঠের টুকরোর ওপর বসে

আছে। তার দুটো পায়ের মাঝখানে কোনও বাংলা অক্ষর নেই। স—তো নয়ই। সেটা শুনে সংহিতা নিজে ছবি দেখল। দেখে বলল, "এ ছবি আমার আঁকা নয়।"

"কী বলছ?" অবাক হয়ে গেল মিলা।

"হ্যাঁ। আমার অরিজিন্যাল ছবি থেকে কপি করা হয়েছে। যারা ভাল কপি করে তাদের নিশ্চয়ই জয়ব্রত চিনত। উঃ, মাগো!"

"এমন হতে পারে সেই অমৃতাই কপি করে দিয়েছে জয়ব্রতকে। আর সেটা যে অরিজিন্যাল নয় তা বুঝতে পারেনি জয়ব্রত। চলো, অনেক বেলা হয়ে গেছে।" মিলা ছবিটাকে আবার কাগজের নলের ভেতরে ঢুকিয়ে নিল।

"ওটা নিচ্ছ কেন?"

"থাক না। ওই যে কথা আছে, যাকে রেখে দিয়েছ সেও একদিন তোমাকে রাখতে পারে।" মিলা হাসল।

প্রৌঢ়াকে আর এক প্রস্থ বুঝিয়ে ওরা গাড়িতে উঠল। সংহিতা মাথা নাড়ল, "তিরিশ বছর আগে যে-ধাক্কাটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল মারাত্মক। আজ অন্য রকমের ধাক্কা পেলাম।"

মিলা কিছু বলল না। শুধু সংহিতার হাতটা চেপে ধরল।

সিক্তার একটা ভাল গুণ হল বাড়িতে ঢোকামাত্র সে যাবতীয় সমস্যার ঝাঁপি সামনে নিয়ে আসে না। আজও দুপুরের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর খাতাটা সামনে আনল, "পাঁচজন ফোন করেছিল।"

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে খাতার পাতা খুলল সংহিতা। প্রথম ফোন, যদিও একই ব্লাড গ্রুপ নয় তবু দেখা করতে চায়। দ্বিতীয় জন জানিয়েছে তার একই ব্লাড গ্রুপ। কিন্তু দশ লক্ষ টাকার নীচে রাজি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ ফোন যারা করেছিল তারা কেন করেছে জানায়নি। পঞ্চম ফোন যিনি করেছিলেন তিনি মহিলা। পঁচিশ বছর বয়স। যদি দিন সাতেকের বেশি শুয়ে না থাকতে হয় তা হলে তিনি দিতে পারেন। ব্লাড গ্রুপও মিলে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা টাকার কথা লেখেননি।

মিলাকে দেখাল খাতাটা। চোখ বুলিয়ে মিলা বলল, "পাঁচ নম্বরের সঙ্গে কথা বলো। মনে হচ্ছে কাজ হবে। কী নাম লিখেছে? ঝরনা মিত্র। দেখো।"

ফোন করল সংহিতা। যে-মহিলা ফোন ধরলেন, তিনিই পাঁচ নম্বরে আছেন।

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি বোনম্যারোর ব্যাপার জানেন?"

"হ্যাঁ। আমার হাড়ের ভিতর যে-মজ্জা আছে তা বের করে আর এক জনের হাড়ের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তাই তো?"

"হ্যাঁ, প্রায় সেই রকমই।"

"কিন্তু আমি সাতদিনের বেশি বাড়ির বাইরে থাকতে পারব না।"

"বোধহয় ততদিন লাগবে না।"

"কত টাকা পাওয়া যাবে?"

সংহিতা শক্ত হল, "আপনি কত টাকা চান?"

"দু'লক্ষ।"

এক মুহূর্ত ভাবল সংহিতা, "ঠিক আছে। রাজি। কাল সকালে আসতে পারবেন?"

"কাল সকালে? ঠিক আছে। আমাকে অর্ধেক টাকা অগ্রিম দিতে হবে। কাজ হয়ে গেলে ঘোরাবেন না।"

"শুনুন। আগে ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করুন। তিনি যদি আপনাকে ডোনার হিসেবে গ্রহণ করেন তা হলে টাকা আপনি পেয়ে যাবেন।"

"কোথায় যেতে হবে।"

"ঠাকুরপুকুরের ক্যান্সার হসপিটালে।" সংহিতার কথা শেষ হওয়ামাত্র ফট করে লাইন কেটে দিল ঝরনা মিত্র। সংহিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "আরে!"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "কী হল?"

"ঠাকুরপুকুরের নাম শোনামাত্র রিসিভার নামিয়ে রাখল মহিলা।"

"সে কী?" মিলা বলল, "আবার করো তো!"

সংহিতা ফোন করে শুনল সুইচ অফ! অর্থাৎ লাইন কেটে দিয়েই ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন মহিলা।

মিলা বলল, "আমার মনে হচ্ছে ওই মহিলার পক্ষে ঠাকুরপুকুরে যাওয়া কোনও কারণে সম্ভব নয়। দাঁড়াও হাসপাতালের রিসেপশনে ফোন করি।"

লাইন পাওয়া খুব মুশকিল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া যেতে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনাদের ওখানে ডোনার হিসেবে ঝরনা মিত্র বলে কেউ আছেন?"

"আপনি কে বলছেন?"

"আমাদের একজন পেশেন্ট এই মুহূর্তে আপনাদের ওখানে রয়েছেন।"

"কী চান বলুন?"

"এই ভদ্রমহিলা কি আপনাদের পরিচিত?"

"না।" ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

মিলা সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। বিকেলে নার্সিংহোমে যাওয়ার আগে সে আবার ঝরনা মিত্রকে ফোন করল। এবার রিং হল। তারপর একটি পুরুষকণ্ঠ জানান দিল। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "ঝরনা মিত্র আছেন?"

"ও এখন বাথরুমে। কে বলছেন?"

"আমার নাম সংহিতা। আমি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম বোনম্যারোর ডোনার চেয়ে। আমার আত্মীয়ের জন্যে দরকার। উনি টেলিফোন করেছিলেন।"

"ঝরনা টেলিফোন করেছিল?"

"হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?"

"আমি ওর হাজব্যান্ড। কী বলেছে ও।"

"উনি রাজি হয়েছেন। যে-টাকা চেয়েছেন তা আমরা দেব।"

"আপনার পেশেন্ট কি এখন হাসপাতালে?"

"হ্যাঁ। ঠাকুরপুকুরে।"

"সে যাবে বলেছে?"

"পরে বলবেন বলেছেন।"

"আমি আপনাকে পাঁচ মিনিট পরে ফোন করছি।" ভদ্রলোক ফোন রেখে দিলেন।

মিলা সংহিতাকে বলল, "দারুণ একটা নাটক হবে মনে হচ্ছে।"

সংহিতা বলল, "ঝরনা তো বলেনি পরে বলব।"

"ওটা না বললে নাটকটা জানা যেত না।"

ঠিক ছয় মিনিট পরে ফোন এল, "আমি অজিত মিত্র বলছি। আপনি এখনই ওকে ফোন করে বলুন পেশেন্টকে ঠাকুরপুকুর থেকে ট্রান্সফার করেছেন। বোধহয় ও আপত্তি করবে না।"

"ঠাকুরপুকুরে ওর অসুবিধে কেন হচ্ছে?"

"কারণ আমি ওখানে চাকরি করি। ঝরনা ঠাকুরপুকুরে গেলে আমি জানতে

পারব বলে যাবে না। সাতদিনের জন্যে ও তিন-চার মাস অন্তর বাপের বাড়ি যায়। মনে হচ্ছে তখনই এইসব টাকার জন্যে করে। আমাদের ওইভাবে টাকা রোজগার করার দরকার নেই। কত টাকা চেয়েছে?"

"দু'লক্ষ।"

"আমি এসবের কিছুই জানি না। কেন টাকা রোজগার করছে, কার জন্যে করছে তা ওই জানে। আমি এখন অন্য মোবাইল থেকে কথা বলছি। ও যদি যেতে রাজি হয় তা হলে দয়া করে আমাকে জানাবেন?"

"উনি বাপের বাড়িতে গেলেই তো জানতে পারবেন।"

"ও মাসে একবার যায়। কিন্তু প্রতিবার তো ডোনেট করে না।"

"ঠিক আছে।"

"আর একটা কথা, ওর সুগার খুব বেশি।"

"অনেক ধন্যবাদ।" ফোন রেখে দিল মিলা।

সংহিতা দাঁড়িয়েছিল। মিলা গল্পটা শোনাল।

"ভদ্রমহিলার টাকার এত দরকার যে, স্বামীকে লুকিয়ে ডোনার হতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ। সেই লুকিয়ে রোজগার করা টাকা দিয়ে কী করবেন তা নিয়ে ভাবলে অনেক গল্প তৈরি হয়ে যাবে। অতএব শ্রীমতী ঝরনা মিত্র বাতিল।"

ছবি আঁকার সময় পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রে মন বসাতে পারছে না সংহিতা। মিলার মনে আঁকতে না পারার জন্যে কোনও কষ্ট হচ্ছে কিনা বুঝতে পারে না সে।

আটদিনের মাথায় দ্বিতীয়বার অপারেশন করলেন ডক্টর মালহোত্রা। এবার নিম্নাঙ্গে। অপারেশনের পর তিনি খুব খুশি।

এদিকে জয়ব্রতর ডাক্তার কেবলই তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। দিশেহারা অবস্থা সংহিতার। একদিন মিলাকে নামিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময় ড্রাইভার ছেলেটি গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, "ম্যাডাম, আমি বোনম্যারো দিতে চাই।"

চমকে উঠল পিছনের আসনে বসা সংহিতা, "তুমি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। আপনারা রোজ যে-কথা বলেন, তা শুনতে শুনতে মনে হল নিজের রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে দেখি। কাল রিপোর্ট পেয়েছি, এ নেগেটিভ।

আমার তো কোনও অসুখ নেই। যদি আমার ম্যারো দিয়ে ওই মানুষটার প্রাণ বাঁচে—!"

"তোমার বাড়ির লোক রাজি হবে তো?" সংহিতা রীতিমতো উত্তেজিত।

"বাড়ির লোক বলতে শুধু মা। মাকে মাসির বাড়িতে রেখে দেব। বলব বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। আমাকে নিশ্চয়ই খুব বেশি দিন হাসপাতালে থাকতে হবে না।" ছেলেটি বলল।

"না। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।"

"তা হলে আজই ডাক্তারবাবুকে বলুন। আমি আপনার জন্যে বদলি ড্রাইভার দিয়ে দেব।" ছেলেটি বেশ খুশি হয়ে বলল।

"এই জন্যে তুমি কত চাও?"

"টাকা! আপনি যা মনে করেন তাই দেবেন।"

"আমি একজনকে দু'লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু তার দ্বারা হবে না।"

"বাপস। না না, অত টাকা নিয়ে আমি কী করব? আপনি আমাকে একই দেবেন। কিন্তু ম্যাডাম, আমার শরীর ঠিক থাকবে তো?"

"তুমি আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে চলো। তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন।"

বিশাল একটা ভার নেমে গেল মাথার ওপর থেকে। এখন একটাই প্রার্থনা, রক্তের গ্রুপ যখন এক তখন অন্য টাইপগুলো যেন মেলে।

হাসপাতালে গিয়ে নার্সের মুখে খবরটা শুনতে পেল সংহিতা। কাল কেমো নিতে পারেনি জয়ব্রত। এটা ভাল লক্ষণ নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকদিনে একটু সামলে নিয়ে আবার চিকিৎসায় ফিরে আসা কেসের অভাব নেই। সে ডাক্তারের কাছে ছুটল। তাঁকে জানাল, "বোনম্যারোর ডোনার পেয়ে গেছি। আমি জানতাম না যে, আমার গাড়ির ড্রাইভারের ব্লাড গ্রুপ এ নেগেটিভ।"

"গুড। কিন্তু এখন আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে।"

"কেন?"

"ওঁর শরীরের অবস্থার অবনতি হয়েছে। রোজ ক্রমাগত রক্ত দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু—। ওঁর নাকে দেখবেন লালচে রক্ত চলে আসছে। চব্বিশ ঘণ্টার পর আমি আপনাকে সঠিক অবস্থা বলতে পারব।" ডাক্তার বললেন।

খুব নার্ভাস বোধ করল সংহিতা। জিজ্ঞাসা করল, "খারাপ কিছু, আই মিন—!"

"আমি চেষ্টা করছি। আমাদের হাসপাতালের অন্য কয়েকজন ডাক্তারও জয়ব্রতবাবুর কেস নিয়ে ভাবছেন। মুশকিল হল, উনি অনেক দেরিতে এখানে এলেন। আমরা এখন বলতে পারি ক্যান্সার প্রথম স্টেজে ধরা পড়লে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে রোগটাকে আটকে দেওয়া যায়। জয়ব্রতকে যখন এনেছেন তখন তাঁর অসুখ তৃতীয় স্তরে পৌঁছে গেছে।" ডাক্তার বললেন।

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সংহিতার। একটা মানুষ, সে যতই অন্যায় করুক, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে অথচ কারও কিছু করার নেই। জয়ব্রত যদি হোমিওপ্যাথিতে চলে না যেত তা হলে হয়তো সমস্যা এত প্রবল হত না। ওদিকে টিকলি খুব ভাল উন্নতি করছে। ডক্টর মালহোত্রা খুব খুশি। জলের মতো টাকা খরচ করছে মিলা।

শেষ পর্যন্ত জয়ব্রত চলে গেল। যাওয়ার আগে তার চেতনা ফিরে আসেনি। তিন দশক আগে সংহিতা কল্পনাও করেনি ওর শেষকৃত্যে তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। হাসপাতাল থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে মিলাই উদ্যোগ নিয়েছিল।

মাস দেড়েক পরে টিকলিকে নার্স ধরে ধরে হাঁটাতে পারল। প্রচণ্ড উৎফুল্ল টিকলি। আনন্দিত মিলাও। আর দুটো অপারেশন বাকি রয়েছে। ডক্টর মালহোত্রা বলেছেন চোখের বড় সার্জেনের সঙ্গে কথা বলতে। ওঁর কাজ শেষ হলে দরকার পড়লে চেন্নাই নিয়ে যেতে পারে টিকলিকে।

সন্ধেবেলায় সংহিতা অবাক হল। মিলা তার পুরনো মদের বোতলটা বের করে গ্লাসে ঢালছে। তাকে দেখে বলল, "আজ সেলিব্রেট করছি। খাবে?"

"নাঃ।" সংহিতা বলল, "হঠাৎ সেলিব্রেশনের কী হল?"

"বাঃ। মেয়েটা হাঁটছে। কিছুদিনের মধ্যে নিজেই হাঁটতে পারবে। গ্রিপ করতে পারছে। যখন দেখেছিলাম তখন এরকম করতে পারবে বলে ভাবতে পেরেছিলে? তাই আজ উৎসব।"

"কিছুদিন থেকে একটা কথাই মাথায় পাক খাচ্ছে।"

"বলো।"

"ডক্টর মালহোত্রা যখন ওকে ছেড়ে দেবেন, তখন কোথায় যাবে? ওই কাজের লোকের সঙ্গে তো থাকা সম্ভব নয়।" সংহিতা বলল।

মিলা জবাব না দিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল।

"কিছু বলছ না যে!" সংহিতা প্রশ্ন করল।

"বলছি না কারণ উত্তরটা আমার জানা নেই।"

"তুমি এত করলে—।"

"দেখো, টিকলির জন্যে আমি কিছু করিনি।"

"এটা তোমার বিনয়।"

"আদৌ নয়। আমি যা করেছি তা নিজের জন্যে।"

"তার মানে?"

"আমার মনে হয়েছিল করলে ভাল লাগবে তাই করেছি।"

সংহিতা মিলাকে বুঝতে পারছিল না। সে কথা না বাড়িয়ে সিক্তাকে ডেকে এক কাপ কফি দিতে বলল।

গ্লাস শেষ করে মিলা, "এবার কলকাতায় অনেকদিন থাকা হয়ে গেল। এই শহরে এতটা সময় একনাগাড়ে থাকার কথা ইদানীং ভাবিনি। যাক গে, শোনো, আমি কাল দুপুরের ফ্লাইটে মুম্বই যাচ্ছি। ওখান থেকে গোয়া। আমার এক প্রৌঢ় গোয়ানিজ প্রেমিক সমুদ্রের ধারে চমৎকার কটেজে থাকে। ওর ওখানে ক'দিন থাকব। দারুণ ব্যাঞ্জো বাজায় লোকটা।"

"তারপর?" বড় চোখে মিলাকে দেখল সংহিতা।

"আমি জানি না ওখানে ক'দিন ভাল লাগবে থাকতে। না লাগলে মুম্বই ফিরে এসে ভিয়েনায় চলে যাব। দু'মাস পরে আমার এগজিবিশন। তার জন্যে তৈরি হতে হবে।"

"তুমি এদেশ থেকে চলে যাবে?" সংহিতার গলায় হতাশা চাপা থাকল না।

"মানে? আমি প্রত্যেক বছর বেড়াতে আসি, থাকি তো বাইরে।" মিলা হাসল।

"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে?"

"দেখো, এখন আমার এখানে কোনও কাজ নেই। দু'বেলা নার্সিংহোমে যাওয়াটাকে এখন অন্তত কাজ বলতে পারো না।"

"টিকলির কী হবে?"

"আশ্চর্য! এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেন দিতে হবে?"

রেগে গেল সংহিতা, "তুমি ওর জন্যে এত করলে, কী পরিমাণ টাকা খরচ

করলে, কেন করলে? ওকে তুমি চিনতে না। হঠাৎ—! এখন মেয়েটা একটু একটু হাঁটতে পারছে, ধরতে পারছে। ডক্টর মালহোত্রা বাকি কাজগুলো করে ফেললে ওর শরীর শেপে আসবে। তারপর বছরখানেক সময় পার হলে মুখের কপালের পোড়া জায়গাগুলো ঠিকঠাক করে দেবেন। তুমি ওকে সুস্থ জীবনে ফেরার আশা দেখিয়ে চলে যাচ্ছ। তাই যদি যাবে তা হলে এসব না করলেই পারতে!"

"শোনো। মেয়েটা একটা স্তূপের মতো পড়ে ছিল। ওর বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত। মনে হয়েছিল ওর জন্যে কিছু করলে আমার ভাল লাগবে। আমি যদি না যেতাম তা হলে জয়ব্রতবাবু মরে যাওয়ার পর ওর কী হবে তা নিয়ে আমি যেমন ভাবতাম না, তুমিও না। ওকে একটু একটু করে মানুষের চেহারায় ডক্টর মালহোত্রা ফিরিয়ে আনতেন না যদি আমি পাশে না দাঁড়াতাম। আমি যা করেছি তা নিজেকে খুশি করার জন্যে করেছি। আমি এখন বেঁচে থাকি নিজের জন্যে। কাউকে আনন্দিত করার মিশন আমার নেই। দিনের পর দিন পুরুষ বন্ধু, বিভিন্ন নেশা, শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে যে-আনন্দ পেতাম তা আমারই আনন্দ। হঠাৎ মনে হল টিকলিকে নিয়ে যে-আনন্দ আমি পেতে পারি তা আগের আনন্দগুলো থেকে আলাদা। তাই আমি পছন্দ করলাম। টিকলি আমাকে তুমি ভেবে কথা বলে, ওই অভিনয় করতে বেশ মজা লাগে আমার। কিন্তু ক্রমশ এই আনন্দ আমার কাছে আকর্ষণ হারাচ্ছে। পুরুষ বন্ধু বা নেশার ক্ষেত্রে যখন অরুচি এসে যায়, তখন আমি সরে যাই। হ্যাঁ, আমি চাই মেয়েটা হাঁটাচলা করুক। চোখে দেখুক। কতটা পড়াশুনো করেছে তা জানি না! পড়াশুনো থাকলে চাকরি করুক। কিন্তু এগুলো আমি নিজের হাতে পাশে থেকে করাতে পারব না। আমি ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। কিন্তু ডক্টর মালহোত্রার যাবতীয় বিল, নার্সিংহোমের খরচ ছাড়াও ওর চোখের অপারেশনের জন্যে যা লাগবে তা আমি দেব। আমি নিজের ক্লান্তির জন্যে সরে যাচ্ছি, পালিয়ে যাচ্ছি না। আন্ডারস্ট্যান্ড?" মিলা তার শূন্য গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢালল।

"ঠিক আছে। কিন্তু এখন ওর পাশে কে থাকবে? কে সঙ্গ দেবে?"

"নার্স আছে। ডাক্তার আছেন। আমি যখন নিজে থাকছি না, তোমাকে থাকতে বলব না।"

"ও তো তোমার খোঁজ করবে!"

"আমার নয়, তোমার। হলুদ শাড়ি পরা মহিলার নাম সংহিতা তা ও জানে।"

"তারপর? নার্সিংহোম যখন ওকে ছেড়ে দেবে অথচ বাকি অপারেশনগুলো কিছুটা সময়ের পরে করাতে হবে তখন ও কোথায় থাকবে? কাজের লোক পারবে ওর দেখাশোনা করতে? ওর খাওয়া ইত্যাদির খরচ কে দেবে?"

"ওটা আমার দেখার কথা নয়। নো!"

"তুমি লাখ লাখ টাকা খরচ করেছ, ভবিষ্যতে করবে—!"

"সেটা ওর চেহারাটাকে মানুষের মতো করে তোলার জন্যে। এক চুমুক খেয়ে নিয়ে মিলা বলল, "ওয়েল, কোনও আশ্রমে টাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। তার জন্যে যা লাগবে—!"

মিলাকে থামিয়ে দিল সংহিতা, "ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

মিলা সোজা হল, "রাখো এসব কথা। একটা গান বাজাও। সলিল চৌধুরীর কোনও সিডি আছে। ফ্যান্টাস্টিক। রাগ কোরো না, প্লিজ। আছে সলিল চৌধুরী?"

আজকের রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেল না সংহিতা। খাওয়ার কথা খেয়ালেই ছিল না। কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না মন। বিছানায় শরীর এলিয়েও যখন দু'চোখের পাতা এক হল না, তখন উঠে আঁকার ঘরে চলে এল। অনেকদিন পরে সেই অর্ধসমাপ্ত ছবির ক্যানভাসের সামনে দাঁড়াল সে। তুলি হাতে নিয়ে কখন রাতটা কেটে গেল সে বুঝতেও পারল না।

সকালে চায়ের সময় মিলা জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে তোমার? ঘুমোওনি?"

সংহিতা হাসল, কথা বলল না।

"তোমরা বাঙালিরা এত সেন্টিমেন্টাল—!" জিভে শব্দ করল মিলা।

"তুমি বাঙালি নও?"

"কী মনে হয় তোমার? পৃথিবীর যে কোনও দেশই আমার দেশ। দাঁড়াও ফোনটা করে নিই।" কলকাতায় এসে কেনা মোবাইল ফোন বের করল মিলা।

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "ওই ফোন এখনও সুইচ অফ করে রাখার কী দরকার?"

"গোয়াপর্ব চুকে গেলে ওটা অন করব।"

নার্সিংহোমে ফোন করল মিলা। সে বোধহয় গতকাল বলে এসেছিল এখন পর্যন্ত কত খরচ হয়েছে তার হিসেব করে রাখতে। অঙ্কটা শুনে বলল, "এখনও অনেক টাকা আপনাদের কাছে জমা আছে। আপনি হিসেবটা রেডি রাখবেন।"

ফোন রেখে সংহিতাকে বলল সে, "দুটো অনুরোধ করব। তুমি নিশ্চয়ই নার্সিংহোমে যাবে। ওদের কাছ থেকে হিসেবের কাগজটা নিয়ে নিয়ো।" তারপর ছোট্ট পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল, "এতে টেলিফোন, মেল নম্বর রয়েছে। ভিয়েনার ঠিকানাও। টিকলির অপারেশনের ব্যাপারে যখনই টাকার দরকার হবে আমাকে ফোন অথবা মেল করে দিয়ো। ভারতে না থাকলে ওগুলো খোলা থাকে। রোজ মেল চেক করি। তোমার কাছ থেকে খবর পেলেই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। ও.কে?"

সংহিতা কার্ডটা তুলে চোখ বোলাল।

"পারলে একবার চলে এসো ভিয়েনায়। তোমার ভাল লাগবে।"

"দেখি!" তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আজ যাওয়ার আগে টিকলির সঙ্গে দেখা করে যাবে নিশ্চয়ই। তারপর ওখান থেকে এয়ারপোর্টে চলে যেয়ো। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।"

"দরকার নেই। তোমার সিকিউরিটিকে বললে ট্যাক্সি ডেকে দেবে এয়ারপোর্টের জন্যে।"

"তার মানে? নার্সিংহোমে যাবে না?"

শব্দ করে হাসল মিলা, "গিয়ে কী করব? নাটক? ওসব আমার পোষায় না।"

যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল মিলা। যাওয়ার আগে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে গেল।

মিলা বেরিয়ে গেলে স্নান করল সংহিতা। করার পর শরীরটা একটু ভাল লাগল। যাব না যাব না করতে করতে শেষ পর্যন্ত নার্সিংহোমে গেল সে। নার্সের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্যাসেজে। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি কোথায়?"

"কেন?"

"সকাল ন'টা থেকে কেবল হলুদ শাড়ির খোঁজ করছে।"

"ওকে খুব জরুরি কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে। এখন থেকে তাই আমাকেই আসতে হবে। আপনাকে অনুরোধ করব কথাটা যেন ওকে না বলেন।"

"কিন্তু—!"

"আমাকেই হলুদ শাড়ি বলে যাতে ও অ্যাকসেপ্ট করে তা দেখবেন।"

"কিন্তু গলার স্বর শুনে তো বুঝতে পারবে।"

"বলবেন, আমার সর্দি হয়েছে, গলার স্বর একটু বসে গেছে।"

"আচ্ছা!"

কেবিনে ঢুকে নার্স বললেন, "এই যে তোমার হলুদ শাড়ি এসে গেছে।"

"তাই?" মুখ ঈষৎ ঘুরল টিকলির। অপারেশনের পরে এটা সম্ভব হয়েছে।

"কিন্তু তুমি ওকে বেশি কথা বলাবে না। সর্দিতে গলা বসে গেছে ওর।"

"ওমা! কেন সর্দি হল?"

টিকলির পাশের টুলে বসল সংহিতা। গলার স্বর যতটা সম্ভব ভেঙে বলল, "ঠান্ডা গরমে। খুব গরম পড়েছে।"

"এখানে এসি চলছে, না?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তুমি বেশি কথা বোলো না। আমার হাত ধরে থাকো।"

তিরিশ পেরিয়ে যাওয়া মেয়ে কথা বলছে প্রায় বালিকার মতো। সংহিতা তার হাত ধরল। একটু পরেই টিকলি বলল, "তোমার হাত আজ অন্যরকম লাগছে। নরম নরম। তোমার কি জ্বর হয়েছে?"

"না, সর্দিতে।"

"ওষুধ খেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা বাবা এখন বোম্বের হাসপাতালে কেমন আছে?"

নার্সের দিকে তাকাল সংহিতা। নার্স বললেন, "কালই তো উনি বলে গেলেন তোমার বাবার অপারেশন হবে।"

"এখনও হয়নি?"

এই গল্পটা যে মিলা তৈরি করে গেছে তা তাকে বলেনি।

সংহিতা বলল, "বোধহয় আগামীকাল হবে।"

"আমার খুব ভয় করছে।"

"কেন?"

"বাবার যদি কিছু হয়ে যায়!"

"কিচ্ছু হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না।"

"আমি যদি চোখে দেখতে পেতাম তা হলে বাবার কাছে চলে যেতাম।"

"নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।"

"তুমি কি আবার ভিয়েনায় চলে যাবে?"

"না। কোথাও যাব না।"

সঙ্গে সঙ্গে সংহিতার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল টিকলি।

দুপুরে 'কলকাতা কলকাতা' বইতে বেশ কয়েকটা আশ্রমের নম্বর পেয়ে গেল সে। অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, প্রতিবন্ধীদের জন্যে আশ্রম। মা-বাবা না থাকলে অনাথ বলা হয়, কিন্তু অনাথ আশ্রমে ফোন করে জানা গেল তারা টিকলিকে অনাথ বলতে রাজি নয়। বৃদ্ধাশ্রমে জায়গা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিবন্ধীদের আশ্রমে ফোন করে জানা গেল টিকলিকে তারা গ্রহণ করতে রাজি আছে কিন্তু চোখের অপারেশনের পর দৃষ্টি ফিরে পেলে আশ্রম ছেড়ে দিতে হবে। তারা প্রতি মাসে যে-টাকা নেবে তা আদৌ বেশি নয় বলে মনে হল সংহিতার। ওই টাকায় ওরা কী পরিষেবা দিতে পারে তাতে সন্দেহ হলেও সে আগামীকাল দেখতে যাবে বলে স্থির করল।

তারপরই মনে হল টিকলি যদি নিজের বাড়িতে থাকে তা হলে কেমন হয়! একজন আয়া রেখে দিলে সে টিকলিকে সবরকম সাহায্য করবে। ওই প্রৌঢ়া এখনও প্রায় প্রতিদিন তাকে ফোন করে খোঁজখবর নেয়। টিকলি থাকলে নিশ্চয়ই সব সুবিধে-অসুবিধে প্রৌঢ়া দেখবে। এর জন্যে যে-খরচ হবে তা না হয় সংহিতাই দিয়ে দেবে। এই দুটোর মধ্যে কোনটা মেয়েটার পক্ষে বেশি ভাল হবে তা প্রতিবন্ধী আশ্রমে যাওয়ার পর সে ঠিক করতে পারবে।

বিকেলেও নার্সিংহোমে গেল সে। গিয়ে শুনল ডক্টর মালহোত্রা মাস তিনেকের জন্যে টিকলিকে বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন। যদি আগামীকাল ওকে সংহিতা নিয়ে যায় তা হলে ভাল হয়। নার্সিংহোম মিলার জমা দেওয়া টাকা ফেরত চাইলে দিন কয়েক পরে চেকে ফেরত দেওয়া হবে।

খবরটা টিকলির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সে পাশে গিয়ে বসতেই টিকলি বলল, "কাল আমি বাড়িতে যাব?"

"হ্যাঁ। কয়েক মাস পরে আবার আসতে হবে।"

"কিন্তু হলুদ শাড়ি, বাবা তো বাড়িতে নেই।" টিকলি বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করল।

"হ্যাঁ। সেটাই ভাবছি।"

"এক কাজ করো। তুমি আমাদের বাড়িতে চলে এসো।"

হেসে ফেলল সংহিতা, হেসে ওর হাত ধরল।

ওরা হাঁটছিল। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য সবে দেখা দিয়েছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে দ্রুত। বৃদ্ধ হাঁটতে পারছিলেন না আর। তার ওপর শরীরের ভার রেখে খুঁড়িয়ে চলছিলেন। একসময় বললেন, "না। আর পারব না। আমাকে এখানে রেখে তুমি চলে যাও।"

সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি স্বর্গে যাবেন না?"

"আমার কপালে নেই। আমি আর হাঁটতে পারছি না।" বৃদ্ধ ককিয়ে উঠলেন।

"ঠিক আছে। আপনি বিশ্রাম নিয়ে নিন, আমি অপেক্ষা করছি।" সে বলল।

"তুমি আমাকে চেনো না, জানো না, তবু আমার জন্যে এত করছ?"

সে জবাব না দিয়ে আরও কয়েক পা হাঁটতেই বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধের শরীর তখন এলিয়ে পড়েছে। বাঁক ঘুরতেই সে দৃশ্যটা দেখতে পেল। বিশাল খাদের ওপর একটি সাঁকো ঝুলছে। সেই সাঁকোর ওপর কোনও রেলিং নেই। সাঁকোর ওপারে লম্বা গাছ এবং চোখ জুড়িয়ে যাওয়া মাঠ দেখা যাচ্ছে। খাদের নীচ থেকে প্রচণ্ড শব্দ ওপরে উঠে আসছে। বৃদ্ধকে নিয়ে সে খাদের ধারে চলে আসতেই দেখতে পেল ওই গাছগুলোর পাশ দিয়ে সুন্দর জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। অথচ এই খাদের ভেতর থেকে গর্জনের সঙ্গে উঠে আসছে গরম বাতাস। এই সময় আকাশবাণী হল, "স্বর্গে প্রবেশের আগে ওই সাঁকো পার হতে হবে। যারা মনুষ্যজীবনে কোনও গর্হিত কাজ করেনি, অহংকার, ঈর্ষা বা স্বার্থপরতায় আক্রান্ত হয়নি, কাউকে প্রবঞ্চনা করেনি, গরিব দুঃখী অসুস্থ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছে, তারাই ওই সাঁকোতে ওঠার

অধিকারী। ওই সাঁকো পার হলেই তোমাদের মন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠবে। তখন ওই জলের ধারায় সেই তৃষ্ণা চিরকালের জন্যে মিটিয়ে নেবে। ওই জলে অবগাহন করলে তোমরা নির্মল, পবিত্র হয়ে উঠবে। তারপর জানিয়ে দেব স্বর্গের কোন দরজা তোমাদের জন্যে খোলা থাকবে।"

আকাশবাণী থেমে যেতেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। যে-বৃদ্ধ এতক্ষণ শারীরিক অক্ষমতায় কাতর ছিলেন তিনি ছিটকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দ্রুত সাঁকোর দিকে হাঁটতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর শরীরের যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তা একত্রিত করে তিনি সাঁকো পার হতে চান। সে পিছন থেকে ডেকে সতর্ক করল, "ওইভাবে যাবেন না। আপনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বললেন, "আমারটা আমাকেই ভাবতে দাও।"

সে দেখল বৃদ্ধ দ্রুত সাঁকোর ওপর উঠে পড়লেন। কিন্তু খানিকটা এগোতেই সাঁকো দুলতে লাগল! কোনও ধরার জায়গা নেই। বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে এগোবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সাঁকোর মাঝখানে গিয়ে তিনি আর পারলেন না। সাঁকো এমন দুলতে লাগল যে, বৃদ্ধ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সেতু থেকে নীচে পড়তে পড়তে কোনওরকমে দুই হাতে সেতুর একটা পাটাতন আঁকড়ে ঝুলতে লাগলেন।

সে দেখল যে-কোনও মুহূর্তে বৃদ্ধ নীচে পড়ে যাবেন। বৃদ্ধকে বাঁচাতে সে দৌড়াল। সাঁকো পায়ের নীচে প্রবলভাবে কাঁপছে। বৃদ্ধর কাছে পৌঁছোতে যেন অনন্ত সময় লেগে গেল তার। তারপর নিচু হয়ে বৃদ্ধের হাত ধরতেই তার মুঠো আলগা হয়ে গেল। সে দেখল নীচে প্রচণ্ড তপ্ত নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর তরল পদার্থ দেখতে খুবই ভয়ানক। সেখানে বৃদ্ধের শরীর পৌঁছোলে মুহূর্তমাত্র দেরি হত না গলে যেত। সে দু'হাতে বৃদ্ধকে টেনে তুলল সাঁকোর ওপর। বৃদ্ধ তখন বাক্‌রহিত।

তখনই আকাশবাণী হল, "হে বৃদ্ধ। সারাজীবন যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করে তুমি ওই স্বর্গে বাস করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলে। কিন্তু এই সাঁকো দর্শনমাত্র তোমার মনে লোভ জন্ম নিয়েছিল। দ্রুত স্বর্গে পৌঁছোবার জন্যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে সাঁকো পার হতে চেয়েছিলে। এবং সেই কারণে যে তোমাকে এতটা সময় সাহায্য করেছে, তাকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা করোনি। কিন্তু তুমি তোমার উপার্জিত ধন অনাথ আশ্রমের শিশুদের

প্রতিপালনের জন্যে দান করে এসেছ বলে সাঁকোর নীচের আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত তরল পদার্থে পড়ে যাওনি। যাও, এখন সাঁকো পার হয়ে ওই গাছের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সুমিষ্ট জলে তৃষ্ণা দূর করো।

"স্বর্গে অসুন্দরের কোনও স্থান নেই। যেই তুমি স্বর্গের দরজায় পৌঁছোবে অমনি অপূর্ব সুন্দরী ও রূপবতী পরিরা এসে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা এতদিন তোমার অপেক্ষায় ছিল। তোমাকে চিরদিনের বন্ধু হিসেবে বরণ করে নেবে তারা। কখনওই তোমাকে বিরক্ত করবে না। তোমার জন্যে ফুলের বিছানা তৈরি করে রেখেছে তারা। যাও, এখন থেকে তুমি স্বর্গসুখ উপভোগ করো।"

আকাশবাণী শেষ হতেই বৃদ্ধ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খুব ধীরে ধীরে সাঁকো পেরিয়ে সুন্দর গাছেদের আড়ালে চলে গেলেন।

পায়ের নীচে ভয়ংকর গর্জন। সাঁকো স্থির। ওপারের সুদৃশ্য গাছগুলো এখন স্পষ্ট। সে মুখ তুলল, "হে পরমেশ্বর, আপনি কি আমার কথা শুনতে পারছেন?"

আবার আকাশবাণী হল, "ইহলোক পরলোকের প্রতিটি শব্দ আমি জানতে পারি। একটা গাছ যখন তার পাতা খসিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দেয়, আমি তার পতনের শব্দ অনুভব করি।"

"আপনি ওই বৃদ্ধের জন্যে যে-ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যাকে আপনি স্বর্গসুখ বলেছেন তা কি আমার জন্যেও স্থির হয়েছে?" সে চেঁচিয়ে বলল।

"না।" গম্ভীর শব্দটির প্রতিধ্বনিও শোনা গেল।

"তা হলে স্বর্গে আমার জন্যে কী ব্যবস্থা থাকছে?"

"তুমি নারী। তাই স্বর্গে পৌঁছে তুমি আমাতেই বিলীন হয়ে যাবে।"

"তার মানে?"

"তোমার মুক্তি ঘটবে আমার মধ্যে। তারপর আর তোমার কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আমাতে মিশে যাওয়াই তোমার আনন্দ।"

এক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপর স্বর্গকে পিছনে রেখে যেদিক দিয়ে সাঁকো ধরে এসেছিল, সেদিকে হাঁটতে শুরু করল।

তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হল, "এ কী! তুমি ভুল পথে যাচ্ছ কেন?"

সে মাথা নাড়ল, "এইটেই আমার পথ।" সে সাঁকো পেরিয়ে এল। এসে বড় বড় শ্বাস নিল।

"তুমি কী করতে চাইছ?" আকাশবাণী হল।

"আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই।"

"অসম্ভব। সেখান থেকে এসে কেউ ফিরতে পারে না। তুমি কি মূর্খ যে, স্বর্গের দরজা থেকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইছ?"

"যেখানে আমার কোনও নিজস্ব অস্তিত্ব নেই সেই জায়গা আপনার কাছে স্বর্গ হলেও আমার কাছে নয়।"

সে মাথা উঁচু করে হাঁটতে লাগল পরিচিত পথ ধরে।

ঘুম ভাঙল যখন তখন বেলা ভালই হয়েছে। প্রথমে মনে পড়েনি, পরে খেয়াল হল, এর আগে যতবার সে এইসব স্বপ্ন দেখেছে, ততবার স্বপ্নের শেষে ঘুম ভেঙে গেছে প্রবল অস্বস্তিতে। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হল। স্বপ্ন ফুরিয়ে গেছে কখন কিন্তু ঘুম ভাঙেনি। আর শরীরটাও বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বাথরুম থেকেই ল্যান্ডফোনের রিং শুনতে পেয়েছিল। বেরিয়েই সিক্তাকে কথা বলতে শুনল সে। সিক্তা বলছে, "না মাসি, আমার ফোন নম্বর তুমি কাউকে দেবে না। আমি চাই না ওরা কেউ আমাকে ফোন করুক।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমার দরকার নেই। যা ইচ্ছে করুক ওরা। রাখছি।" বলে ফোন রেখে দিল সিক্তা।

সংহিতা কিছু না বলে টেবিলে বসল। চা নিয়ে এল সিক্তা। বলল, "মাসি ফোন করেছিল। সেই যে ঝাড়গ্রামের—!"

"ও। কী ব্যাপার?"

"বলল, কাল হরিহরের বাড়ি থেকে লোক এসেছিল, আমার ফোন নম্বর চেয়েছে। মাসি জানতে চাইছিল দেবে কিনা! আমি দিতে মানা করলাম।"

"কেন?"

"কেন দেবে? ওদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"হঠাৎ কী জন্যে দরকার হল?"

"যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, সে নাকি মারা গিয়েছে।"

স্থির হয়ে গেল সংহিতা। অবাক হয়ে সিক্তার দিকে তাকাল সে।

"তার শ্রাদ্ধ হবে। তাই আমাকে খবর দিতে চায়। যাকে কখনও স্বামী বলে ভাবতে পারিনি, তার শ্রাদ্ধে আমি কেন যাব? মাসি বলল, যে এসেছিল সে বলেছে, শ্রাদ্ধে গেলে আমাকে নাকি সম্পত্তিরও ভাগ দিতে বাধ্য হবে ওরা।

আমার দরকার নেই। যাকে স্বামী ভাবিনি তার সম্পত্তি আমি নেব কেন? যা ইচ্ছে করুক।"

"এসব কথা একেবারে মন থেকে বলছ?"

"হ্যাঁ দিদি।"

এবার হাসল সংহিতা, "তুমি পরে আফশোস করবে না তো?"

"না। আমি ঠিক বলছি না দিদি?"

"একদম ঠিক। একশো ভাগ ঠিক।"

শোনামাত্র মুখে হাসি ফুটল সিক্তার। চলে গেল সামনে থেকে। ওর যাওয়া দেখল সংহিতা। একটি পড়াশুনো না জানা মেয়েও বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠে কখনও সখনও। এই অভিজ্ঞতা জীবনই দিয়ে থাকে।

সকাল ন'টায় সংহিতা জয়ব্রতর বাড়িতে পৌঁছে গেল। প্রৌঢ়া দরজা খুলে তাকে দেখে জোরে জোরে কেঁদে উঠল। জয়ব্রতর মৃত্যুর খবর ওকে টেলিফোনেই জানানো হয়েছিল। তারপরে ড্রাইভারকে দিয়ে কিছু টাকা পাঠানো হয়েছিল।

একটু শান্ত হলে সংহিতা বলল, "তোমাকে একবার আমার সঙ্গে নার্সিংহোমে যেতে হবে। টিকলি জানে না ওর বাবা নেই।"

"কী হবে মেয়েটার? যত ভাবি তত হাত-পা কাঁপে আমার। ওই মেয়েকে নিয়ে আমি কীভাবে এই বাড়িতে থাকব দিদি?"

"এখান থেকে নার্সিংহোমে যাওয়ার সময় যেমন দেখেছ এখন টিকলি তেমন নেই। সে হাঁটাচলা করতে পারছে ধীরে ধীরে। হাত নাড়তে পারছে। তুমি গেলে সে খুব খুশি হবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে নাও।"

"কেন?"

"ক'দিন ওর সঙ্গে থাকতে হতে পারে।"

বাড়ি বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে ছোট্ট ব্যাগে জামাকাপড় ভরে প্রৌঢ়া তার গাড়িতে উঠল। নার্সিংহোম যাওয়ার পথে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সংহিতাকে জেরবার করে ফেলল সে। শেষপর্যন্ত বলল, "আমি মরে গেলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করব, মানুষকে কেন এত কষ্ট দেন? এত কষ্ট দিয়ে কী সুখ পান?"

হেসে ফেলল সংহিতা, "তোমার কি মনে হয় তিনি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবেন?"

তখন চুপ করল প্রৌঢ়া। আঁচলে চোখের জল মুছতে লাগল।

নার্সিংহোমের অফিস যেন তৈরি হয়েই ছিল। তাদের বিল দেখল সংহিতা। প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। এত ওষুধ, ইনজেকশন ঠিকঠাক দেওয়া হয়েছে কিনা, একদিন দামি অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে পরের দিন সেটা পালটে দেওয়া হলে বাকি ওষুধগুলো কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করলে তিক্ততাই বাড়বে, লাভ কিছুই হবে না। দেখা গেল প্রায় অর্ধেক টাকা ফেরত পাবে মিলা। তার চেক সাতদিনের মধ্যে সংহিতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তারপর প্রৌঢ়াকে নিয়ে সংহিতা টিকলির কেবিনে পৌঁছোল।

এখন টিকলির পরনে একটা পাতলা রঙিন ম্যাক্সি। দুটো হাত আর ঘেরাটোপের ভেতরে নেই। নার্স বললেন, "এসে গেছে।"

"হলুদ শাড়ি?" সোজা হয়ে বসল টিকলি।

নার্স মৃদু ধমক দিল, "এই, তোমাকে বলেছি ওই নামে ডাকবে না।"

"ও। সংহিতা মাসি?"

সংহিতা হেসে বলল, "হ্যাঁ। তোমাকে আজ বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে। আচ্ছা, বলো তো, আমার সঙ্গে কে এসেছে?" সে প্রৌঢ়াকে ইশারা করল পাশে যেতে।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ চোখে টিকলির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সে হাত বাড়িয়ে ওর শরীর স্পর্শ করল। কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত আঙুল বুলিয়ে হেসে বলল, "ও মাসি, এতদিন আসোনি কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে টিকলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বেশ জোরে কেঁদে উঠল প্রৌঢ়া। একটু পরে টিকলি বলতে লাগল, "ও মাসি, কাঁদছ কেন? দেখো, আমি হাত-পা নাড়তে পারছি। আমি হাঁটতে পারছি। তুমি খুশি না হয়ে কাঁদছ কেন?"

প্রৌঢ়া নিজেকে সামলাল। নার্স বলল, "এখন থেকে তোমার আর কোনও চিন্তা নেই। নিজের মানুষ দেখাশোনা করবে। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। আবার তো এখানে আসতে হবে। তখন ডাক্তারবাবু মুখ-মাথা-বুক সব ঠিক করে দেবেন।"

"চোখ?" প্রৌঢ়া আচমকা জিজ্ঞাসা করল।

"চোখের জন্যে আলাদা ডাক্তারবাবু আছেন। আগে শরীর ঠিক হয়ে যাক।

তারপর সেই ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে।" নার্স বলল।

সংহিতা এবার তাড়া দিল, "চলো। যেতে হবে।"

টিকলি বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে তো?"

সংহিতা জবাব দেওয়ার আগে প্রৌঢ়া বলল, "বাড়ি তো নোংরায় ভরতি হয়ে আছে। উনি ওখানে গিয়ে থাকবেন কী করে?"

"আমি থাকতে পারলে তুমি কেন পারবে না?"

সংহিতা মাথা নাড়ল, "ঠিক বলেছ, ঠিক।"

হাঁটতে পারলেও টিকলির জন্যে হুইলচেয়ার নিয়ে আসা হল। নার্স সংহিতাকে একটু আড়ালে ডাকল, "দেখুন, ওর অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর সবাই এমন ব্যবহার করেছে যেন ওর শৈশব কাটেনি। আর ওই বিশাল ধাক্কা, শরীরের অবস্থাতে ওর মনের বয়স আচমকা কমে গিয়েছিল, নিজেকে বড় ভাবতে পারেনি। তাই এখন থেকে কেউ ওকে বালিকা বা শিশু মনে করে কথা বলবেন না। ওর বয়সি মেয়ের সঙ্গে যেভাবে কথা বলা উচিত, সেই স্বাভাবিক ব্যবহার করবেন।" মাথা নেড়েছিল সংহিতা। নার্সের কথা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

গাড়িতে বসতে খুব অসুবিধে হল না। প্রৌঢ়া বসেছিল ড্রাইভারের পাশে। গাড়ি চলতে শুরু করতেই সংহিতার হাত জড়িয়ে ধরল টিকলি, "বাইরেটা কেমন?"

"ভাল। তোমার তো সব জানা। চোখের অপারেশন হয়ে গেলে ওই জানা রাস্তাঘাট আবার দেখতে পাবে।" সংহিতা বলল।

"তোমার সর্দি সেরে গেছে কিন্তু গলাটা আর আগের মতো হল না।" টিকলি শ্বাস ফেলল, "ডাক্তার দেখিয়েছ?"

হাসার চেষ্টা করল সংহিতা, "বয়স হচ্ছে তো, তাই ডাক্তার কিছু করতে পারবেন না।"

খানিকটা যাওয়ার পর রাস্তাটা যেখানে দুটো ভাগ হয়েছে সেখানে পৌঁছে ড্রাইভার পিছন দিকে তাকাল। সংহিতা বলল, "ফিরে চলো।"

টিকলি কী বুঝল সে-ই জানে, বলল, "ওরা আমাকে নার্সিংহোমেই রেখে দিল না কেন? নার্সদিদি খুব ভাল ছিল।"

"সুস্থ মানুষকে কি নার্সিংহোমে রাখে? তা হলে অসুস্থ মানুষেরা এলে কোথায় চিকিৎসার জন্যে থাকবে?" সংহিতা ওর কাঁধে হাত রাখল।

"ব্যথা লাগছে। আমার হাত-পা সব জায়গায় এখনও ব্যথা আছে।"

"ওহো! সরি!"

সিকিউরিটি গার্ড গেট খুলে দিলে গাড়ি লিফটের কাছে নিয়ে গেল ড্রাইভার। তারপর নেমে দরজা খুলে দিল। প্রৌঢ়া এসে অতি সন্তর্পণে টিকলিকে নামাতেই সে বলল, "দোকানগুলো কি বন্ধ? রেডিয়ো বাজছে না কেন?"

"এটা আমার বাড়ি। তুমি যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছ ততদিন এই বাড়িতেই থাকবে। চলো, আমরা এখন লিফ্‌টে ওপরে উঠব।"

"লিফ্‌ট? তোমার বাড়িটা কি খুব উঁচু?"

"না। আমি একটা উঁচু বাড়ির ওপর তলার ফ্ল্যাটে থাকি।"

যে-ঘরটি মিলা ব্যবহার করেছিল সেই ঘরটিতে টিকলির ব্যবস্থা করে দিল সংহিতা। সিক্তা এসে আলাপ করল ওর সঙ্গে। টিকলি বেশ খুশি, বলল, "আমি তুমি, সবাই একসঙ্গে এখানে থাকব?"

প্রৌঢ়া জবাব দিল, "হ্যাঁ গো।"

ছবি আঁকার বাইরের সময়টা যেন কাটতেই চাইত না এতকাল। তিন দশকের একাকিত্ব টিকলি আসামাত্র চলে গেল। সংহিতা হাসল। স্বপ্নে ঈশ্বর বলেছিলেন, ফেরা যায় না। ভুল বলেছিলেন। কারণ পৃথিবীতেও যে স্বর্গ তৈরি করা যায় এটা তাঁর জানা নেই।

মোবাইল ফোন শব্দ করতেই সংহিতা সেটা দেখে অবাক হল। বব্। এখন তো নিউ ইয়র্কে স্যাটান আইল্যান্ডে মধ্যরাত। সুইচ টিপে ওটাকে অন করে সংহিতা প্রায় চিৎকার করে উঠল, "ওঃ বব্! আপনি? কী ভাল যে লাগছে! কিন্তু আপনার ওখানে তো এখন অনেক রাত!"

বব্ হাসলেন, "ইয়েস মাই ডিয়ার, এখন অনেক রাত। কিন্তু এই রাতটা আমি জেগে থাকতে চাই। একটু আগে 'দ্য ডিভাইন কমেডি'-র তৃতীয় ভল্যুমটা শেষ করলাম। করে ভাবলাম তোমার সঙ্গে কথা বলি। তৃতীয় ভল্যুম কী নিয়ে লেখা জানো তো?"

"জানি। প্যারাডাইস।"

বব্ হাসলেন, "পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বরের মহিমা ছড়ানো ঘোষণা করা সত্ত্বেও দান্তে আমাদের জানাচ্ছেন তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন। স্বর্গে যা দেখেছিলেন তা

এতটাই অতুলনীয় যে, তাঁর পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বসন্তের দুপুরে এই পৃথিবীতে যখন দেখলেন বিয়েট্রিস একদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন তিনিও তাকে অনুসরণ করলেন। ভেবে দেখো, আমাদের এই পৃথিবীর কবি অনুভব করলেন ঈশ্বর স্বর্গে আর একটি সূর্য তৈরি করে রেখেছেন, যার ঔজ্জ্বল্য ভয়ানক।" বব্ একটু শ্বাস নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, ওই দ্বিতীয় সূর্যকে দেখতে স্বর্গে যেতে হবে, এ কেমন কথা!"

"আপনি এসব কথা ভাবছেন কেন? অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ুন।"

"বাঃ, ঘুমিয়ে পড়লে এই ঘর, এই রাতের ঘরটাকে কোনওদিন দেখা হবে না যে!"

"দেখার দরকার কী?"

"না হে। বড় মায়ায় জড়িয়ে ছিলাম এতদিন।"

"কী হয়েছে বলুন তো!"

উত্তর এল না। লাইনটা কেটে গেছে।

সেই বিকেলে, কলকাতায় যখন সাড়ে পাঁচটা তখন সেই ছোটখাটো টাক মাথার মানুষটি, যাঁর চিবুকে সাদা দাড়ি, তাঁকে ফোন করল সংহিতা। বেজে গেল। যেন অনন্তকাল জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব ফোনের রিং-এ। লাইন কেটে গেল। কেউ ধরছে না ফোনটা? বব্ কি ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন? এখন তো স্যাটান আইল্যান্ডে সকাল আটটা।

আরও ঘণ্টা দুয়েক পরে, কলকাতায় সূর্য ডুবে গেলে বৃদ্ধ মানুষটিকে দ্বিতীয়বার ফোন করল সে। তৃতীয়বারে একটি অচেনা গলা জানান দিল।

সংহিতা ইংরেজিতে বলল, "আমি ভারত থেকে বলছি। বব্‌কে দেবেন।"

"না ম্যাডাম। সম্ভব নয়। আজ সকাল ছ'টায় বব্ ওঁর আফটার লাইফ জার্নি শুরু করেছেন।"

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল শরীরে, মনে। চোখ বন্ধ করল সংহিতা। আফটার লাইফ? জীবনের পরে? হতেই পারে না। জীবনের পরে তো জীবন থাকতে পারে না। বব্-এর মতন মানুষ সেখানে গিয়ে কী করবেন?

কেন যেতে হয় তাঁদের?

বিপুল নিকট

।। এক ।।

বিকেল থেকেই আকাশ মেঘে অন্ধকার। সকালে কালীদার চায়ের দোকানে বসে কাগজ হাতে নিয়ে সে জেনেছিল আজ কলকাতা ভাসবে। চারটে বাজতেই ঠিক করেছিল গাড়ি গ্যারাজ করে দেবে।

মালিকের টাকা আর তেলের দাম উঠে গেছে যখন, তখন আর লোভ না করাই ভাল। কিন্তু ক্যালকাটা হাসপাতালের সামনে দাঁড়ানো দুটো মানুষকে দেখে না দাঁড়িয়ে পারেনি অজয়। বুড়ো-বুড়ি। পরস্পরকে ধরে দাঁড়িয়ে, বুড়োর একটা হাত কাঁপতে কাঁপতে তাকে থামতে বলছে। ছুটোছুটি করে ট্যাক্সি ধরার ক্ষমতা এঁদের নেই। অজয়ের গ্যারাজ ভবানীপুরে, ওই দিকে যদি যায় তা হলে নামিয়ে দিতে অসুবিধে নেই। গাড়ি থামিয়ে সে চেঁচিয়েছিল, ' কোথায় যাবেন?'

বুড়ি আঁকড়ে ধরেছিল গাড়ির দরজা, 'আমাদের বাড়ি পৌঁছে দাও বাবা। ওর মাথা ঘুরছে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যা চাইবে তাই দেব।'

হেসে ফেলেছিল অজয়, 'উঠে পড়ুন।'

পিছনের সিটে বসেই বুড়ো বলেছিল, ' আঃ। বেঁচে গেলাম।'

'বাড়ি কোথায়? ভবানীপুর না চেতলায়?'

'অ্যাঁ?' বুড়ি মাথা নেড়েছিল, 'না, না। আমরা থাকি সল্টলেকে। করুণাময়ীতে। বোনের অপারেশন হয়েছে, দেখতে এসেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চেপেছিল অজয়। সর্বনাশ। এখান থেকে সল্ট লেকে যেতে লাগবে ঘণ্টাখানেক। তার পর ফিরতে হবে খালি গাড়ি নিয়ে। বৃষ্টি তো শুরু হয়ে যাবেই। সে পিছনে তাকাল। বুড়ো চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে বসে আছে, বুড়ি তার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। এঁদের নেমে যেতে বলবে কী করে!

অতএব কপালে দুঃখ আছে ভেবেই গাড়ি ঘুরিয়েছিল অজয়। পার্ক সার্কাসের চার নম্বর ব্রিজের ওপর উঠতেই বৃষ্টি নামল। সঙ্গে বিদ্যুৎ আর বাজ সঙ্গত করল।

'কাচ তুলে দিতে পারবেন, ঠাকুমা?'

'হ্যাঁ বাবা, পারব।'

যত এগোচ্ছে তত বৃষ্টির তেজ বাড়ছে। হেডলাইটের আলো রাস্তা পরিষ্কার করতে পারছে না। সব সাদা। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে থেমে যেতে হচ্ছিল অন্যান্য গাড়ির মতন। করুণাময়ীতে পৌঁছতে দেড় ঘণ্টা লাগল। বিশেষ একটা বাড়ির সামনে বুড়ির কথায় গাড়ি থামাল সে, 'নামবেন কী করে? কী জোর বৃষ্টি পড়ছে দেখছেন না?'

'ওই তো বাড়ি। দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছি। তালাও খুলতে হবে। তোমাকে কতক্ষণ আটকে রাখব বাবা?' বুড়ি বলল।

এ বার বুড়ো সোজা হল, 'কত হয়েছে ভাই?'

মিটার দেখে টাকার অঙ্কটা বলল অজয়।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে গুনে গুনে টাকাটা দিয়ে দিল বুড়ো। বুড়ি বলল, 'তুমি বসো। আমি গিয়ে তালা খুলে ছাতিটা নিয়ে আসি।'

'তখনই বলেছিলাম ছাতি নিয়ে বেরোও, শুনলে না!' বুড়োর গলায় রুষ্ট ভাব।

'কাকে সামলাব? তোমাকে না ছাতিকে? বসো, আসছি।'

অজয় দেখল বুড়ি টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ির দরজার দিকে। সে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ছাড়া আর কে কে থাকে এ বাড়িতে?'

'দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলে দুটো থাকে আমেরিকায়, মেয়ে-জামাই কেনিয়ায়। আমরা মরে যাওয়ার পর এসে বাড়ি বিক্রি করে দেবে। তদ্দিন...।' বুড়ো কথা শেষ করল না।

'ওদের কাছে চলে যাচ্ছেন না কেন?' অজয় প্রশ্নটা না করে পারল না।

'ওরা ওদের মা গেলে খুশি হবে, কিন্তু আমাকে ছেড়ে ইনি কোথাও যেতে চান না যে।'

দরজায় আওয়াজ হল। বুড়ো সেটা খুলতেই বুড়ির গলা শোনা গেল, 'এসো। ছাতাটা তুমি নাও, আমি তো ভিজে একসা। এখনই বাথরুমে ঢুকব।'

বুড়ো ছাতি মাথায় বুড়ির হাত ধরে চলে যেতেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিল অজয়। তার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল মানুষের বেশি দিন একা একা বাঁচা ঠিক নয়। অবশ্য ওঁরা তো একা নয়, দু'জনে রয়েছেন। ছেলেমেয়ে থাকতেও দু'জনের একা হয়ে থাকাটা ভয়ঙ্কর কষ্টের। পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও তার বাবা-মায়ের এই সমস্যা নেই। উঠোনের চার পাশে কাকা জ্যাঠারা আছেন। চাষবাসও একসঙ্গে। ছেলেরা চাকরি করতে বাইরে গিয়েছে বটে, কিন্তু নিয়মিত টাকা পাঠায়। সেই টাকা প্রয়োজন পড়লে অন্যের সমস্যার সমাধান করে। চেষ্টা করলেও কেউ একা হতে পারবে না ওখানে।

বৃষ্টিটা আরও বাড়ল। কাচ থেকে জল সরাতে পারছে না কাঠিটা। ওপাশ থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে ডাইনির চোখের মতো। এ ভাবে আরও আধ ঘণ্টা ঢাললে কলকাতার রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে যাবে। শালা! বুড়ো-বুড়ির উপকার করতে গিয়ে সে ফেঁসে গেল। কোনও রকমে চিংড়িঘাটায় পৌঁছে সে গাড়ি রাস্তার ধারে পার্ক করল। নাঃ, এ ভাবে অজ্ঞের মতো বাইপাসে গাড়ি চালানোর ঝুঁকি সে নেবে না। রাত হোক। মালিক মিটার বাড়াতে চাইলে ঝগড়া করতে হবে। মনে হল বৃষ্টিতে ফেঁসে যাওয়ার খবরটা মালিককে জানিয়ে রাখাই

ভাল। সে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল বের করে নাম বের করে বোতাম টিপল। রিং হচ্ছে। তার পর গলা পেয়ে ব্যাপারটা বলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মালিক চিৎকার করল, 'বৃষ্টি আসছে তুমি জানতে না? সব ক'টা কাগজে লিখেছে মারাত্মক ডিপ্রেশন হয়েছে, দেখোনি! তবু খিদিরপুর থেকে চলে গেলে সল্ট লেক? নাইট শিফটের ড্রাইভার আসবে রাত ন'টায়। যেমন করে হোক তার আগে এসে।' লাইন কেটে দিল মালিক। একটুও রাগ করল না অজয়। এখন মাত্র পৌনে সাতটা। সাধারণ সময়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ভবানীপুরে পৌঁছে যেত। এখন দু'ঘণ্টার ওপর সময় হাতে আছে। পকেটে মোবাইল ঢুকিয়ে সে লাল কাপড়টা দিয়ে সামনের কাচটা মুছতে যেতেই মোবাইলের রিং শুনতে পেল। আবার পকেটে হাত দিতে গিয়ে থমকে গেল সে। আওয়াজটা আসছে পিছনের দিক থেকে। সে ওপরে আলো জ্বেলে ব্যাক সিটটাকে দেখল। কিছু নেই। তার পর শব্দের উৎস বুঝে শরীর হেলিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আলো জ্বলতে দেখল। ব্যাক সিটের পা রাখার জায়গায় একটা মোবাইল পড়ে আছে। বাজতে বাজতে থেমে গেল সেটা, আলো নিভে গেল।

অনেক কসরত করে মোবাইলটাকে হাতে পেল অজয়। সাধারণ চেহারার মোবাইল। নিশ্চয়ই কোনও প্যাসেঞ্জার ফেলে গেছে ভুল করে। তার গাড়িতে উঠে কেউ কি মোবাইলে কথা বলেছিল? মনে পড়ছিল না। এই মাত্র যে নম্বর থেকে ফোনটা এসেছিল তার সঙ্গে কথা বললে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে ভেবে বোতাম টিপল অজয়। নম্বরটা ল্যান্ড লাইনের।

রিং হচ্ছে। তার পরই গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো!'

'আপনারা কেউ কি একটা মোবাইলে রিং করেছিলেন একটু আগে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার মোবাইল। কোথায় ফেলেছি মনে করতে পারছি না। হয় হাসপাতালে, নয় ট্যাক্সিতে। আপনি কে ভাই?'

'আপনি আমার ট্যাক্সিতেই ওটা ফেলে গেছেন।'

'ও, তুমি। এই শোনো, যে ছেলেটি আমাদের পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, সে ফোন করছে। ওর গাড়িতেই মোবাইলটা ফেলে এসেছি। ওই মানিব্যাগ বের করার সময় হয়তো পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে। হ্যাঁ ভাই, তুমি এখন কোথায়?' বুড়ো জিজ্ঞেস করল।

'চিংড়িঘাটায়'। অজয় জবাব দিল।

'ও বাব্বা! কী হবে? মুশকিল হল আমার ছেলেমেয়েরা ওই মোবাইলেই ফোন করে। তা ঠিক আছে, তুমি আবার যখন কোনও প্যাসেঞ্জার নিয়ে সল্ট লেকে আসবে তখন দিয়ে যেয়ো।'

অজয় সুইচ অফ করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

যে ছেলেমেয়ে বাপ-মাকে একা ফেলে রেখেছে তাদের ফোনের জন্যে বুড়ো এখনও উদগ্রীব হয়ে থাকে! এক বার মনে হল তার কী দরকার এখনই মোবাইলটা ফেরত দেওয়ার। এই যে তেল পুড়বে, সময় যাবে, তার দাম কি বুড়ো দেবে? ভাবতেই ঠোঁট কামড়াল। এ রকম হলে বুড়োর ছেলেরা যা ভাবত, তাই সে ভাবছে! দুর!

তখনও বৃষ্টি সমানে চলছে। বাড়ির সামনে পৌঁছে হর্ন দিল অজয়। বৃষ্টিতে ভেজার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। দ্বিতীয় বার হর্ন বাজানোর পর দরজায় আলো দেখা গেল। ছাতি মাথায় বেরিয়ে এল বুড়ি। জানলার কাচ সরিয়ে মোবাইল তাঁর হাতে দিতে বুড়ি বলল, 'একবার ভেতরে আসতে হবে বাবা। এক কাপ চা খেয়ে যাও।'

'না, না। খুব দেরি হয়ে গেছে। আবার কখনও এ দিকে এলে নিশ্চয় চা খেতে আসব। আচ্ছা চলি।' কাচ তুলে গাড়ি ঘোরাল অজয় দরজা লক করে।

এখন রাস্তায় মানুষ দূরের কথা একটা নেড়ি কুকুরও নেই। পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত কোনও গাড়িই চোখে পড়ছে না। আকাশটা যেন আর বৃষ্টি ধরে রাখতে পারছে না। খানিকটা যেতেই একটা অ্যাম্বাসাডার দেখতে পেল সে। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে দুটো মানুষ বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে হাত তুলে তাকে থামতে বলছে। এরা যদি সাউথে যায়, তা হলে খালি গাড়ি নিয়ে ফিরতে হবে না।

সে গাড়ি থামাতেই লোক দুটো গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল। এক জন চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, দরজা খোল। ডাবল ভাড়া দেব!'

সে কাচ নামাল, 'কোথায় যাবেন?'

দ্বিতীয় জন চেঁচাল বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে, 'তাতে তোর কী। ডাবল মাল নিবি পৌঁছে দিবি। তাড়াতাড়ি কর, টুনটুনি ভেগেছে, তুলতে হবে।'

লোক দুটো যে আকণ্ঠ মদ গিলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদের গাড়িতে নিলে বিপদে পড়তেই হবে। কাচ তুলে অ্যাকসেলারেটারে চাপ দিল অজয়। গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র অশ্রাব্য গালাগালি শুরু করল লোক দুটো। অন্য সময় হলে অজয় গাড়ি থামিয়ে নীচে নামত। লোক দুটোকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ফিরে আসত। এখন এই বৃষ্টি, ভিজতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না। বেঁচে গেল জন্তু দুটো।

সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল অজয়। ইতিমধ্যেই গর্তগুলো জলে ভরে গেছে। সেখানে চাকা যদি জোর গতিতে পড়ে তা হলে গাড়ির বারোটা বেজে যাবে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আচ্ছা, ওই মাতাল দুটো এই বৃষ্টিতে গাড়ি থামিয়ে কী করছিল ওখানে? গাড়ি কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল? নিশ্চয়ই তাই। নইলে নিজেদের গাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে কেন? বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে বসে মাল খাওয়ার

পার্টি কলকাতায় প্রচুর। ব্যাপারটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। রাতে মাতাল দেখলে কোনও ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়াতে চায় না, যদি না ড্রাইভারের মতলব খারাপ থাকে।

একটা গর্ত বুঝতে পারেনি সে, গাড়ি লাফাল। শালা! অন্যমনস্ক হলেই বিপদ লাফিয়ে সামনে আসে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে খুব। মুহূর্তের জন্যে সামনের পথ সাদা হয়েই আরও অন্ধকার হচ্ছে। হেডলাইটের আলোকে বৃষ্টি গিলে ফেলছে।

নিকো পার্ক ছাড়াবার পরে রাস্তায় জল নেই দেখে সে গাড়ির গতি একটু বাড়াতেই বিদ্যুৎ চমকাল। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যে সে দেখতে পেল রাস্তার মাঝখান দিয়ে কেউ দৌড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢোকার আগে গাড়ির ঠিক সামনে একটা মানুষকে দেখতে পেয়ে সাডেন ব্রেক চাপল অজয়। গাড়ি একই জায়গায় প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে দাঁড়িয়ে গেল। আবার বিদ্যুৎ চমকাল তখন, কিন্তু কেউ সামনে দাঁড়িয়ে নেই।

কিন্তু লোকটাকে সে সামনে দেখেছে। আর তার গাড়ি যে লোকটাকে স্পর্শ করেনি তাতে সে নিঃসংশয়। কিন্তু গেল কোথায়? গাড়ির সামনে পড়ে যায়নি তো? ধাক্কা যদি না লাগে তা হলে পড়বে কী করে?

কিন্তু যদি সামনে পড়ে থাকে তা হলে গাড়ি তো ওর ওপর দিয়ে যাবে। সে ঘড়ি দেখল। হাতে মাত্র দেড় ঘণ্টা রয়েছে। কী করবে। ব্যাক করল সে। খানিকটা পিছিয়ে যেতেই হেডলাইটের আলোয় দেখতে পেল এক জন রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টি যে শরীরটার ওপর পড়ছে, সেটা পুরুষের নয়।

না। সে ধাক্কা মারেনি। তা হলে মহিলা পড়ল কী করে? বেঁচে আছে তো? ওকে ওইখানে ফেলে পাশ কাটিয়ে সে চলে যেতেই পারে। তার পর লাল কাপড়টা তুলে মাথায় পাগড়ির মতো তুলে নীচে নামতেই জলের ঝাপটা লাগল শরীরে। মহিলার কাছে গিয়ে সে চিৎকার করল, 'কী হয়েছে আপনার? এই যে!'

কোনও সাড়াশব্দ নেই। সে শরীরটাকে চিৎ করে দিতেই বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোয় বুঝতে পারল ওর বয়স চব্বিশের বেশি নয়। নাকের নীচে আঙুল রাখতেই বুঝতে পারল শ্বাস পড়ছে। একে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত। দৌড়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে আবার এগিয়ে এসে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল অজয়।

পেছনের সিটে ওকে বসাতেই মাথাটা কাত হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে অজয় যখন ড্রাইভিং সিটে বসল, তখন তার সর্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে। গাড়ির বারোটা বেজে গেল। মালিক আজ তার শ্রাদ্ধ করবে।

গাড়ি চালু করল সে। সোজা বাইপাস দিয়ে রুবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু ...! মাথা নাড়ল অজয়। হাসপাতালে গিয়ে সে মেয়েটার পরিচয় তো কিছুই দিতে পারবে না। অ্যাকসিডেন্ট হয়নি, রাস্তা থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে

নিয়ে এসেছে বললে তো পুলিশ কেস হয়ে যাবে। পুলিশ তাকে সহজে ছাড়বে না।

সে পিছন ফিরে চিৎকার করল, 'এই যে, কে আপনি?' কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। হঠাৎ মাতাল দুটোর কথা মনে এল। ওদের এক জন বলেছিল, টুনটুনি ভেগেছে, ওকে তুলতে হবে। তা হলে এই মেয়েই সেই টুনটুনি! ওই মাতালদের সঙ্গে কী করছিল?

ততক্ষণে গাড়ি বাইপাসে উঠে গেছে। অজয়ের মনে হল, ঝুটঝামেলায় না গিয়ে ওকে রাস্তার এক পাশে নামিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় নামাবে। যদিও বাইপাসে এখন গাড়ি কম কিন্তু দৃশ্যটা কেউ না কেউ দেখতে পাবেই। একটা পুলিশের ভ্যানকে সে দেখতে পেল রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে ভিজছে । ধরা পড়লে কোনও কৈফিয়ত পুলিশ শুনবে না।

'এত ভাবছ কেন? তুমি তো প্রকৃত মানুষের যা করা উচিত, তাই করেছ।'

কে বলল কথাটা? গলাটা কোনও বয়স্ক মানুষের। গাড়িতে সে আর অজানা মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। শালা, আজ কী যে সব হচ্ছে! তবু সে পিছনের দিকে তাকিয়েই ব্রেকে চাপ দিল। একটি টাকমাথার বুড়ো মেয়েটির মাথার পাশে বসে আছে। সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ' কে আপনি? কী করে গাড়িতে উঠলেন?'

'ভাল করে তাকিয়ে দেখো, বোধ হয় আমাকে চিনতে পারবে।' বৃদ্ধ হাসলেন।

।। দুই ।।

জোরে ব্রেক চাপল অজয়। বাইপাসের রাস্তা ছেড়ে তার গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সে অনেকটা ঘুরে বসে বলল, 'আপনাকে আমি চিনব কী করে? ওই মেয়েটাকে যখন গাড়িতে তুলেছিলাম আপনি সেই সুযোগে উঠে বসেছেন। খুব অন্যায় করেছেন। নেমে যান।'

'তুমি এখনও ভুল করছ হে। যা বৃষ্টি, ওই ভাবে উঠলে তো আমার শরীর জলে ভিজে যেত।'

মানুষটির হাসি দেখে খেয়াল হল অজয়ের। সত্যি তো, এক ফোঁটা জলের দাগও ওঁর পোশাকে নেই।

'কিন্তু তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। নইলে ওই মেয়েটি কোনও গাড়ির নীচে চাপা পড়ত অথবা ওই মাতালদের লালসার শিকার হত। এই তো চাই! কে বলে, আজকাল মানুষের বুক থেকে দয়া-মায়া-পরোপকার করার ইচ্ছে চলে গেছে।'

অজয় মানুষটিকে ভাল করে দেখল। এ বার মনে হচ্ছে কোথাও দেখেছে ওঁকে। আর তার পরেই মনে হতে লাগল, খুব চেনা ওই মুখটা। সে নিজের মনেই বলল, 'না, এ হতে পারে না।'

'কী হতে পারে না?'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল অজয়।

'আহা, তুমি তো মূর্খ নও যে অসম্ভব বলবে।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে যে মানুষটির হুবহু মিল, তিনি কত বছর আগে জানি না, মাইকেল মধুসূদন দত্তের আমলে বেঁচে ছিলেন। সেই মানুষটি এত বছর বাদে আমার গাড়িতে বসে থাকতে পারেন না!'

'কেন পারে না! কচি কচি শিশুরা যখন বইটা তাদের নরম হাতে স্পর্শ করে তখনই আমি বেঁচে উঠি। এই পৃথিবীর বাতাস থেকে তারাই মুছে যায়, যারা বেঁচে থাকার সময় মানুষের জন্যে একটুও ভাবেনি।' তিনি হাসলেন।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তা হলে কি যাঁদের কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, তাঁরা সবাই এখানে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছেন?'

'হ্যাঁ। আছেন।' তিনি মাথা দোলালেন, 'কিন্তু তুমি বেশ ভাল ভাবে কথা বলতে পারো, অন্যান্য ট্যাক্সিচালকদের মতো নয়।'

'আমি গাঁয়ের ছেলে। বি এ পাশ করে কোনও কাজ না পেয়ে ড্রাইভিং শিখে কলকাতায় ট্যাক্সি চালাচ্ছি।'

'খুব ভাল করেছ। কোনও কাজই ছোট নয়, যদি কাজটা ভাল ভাবে করো। তা এখন ওই মেয়েটিকে নিয়ে কী করবে?'

'বুঝতে পারছি না। হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুলিশ ধরবেই।'

'তাই বলে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে।'

অজয় লজ্জা পেল, 'আমার মাথা কাজ করছিল না...!'

'আমি বলি কী, মেয়েটিকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়াই ভাল। মনে হয় ওর শরীরে কোনও আঘাত লাগেনি, ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।'

'কিন্তু আমি তো ওর বাড়ি কোথায় তা জানি না।' অজয় রাস্তার দিকে তাকাল। বৃষ্টি কমে আসছে। গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। সে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই ওর বাড়ির ঠিকানা বলতে পারবেন।'

কোনও সাড়া নেই। অজয় দেখল মানুষটি নেই। মেয়েটি নড়ে উঠে অস্ফুট আওয়াজ করল, 'উঃ।'

অজয় চিৎকার করল, 'আপনি চলে গেলেন কেন?' নিজের কাছেই গলাটাকে অপরিচিত ঠেকল তার।

নিজের শরীরে চিমটি কাটল অজয়। সে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খামোকা তার গাড়িতে এসে বসবেন কেন? মাল খেয়ে ওঁকে দেখলে কিছু বলার ছিল না। সেই কবে 'বর্ণ পরিচয়'-এর পাতায় ওঁর মুখ প্রথম দেখেছিল,

কলেজ স্কোয়ারের মূর্তিটা তো আজকাল আড়ালে পড়ে যাওয়ায় চোখে পড়ে না, কিন্তু কেসটা মুন্নাভাইয়ের মতো হয়ে যাচ্ছে না?

গাড়ি চালিয়ে অনেকটা এগোতেই মোবাইল বেজে উঠল। অন করতেই সে মালিকের গলা শুনতে পেল, 'কী ব্যাপার? এখন কোথায়?'

'এসে গেছি।' অর্ধসত্য বলল সে।

'নাহে, আজ রাতের ডিউটি করতে পারবে না ধনঞ্জয়। বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছে। এখানে গ্যারেজের সামনেও হাঁটুজল জমে গেছে। জল নামলে গ্যারাজ করে চাবি দিয়ে যেয়ো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।' মালিক বলল।

'যা ব্বাবা। রাস্তায় কোনও প্যাসেঞ্জার নেই। আমি ততক্ষণ কোথায় ঘুরব?'

'তোমার বাড়ির সামনে জল জমে?'

'বোধ হয় না।'

'তা হলে রাতে ওখানেই রেখে গাড়ির মধ্যে শুয়ে থেকো।'

গাড়ির মধ্যে সারা রাত শুয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তার আগে এই মেয়েটার হিল্লে করা দরকার। সে চার নম্বর ব্রিজ পেরিয়ে এসে গাড়ি থামাল, 'এই যে, শুনছেন? বিদ্যাসাগরমশাই যা-ই বলুন, এতক্ষণে তো জেগে ওঠা উচিত?'

মেয়েটির মুখ থেকে একটু আওয়াজও বের হল না। অজয় জলের বোতল থেকে খানিকটা মেয়েটির মুখে ছুড়ে মারতেই কথা ফুটল, 'ওঃ, ও মা! মাগো।'

'আপনার মায়ের ঠিকানাটা দয়া করে বলুন।'

'অ্যাঁ! আমি, আমি কোথায়?'

'আমার ট্যাক্সিতে। রাস্তায় পড়ে ছিলেন, দয়া করে গাড়িতে তুলে বাঁচিয়েছি। আমার কথা বুঝতে পারছেন? এখন দয়া করে নেমে যান। সাউথে বাড়ি হলে বলুন পৌঁছে দিচ্ছি। তিনি বলে গিয়েছেন আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে।'

'কে?'

'নাম বললে আমাকে পাগল ভাববেন। কোথায় থাকেন?'

'হটর।'

'সেটা কোথায়?'

'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। স্টেশন থেকে বাসে যেতে হয়।'

'ও। পার্ক সার্কাসের মোড়ে নামিয়ে দিচ্ছি, শেয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরুন।'

'আমার মাথা ঘুরছে, হাঁটতে পারব না।' মেয়েটি এ বার কেঁদে ফেলল।

অজয় দেখল দূরে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার ইঞ্জিন চালু করে বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল, 'সল্ট লেকে কী করছিলেন?'

'আমাকে চাকরি দেবে বলে ডেকেছিল।'

'কী ভাবে ডাকল?'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করেছিলাম।'

'তো?'

'এতক্ষণ বসিয়ে রেখে বলল, আমার চাকরি হয়ে যাবে। ওদের কোম্পানিতে টাকা দিয়ে যারা কিছুক্ষণের জন্যে বান্ধবী চায় তাদের সঙ্গ দিতে হবে। আমি রাজি হচ্ছিলাম না দেখে মেয়েটা আমাকে ওদের মালিকদের ঘরে নিয়ে গেল। তারা তখন মদ খাচ্ছিল। বলল, 'ঠিক আছে, চাকরি করতে হবে না। খুব বৃষ্টি পড়ছে, চলো তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি।' গাড়ির মধ্যে ওরা আমার গায়ে হাত দিতেই আমি ধাক্কা মারতেই গাড়ি রাস্তার ধারে চলে গিয়ে চাকায় আওয়াজ তুলে থেমে যায়। আমি তখন দরজা খুলে দৌড়তে থাকি। ওঃ, আর কিছু মনে নেই।'

'বাঃ, চমৎকার গল্প!' অজয় হাসল।

'না', চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'গল্প নয়। সত্যি।'

'বেশ। এখন আপনি কোথায় যাবেন? কলকাতায় কোনও আত্মীয় আছেন?'

'না। কেউ নেই।'

বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছিল। অজয় মাথা নাড়ল, 'আপনাকে আমি চিনি না, এমনকী আপনার নামও জানি না। পুলিশ ধরলে ফেঁসে যেতে হবে। দয়া করে আমাকে বাঁচান, নেমে পড়ুন।'

'আপনি, আপনি আজ রাতটা আপনার বাড়িতে থাকতে দেবেন?' কাতর গলায় বলল মেয়েটি, 'আমার নাম অঞ্জনা, অঞ্জনা বিশ্বাস।'

'যাচ্চলে! দেখুন, আমি একটা ঘরে একা থাকি। দুপুরে হোটেলে খাই, রাতে যা হোক কিছু বানিয়ে নিই। আপনাকে ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি তো রাস্তায় থাকতে পারব না।' অজয় বলল।

'আপনি তো ভাল লোক। কোনও অসুবিধে করব না। ভোর হলেই চলে যাব।'

'কী যে করি। আমার বারোটা বেজে গেল।'

'কেন?'

'কাজ থেকে ফিরে রান্না করার সময় আমি দু'পেগ মদ খাই...!'

'আপনি মাতাল হয়ে যান? ওদের মতো?'

'না, না। দু'পেগে কেউ মাতাল হয় না। আমি কখনও হইনি।'

'তা হলে আমার কোনও অসুবিধে নেই।'

একটা ব্লাইন্ড লেনের শেষ বাড়ির একতলার অ্যাটাচড বাথওয়ালা ঘরে অজয়ের বাসস্থান। বৃষ্টি আবার জোরালো হওয়ায় পাড়ার কোনও মানুষ বাইরে নেই।

গাড়িটাকে গলির শেষ প্রান্তে নিজের দরজার সামনে এনে সে বলল, 'দাঁড়ান, আগে দরজা খুলি।'

দরজা খুলতেই মেয়েটি টুক করে ঢুকে গেল ভেতরে। আলো জ্বেলে দিয়ে গাড়িটাকে লক করতে গিয়ে আপাদমস্তক ভিজে গেল অজয়।

'ওপাশে বাথরুম আছে। আপনার জামাকাপড় তো ভিজে। এইভাবে থাকবেন?'

'অনেক শুকিয়ে এসেছে।' মেয়েটি, যার নাম অঞ্জনা, বাথরুমে চলে গেল।

দ্রুত ঘরটাকে গুছিয়ে নিতেই অঞ্জনা বেরিয়ে এল। অজয় বুঝতে পারল মেয়েটা সত্যি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে বলল, 'আমার কাছে মেয়েদের কোনও পোশাক নেই। বিছানার ওপর খবরের কাগজ পেতে দিচ্ছি, শুয়ে পড়ুন।'

'আমি ওই কোনার মেঝেতে শুয়ে পড়ি?'

' দেখুন, তিনি বলেছেন আমার বুক থেকে দয়া-মায়া মুছে যায়নি। যা বলছি তাই শুনুন। খাটে উঠে পড়ুন। আমি রান্না করছি, হলে ডাকব। খেয়ে নেবেন।'

'আমি কিছু খাব না।'

'আপনার মর্জি।'

বেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঞ্জনা খাটে শুয়ে পড়ল। শুয়ে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরল। অভ্যেসে খাট বলে অজয়, আসলে এক জনের শোওয়ার মতো তক্তপোশ। তবে গদি এবং তোষকে বেশ আরামপ্রদ। বাথরুমে ঢুকে পোশাক পাল্টাল সে। চুল মুছল। বেশ শীত-শীত করছে। এ রকম রাতে দু'পেগ পেটে না গেলে....।

মদ্যপানের অভ্যেসটা করিয়েছিল জিতেনদা, জিতেন মণ্ডল। যার কাছে গাড়ি চালাতে শিখেছিল অজয়। বলেছিল, 'রাতে শোওয়ার আগে এক কী দুই পেগ গলায় ঢালবি। কখনওই তার বেশি নয়। দেখবি বেশ চাঙ্গা লাগছে। আর খবরদার, কোনও ঠেকে গিয়ে পাঁচ মাতালের সঙ্গে ভিড়বি না। তা হলে সব গোল্লায় যাবে। নিজের ঘরে বসে কোনও কাজ করতে করতে একা খাবি। এই বলে দিলাম।'

প্রথম প্রথম আধ পেগ খেতেই বিশ্রী লাগত। কিন্তু কখনওই সে জিতেনদার উপদেশ অমান্য করেনি। জিতেনদা পঁয়ষট্টি বছরেও এক শিফ্‌ট চালাচ্ছে। আর যারা ঠেকে যায়, তারা চল্লিশ পার হতে না হতেই ছবি হয়ে যায়।

ডিমের ডালনা আর ভাত। ভাতটাকে আগে বসিয়ে দিয়ে আলু কাটার আগে গ্লাসে এক পেগ ঢালতে গিয়ে মনে হল একটু বেশি পড়ে গেছে। আজকাল বোতলের মুখগুলো এমনভাবে আটকে দেয় যে, বাড়তি মদ ভেতরে ঢোকানো যায় না। পুরো জল ঢেলে আলু কেটে নিল অজয় মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে। বৃষ্টির শব্দ একটুও কমছে না। এই ঘরে বহু দিনই সে একা থাকছে। আজ যে মেয়েটা এল তাতেও তার মনে হচ্ছে পরিস্থিতি অন্য রাতের মতোই থেকে গেছে।

ভাত হয়ে গেল। ডিমের ডালনা চাপিয়ে দ্বিতীয় পেগ ঢালল অজয়। তার পর মুখ ফিরিয়ে দেখল অঞ্জনা কাটা কলাগাছের মতো পড়ে আছে। অচেনা, অজানা

বিছানায় যখন কোনও মেয়ে ওই ভাবে ঘুমায়, তখন বোঝাই যাচ্ছে ওর ভেতরে এই মুহূর্তে কোনও প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই।

ডিমের ডালনা নামিয়ে গ্লাসটা শেষ করতেই মনে হল একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেল। তখনই কানে এল, 'ওয়েল, আর একটা গ্লাস আনো।'

পুরুষকণ্ঠ কানে আসতেই অজয় চমকে বাঁ দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নীচে বসে থাকায় মনে হচ্ছে লোকটা বেশ লম্বা, কেতাদুরস্ত কোটপ্যান্ট পরা, মুখে দাড়ি।

সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। 'কে আপনি? কী ভাবে এই ঘরে ঢুকলেন?'

'অবান্তর প্রশ্ন। তুমি আর একটা গ্লাস বের করে তাতে মদ ঢালো। হ্যাঁ, একটুও জল মেশাবে না। বাঙালি যে অধঃপতনে গিয়েছে, তা মদ খাওয়ার ধরন দেখলেই বোঝা যায়। তোমরা মদ খাও না জল? ছিঃ ছিঃ।'

'আপনি কে?'

'আঃ, বিরক্ত কোরো না। হ্যাঁ, দ্বিতীয় গ্লাসটা আমার জন্যে। কিন্তু সেটা আমার হয়ে তুমি খাবে। আমি দেখব।'

'কেন?'

'ইডিয়ট। আমরা এখন ও-সবের ঊর্ধ্বে।' হতাশ গলায় কথা বলল মানুষটা। 'বেঁচে থাকতেই তো প্রায় ছেড়ে দিতে হচ্ছিল ওই ব্যাটা পণ্ডিত টাকা বন্ধ করে দেওয়ায়। দেখলাম, তোমাকে খুব জ্ঞান দিয়ে গেল। পুরনো অভ্যেস। কই ঢালছ না কেন?' তার পর গুনগুন করল, 'ঢালো, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তা হলে ঢেলে দাও।'

।। তিন ।।

দুটো গ্লাসে টলটল করছে নেশা, বলছে, আকণ্ঠ গ্রহণ করো আমাকে। দীর্ঘকায় মানুষটি যদিও দাঁড়িয়ে কিন্তু তাঁর দু'চোখে সাহারার তৃষ্ণা। কয়েক পলক পরে তাঁর ঠোঁটে হাসি ফুটল। বললেন, 'আর!'

অজয় খুব অবাক গলায় বলল, 'ও রকম আওয়াজ করলেন কেন?'

পায়চারির ভঙ্গিতে খানিকটা ঘুরে এসে বললেন, 'দ্বিতীয় পাত্রটি তোমার, খবরদার প্রথম পাত্রটিতে আঙুল ছোঁয়াবে না, ওটা আমি গ্রহণ করেছি। তোলো, হাঁ করে দেখছ কী?

সম্মোহিতের মতো অজয় দ্বিতীয় পাত্রটি তুলে ঈষৎ চুমুক দিল। আজ হচ্ছেটা কী! অনেক্ষণ পেট খালি থাকলে বায়ু জন্মায়, সেই বায়ুর প্রকোপে কি এমন উল্টোপাল্টা দৃশ্য দেখতে হয়? তখনই মানুষটি দ্বিতীয় বার তৃপ্তির আওয়াজ করলেন, 'আঃ!'

অজয় মাথা নাড়ল, 'গ্লাসে চুমুক না দিয়ে ও রকম আওয়াজ কেন করছেন? আমাকে ঢালতে বললেন অথচ নষ্ট করছেন। হুইস্কির দাম কী অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে তার খবর রাখেন?'

'মূর্খ! কথাটা দেখছি কানে যায়নি! ঘ্রাণেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যায়। পুরো খাওয়ার যখন উপায় নেই তখন পণ্ডিতদের মতো অর্ধেকেই সন্তুষ্ট না হয়ে উপায় কী! আর শোনো, দাম নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।' বিড়বিড় করলেন তিনি, 'আমি কি ডরাই ভাই ভিখিরি রাঘবে?'

এবার উত্তেজিত হয়ে অনেকটা পান করে অজয় বলল, 'আপনাকে আমি—।'

থামিয়ে দিলেন তিনি, 'এতক্ষণে চৈতন্য পেলে বাবা! যাক গে, আজ তোমার সঙ্গে ওই পণ্ডিতের দেখা হয়েছিল। অথচ সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কী জ্ঞান দিয়ে গেল সে?'

'ও, আপনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলছেন? উনি জ্ঞান দেবেন কেন? আমার প্রশংসা করছিলেন।' অজয় বলল, 'আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। বসুন না!'

মাথা দোলালেন মধুসূদন, 'যদি জানত তুমি ওই ঘরে বসে প্রত্যহ পান কর তা হলে তার দর্শন পেতে না। এই দ্যাখো, যখন বেঁচে ছিল তখন যে টাকা চেয়েছে তাকেই সাহায্য করেছে। স্বীকার করছি আমাকেও বাঁচিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল আমি চাল ডাল দুধ না কিনে ওর টাকায় পানীয় কিনে খাচ্ছি। যখন তখন টাকা ধার চাইছি। ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এড়াতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াল। আরে আর যাদের সাহায্য করেছে তাদের আমার মতো লেখার ক্ষমতা ছিল কি? সেই যে পালিয়ে বেড়ানো শুরু করেছিল তা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। যাক গে! তা এই যে মেয়েটিকে ঘরে এনে তুললে, এটাও নিশ্চয়ই তার পরামর্শে?'

'হ্যাঁ, মানে—!'

'বোঝ! এখন কী করবে? এই মেয়ের ইতিবৃত্ত তোমার জানা নেই। ভাল বংশের না খারাপ পাড়ার মেয়ে তা কি তুমি জানো?'

'আজ্ঞে, জানার সুযোগ পাইনি।'

'তবে! এই মেয়ে যদি কাল পাড়ার মানুষদের ডেকে কেঁদে বলে তুমি ওর বেইজ্জত করেছ তখন তোমার কী হবে? বিয়ে করতে পারবে?'

'সে কী!'

'তখন সবাই জোর করে তোমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবে। ওই বামনে বুড়োর পরামর্শ শুনলে তো এই পরিণতি হবেই।'

'কিন্তু এই বেচারা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় যে ভাবে পড়েছিল, না তুললে মরেই যেত!'

'বাহবা। তা হলে জোব চার্নক যা করেছিল তাই বুক ফুলিয়ে কর। নিজেই বিয়ে করে ওকে সারা জীবনের জন্যে বাঁচিয়ে রাখ। মারিয়াকে যেমন জোব চার্নক রেখেছিলেন।'

এই সময় খাটের ওপর থেকে অস্ফুট আওয়াজ ভেসে এল। অজয় তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল অঞ্জনা ধীরে ধীরে পাশ ফিরছে। সে নীচের গ্লাস দুটোর দিকে তাকাল। তার পর মনে হল, তার নিজের ঘরে সে যা ইচ্ছে করতে পারে। রোজকার রুটিন কেন এই মেয়েটিকে দেখে পাল্টাবে।

সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল অজয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন এসেছিলেন তেমনই মিলিয়ে গিয়েছেন। মানুষটির ছবি দেখেছিল সে। জীবনীও পড়েছিল পাঠ্যবইতে। ওঁর লেখা কোনও বই তার পড়া হয়নি। আজ সামনে পেয়েও তাই ওঁর বই নিয়ে কোনও কথা বলতে পারেনি সে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই ওঁকে এড়াতে এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এই খবরটা কেমন অভিনব লাগছে। সে পড়েছিল, বিদ্যাসাগর মশাই মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এই সময়ে অঞ্জনা বিছানায় উঠে বসল। বসে দুই হাতে মাথা চেপে ধরল কিছুটা সময়। তার পর তাকাল, 'আমি কোথায়?'

অজয় মাথা নাড়ল। বলল, 'এখন কিছু বললে আপনি কি মনে রাখতে পারবেন?'

অঞ্জনা তাকাল। বোঝাই যাচ্ছিল সে বিভ্রান্ত।

'আপনাকে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে গাড়িতে তুলে আমি ফেঁসে গিয়েছি। রাস্তার কোনও জায়গায় নামিয়ে দিলে পাবলিক প্যাঁদাত। হাসপাতালে নিয়ে গেলে পুলিশ ধরত। বিদ্যাসাগর মশাই যেচে পরামর্শ দিলেন বাড়িতে নিয়ে আসতে। আনার পর আপনি মড়ার মতো ঘুমালেন। বৃষ্টি এখনও থামেনি। এত রাত্রে কোনও গাড়ি বা বাস পাবেন না। কী করবেন?'

অঞ্জনা কেঁদে ফেলল।

'এই দেখুন, কেঁদেটেদে কোনও লাভ নেই। ভাগ্যিস বৃষ্টি হচ্ছে নইলে এত রাত্রে আমার ঘরে মেয়ের গলায় কান্না কেন জানতে পাবলিক ভিড় করে আসত। আমার রান্না হয়ে গেছে। ডিমের ঝোল, ভাত। লাস্ট কখন খেয়েছেন?'

অঞ্জনা কান্না থামাল কিন্তু জবাব দিল না।

'আমি খাব আর আপনি অভুক্ত থাকবেন এটা হতে পারে না। যান, মুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার দিচ্ছি।'

অঞ্জনা তবু নড়ছে না দেখে অজয় রেগে গেল। বেশ জোরে ধমক দিল সে, 'যান। নামুন খাট থেকে। নামুন!'

এ বার অঞ্জনা পুতুলের মতো নেমে এল। চলে গেল মুখ ধুতে।

দ্বিতীয় গ্লাসের বাকিটা গলায় ঢেলে দিল অজয়। প্রথম গ্লাসটা ভর্তি রয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মা ওটার ঘ্রাণ পান করেছে। আত্মার এঁটো খাওয়া কি উচিত হবে? ইচ্ছের বিরুদ্ধে জানলার পাল্লা খুলে গ্লাসের পানীয় বাইরে ফেলে দেওয়ার সময় বৃষ্টির জলে হাত ভিজে গেল। খুব আফসোস হচ্ছিল অজয়ের। ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের পয়সায় পান করত, এখন দাম দিয়ে কিনতে হলে মজা মাথায় উঠত।

দুটে থালায় খাবার সাজিয়ে তার খেয়াল হল, ঘরে একটাই আসন আছে। দ্বিতীয় মানুষের জন্য আসন রাখার প্রয়োজন হয়নি এত দিন। কিন্তু অতিথি বলে কথা। অঞ্জনার জন্য আসনটি খানিকটা দূরে পেতে থালাটা সামনে রাখতেই সে এল।

'বসুন। মেঝেতে বসে খেতে হবে।'

অঞ্জনা বসল।

'রান্না ভাল হওয়ার কথা নয়। যতটা পারবেন খেয়ে নিন।'

'আমার—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না!' করুণ গলায় বলল অঞ্জনা।

'অনেকেরই অনেক কিছু ইচ্ছে করে না। এই যে আপনাকে এই ঘরে এনেছি তা কি ইচ্ছে করে? পুলিশের ভয়ে আর গ্যাস খেয়ে।'

'গ্যাস?'

'বললাম না, বিদ্যাসাগর মশাই এমন গ্যাস দিলেন, খেয়ে নিন।'

'বিদ্যাসাগর? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর?'

'নামটা দেখছি জানা আছে। হ্যাঁ, তিনিই।'

এ বার আচমকা হেসে ফেলল অঞ্জনা।

'হাসলেন কেন?'

'না। খাচ্ছি, আমি খাচ্ছি।'

খেতে খেতে অঞ্জনা যে তার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে তা টের পেল অজয়। সে কোনও কথা না বলে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। থালা গ্লাস ধুয়ে আনার পর দেখল অঞ্জনা নিজের থালা গ্লাস ধুতে যাচ্ছে।

অঞ্জনা ফিরে এলে অজয় বলল, 'এ বার শুয়ে পড়ুন। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেই দেখবেন ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু ভোরেই বেরিয়ে যাবেন। এ পাড়ার লোকজন একটু বেলা করে ওঠে। কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না আপনাকে।'

'আপনি? সরি, আমি ওখানে শুতে পারব না।'

'কী করবেন?'

'জেগে থাকব।'

অজয় হতাশ গলায় বলল, 'আপনি কি এখনও এই ঘরে আছেন?'

কেউ কোনও সাড়া দিল না। অঞ্জনা আরও অবাক হয়ে অজয়ের মুখের দিকে তাকাল। অজয় তখন ঊর্ধ্বমুখী। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম শুনেছেন?' অজয় তাকাল।

'যিনি মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছিলেন?'

'পড়েছেন?'

'না।'

'বাঁচা গেল। আসলে দু'জনে একই নৌকায় ভাসছি। একটু আগে ভদ্রলোক এখানে এসে প্রচুর জ্ঞান দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছেন। আমার কথা তিনি শুনছেন কিনা জানি না, শুনলেও আমার কিছু করার নেই। বলেই অজয় চেঁচাল, 'জোব চার্নকের আমল বহু বছর আগে চলে গেছে স্যার। এখন কেউ মারিয়া হতে রাজি নয়। এ মেয়ে কাপড়ের পুঁটুলি নয়, যে যা ইচ্ছে তাই করানো যাবে।'

অঞ্জনা খাটের প্রান্তে বসল, 'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে? কী ভাট বকছেন? তখন বললেন বিদ্যাসাগর এমন গ্যাস দিয়েছেন, এখন মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে কথা বলছেন! আমার খুব ভয় করছে।'

'ভয়? কেন? আমাকে অ্যাবনর্মাল লাগছে?'

'নর্মাল লোক তো এই সব বলে না। এঁরা কত কাল আগে মরে গেছেন।'

'মরে যাওয়া মানেই কি সব ফিনিশ হয়ে যাওয়া? আমি যখন ট্যাক্সি নিয়ে কলেজ স্কোয়ারের সামনে দিয়ে যাই তখন মূর্তিটাকে দেখতে পাই আর ভাবি, ভাগ্যিস উনি বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা আমার কাছে বেঁচে ওঠেন। যাকগে, আপনি বসে থাকুন, আমি ঘুমাচ্ছি। সারা দিন খেটেছি, খুব টায়ার্ড। অজয় মেঝেতে এক ধারে বিছানা করে শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করেই সে হেসে ফেলল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বললেন, জোব চার্নকের মতো ওকে বিয়ে করে ফেলতে। প্রস্তাবটা এখন দিলে হয়তো এই মাঝরাত্তিরেই জল ভেঙে বেরিয়ে যাবে। সে কালে যা চলত, এখন তা চলে না।

ঘুম ভাঙতে দেরি হল। ভাঙার পর চোখ বন্ধ করা অবস্থায় মনে পড়ল গাড়িটা গাড়ির সামনে ঠিকঠাক আছে তো? তড়াক করে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দেখল, সেটা ভেজানো। ছিটকিনি খোলা। তখনই অঞ্জনার কথা মনে পড়ায় সে খাটের দিকে তাকিয়ে দেখল, চাদরটা টানটান পাতা। বাথরুমে গিয়ে দেখল, সেখানেও অঞ্জনা নেই। যা বাবা! সে চলে যাবে বলেছিল, কিন্তু যাওয়ার আগে বলে যাওয়ার ভদ্রতাটাও দেখাতে পারল না।

অজয় বাইরে বেরিয়ে দেখল, গাড়িটা আস্ত আছে। লক ভাঙেনি কেউ। চাকাও

খুলে নিয়ে যায়নি। আঃ। কী আরাম। সে ঘরে ফিরে মালিককে জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি এখন গ্যারেজে নিয়ে যাবে না সন্ধের পর গেলেই চলবে!'

মালিক খিঁচিয়ে উঠল, 'নিয়ে আসবে মানে? সমস্ত হাঁটুর উপর জল হয়ে আছে। কোথায় থাকো তুমি যে জানো না, আকাশের ডায়াবেটিস হয়েছে!'

হাতমুখ ধুয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিল অজয়। আজ কেলো হবে। কলকাতার অনেক রাস্তায় যদি জল জমে থাকে, তা হলে খুব ভুগতে হবে। প্যাসেঞ্জারগুলো গাড়িতে ওঠার আগে বৈষ্ণব থাকে, মিটার ডাউন করলে তান্ত্রিক হয়ে যায়।

দরজায় শব্দ হতেই পেছনে তাকাল। অঞ্জনা ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেশ অপরাধীর গলায় বলল, 'যেতে পারলাম না। বাস চলছে না। আবার জোরে বৃষ্টি আসছে। আমি বুঝতে পারছি না কী করব।'

'চা বানাচ্ছি। চা খান।'

'আপনি সরুন, আমি বানাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়াল অজয়। আর তখনই তার মনে হল, ঘরে একটাও বিস্কুট নেই। শার্টটা চাপিয়ে, 'আসছি' বলে বেরিয়ে পড়ল। মুদির দোকানের ঝাঁপ খোলেনি। আশপাশের দোকানও বন্ধ। চার ধার ভিজে স্যাঁতসেতে হয়ে আছে। এই সময় ঝেঁপে বৃষ্টি আসতেই সে দ্রুত একটা বন্ধ দোকানের লম্বা শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে বৃষ্টির জল থেকে বাঁচতে একজন চলে এল।

বৃষ্টি দেখতে দেখতে ছটফট করছিল অজয়। হঠাৎ খুব পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, 'ভাই অজু, এটা তুমি কী করছ? অচেনা মেয়েমানুষকে ঘরে তুলেছ?' চমকে পাশে তাকাতেই অজয় বৃদ্ধের কাতর মুখ দেখতে পেয়ে বলে ফেলল, 'আপনি!'

।। চার ।।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'এ ভাবে আমাদের বংশের মুখে চুনকালি মাখালে বাবা!'

'এ সব কী বলছেন দাদু!' অজয় প্রায় আর্তনাদ করল।

'মিথ্যে কিছু বলিনি। ভরা যৌবনের যুবতী নারীকে রাস্তা থেকে তুলে ঘরে এনে রাত কাটালে; তোমার বাবা-মা শুনলে কী হবে এক বার ভেবেছ?' বৃদ্ধ বলল।

'বিশ্বাস করুন, আমি আনতে চাইনি। ওই বিদ্যাসাগর মশাই এমন ভাবে বললেন যে অমান্য করতে পারিনি।' অজয় বলল।

'তাঁরা বড় মানুষ, তাঁদের কথা শুনলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চলে? তাঁর কথা শুনে যদি আমি তোমার বাপের বিয়ে একটা বেধবার সঙ্গে দিতাম, তা হলে সে কি মেনে নিত? আমাদের গাঁয়ের জগদীশ করণের মেয়ে বিয়ের ছয়

মাসের মধ্যে বেধবা হয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। তার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করা হয়, তুমি রাজি হবে?'

ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। জগদীশ করণের মেয়ে সুলেখা, দু'বছর আগে গাঁয়ে যখন গিয়েছিল সে তখন এক নির্জন সন্ধ্যায় অজয়কে বলেছিল, 'তুমি তো আমার দিকে কখনও তাকাওনি, কিন্তু আমি তোমাকে ধূপের মতো ভালবেসে এসেছি। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। যদি বিয়ে হয়ে যায় তা হলে জানব আমার দ্বিতীয় বার বিয়ে হচ্ছে।' অজয় কিছু বলতে পারেনি। সুলেখার বিয়ের খবরটা পেয়ে চার পেগ পান করেছিল।

এখন বলল, 'আপনি যখন সব জানেন, তখন এটাও জেনেছেন আমরা এক ঘরে থাকলেও কেউ কাউকে স্পর্শ করিনি। তা ছাড়া এই মেয়ে তো ঠাকুমার মতো কেঁচো নয়, কেউটে সাপ। ছুঁতে গেলে ছোবল মারবে। কী? জানেন না?'

'তা জানি! বললে যখন তখন বলি কেঁচোর সঙ্গে ঘর করা যায়, কেউটের সঙ্গে তো যায় না। যত তাড়াতাড়ি পারো বিদায় করো।' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

বৃষ্টিটা কমে এল তখনই। মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে গিয়ে হতাশ হল অজয়। ঠাকুর্দা নেই। যে ঠাকুর্দা আজ থেকে আট বছর আগে তালপুকুরে স্নান করতে গিয়ে হৃদরোগে মারা গিয়েছিলেন তিনি কোত্থেকে আজ এখানে চলে এলেন? গাঁয়ে গেলেই বাবা বলেন, 'এক বার গয়ায় যা অজু, বাবার পিণ্ডদান করে আয়।' অর্থাৎ পিণ্ড না দিলে ঠাকুর্দার মুক্তি হবে না। এই চরাচরে অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকবে। তা হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিণ্ড কেউ গয়ায় গিয়ে দেয়নি? কী জানি! মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো খ্রিস্টান ছিলেন। গয়াতে পিণ্ড দানের বালাই ছিল না। কিন্তু এতটা কাল এঁরা কেউ তাকে দেখা দেয়নি। কথা বলেনি। এই মেয়েকে উপকার করতে যাওয়ার পরই এই সব দর্শন পাওয়া যাচ্ছে কেন? টিপটিপে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে ঘরে ফিরে এল।

তাকে দেখে মেয়েটি বলল, 'চা বানিয়েছিলাম, সেটা জল হয়ে গিয়েছে। আবার বসাচ্ছি!' তাকে সক্রিয় হতে দেখে অজয় প্রশ্নটা না করে পারল না, 'খোলাখুলি বলো তো, তুমি কে?'

'কেন? আমাকে কি মানুষ বলে মনে হচ্ছে না?' মেয়েটি হাসল।

'তোমাকে গাড়িতে বসে বৃষ্টিতে হাঁটতে দেখলাম। পাগলের মতো হাঁটছ। তার পর আমার গাড়িতে ধাক্কা না লাগা সত্ত্বেও মাটিতে পড়ে গেলে। এমনি এমনি কেউ অজ্ঞান হয় নাকি?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ফুটন্ত জলে চা ছাড়ল।

'আমি দয়া করে যেই তোমাকে গাড়িতে তুললাম, অমনি মরে যাওয়া মানুষগুলো এসে আমাকে উপদেশ দিতে লাগল! এটা হল কেন?'

চা গুলতে গুলতে মেয়েটি বলল, 'মায়ের কাছে শুনতাম, এঁটো জামাকাপড় পড়ে শুলে নাকি খারাপ স্বপ্ন দেখে। ভূতপেত্নিরা চলে আসে। কাল দুপুরে যখন খেয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই জামাপ্যান্টে মুখের এঁটো পড়েছিল।'

অজয় কথা বলল না আর।

চা খেয়ে সে ঘড়ি দেখল। যে সব রাস্তায় জল নেই, সেই সব রাস্তায় ট্রাই করলে হয়।

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে চিন্তা করছে না?'

চায়ের কাপ-ডিশ ধুয়ে আনছিল মেয়েটি, বলল, 'এক জনই চিন্তা করবে। কিন্তু আমি তাকে খবর দেব কী করে?'

'মোবাইল ফোন নেই?'

'পাশের বাড়িতে আছে।'

নিজের মোবাইল ফোন বের করে বিছানার ওপর রাখতেই বাইরে চিৎকার শোনা গেল। কেউ এক জন তার নাম ধরে ডাকছে। অজয় দ্রুত দরজার বাইরে মুখ বাড়াতেই দেখল পাড়ার চার জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। এক জন বলল, 'আমার মায়ের বোধ হয় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আপনার ট্যাক্সি তো এখানেই, প্লিজ মাকে নিয়ে হাসপাতালে চলুন।'

'এক মিনিট আসছি।'

দরজা ভেজিয়ে অজয় বলল, 'আমাকে পেশেন্ট নিয়ে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। আপনি চটপট ফোন করে নিন।' সে বাথরুমে ঢুকল প্যান্ট নিয়ে।

সেটা পরে বেরিয়ে এসে শার্ট গলাল, 'ফোন পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'দিন ওটা। বৃষ্টি ধরলে যখন ইচ্ছা চলে যাবেন। কখন ফিরব জানি না।'

'যদি সব চুরি করে নিয়ে যাই।'

'পোষাবে না আপনার।'

পেশেন্ট তুলে হাসপাতালে পৌঁছতে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হল। জল জমে আছে খুব। তার ওপর বৃষ্টি শুরু হয়েছে নতুন করে। দু'দুবার সাইলেন্সার পাইপে জল ঢুকতে ঢুকতেও ঢোকেনি। মহিলাকে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার পর সে দেখল যারা সঙ্গে এসেছিল, তারা সবাই সঙ্গে গিয়েছে। ভাড়া পেতে হলে ওদের জন্য অপেক্ষা না করে উপায় নেই। হঠাৎ অজয়ের মনে হল, মহিলা পাড়ার একটি ছেলের মা। এই বিপদের সময় ভাড়া চাওয়াটা খুব অশোভন হবে। সে একটু ভেতরে ঢুকে খোঁজাখুজি করতেই দলের এক জনকে পেয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কি গাড়ির দরকার হবে?'

'না। থ্যাঙ্ক ইউ দাদা।'

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শু
ভ
ম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

'তা হলে চলি।'

'আপনার মিটারে কত উঠেছে।'

'দুর! উনি ভাল হয়ে উঠুন তাই চাই।'

বলতে ভাল লাগল অজয়ের।

সে গাড়ির দরজা খুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটি বেশ রোগা যুবক বসে আছে। মুখে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি। গাল ভাঙা। চোখ দু'টি খুব উজ্জ্বল। দেখেই বোঝা যায় আদৌ সুস্থ নয় যুবক।

অজয় জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

'আমি!'

'নেমে পড়ুন ভাই। এই জলে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।'

যুবক খুব ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি তো কোথাও যেতে চাই না।'

'তা হলে গাড়িতে উঠেছেন কেন?'

'যদি বলেন তা হলে নেমে যাব।' শ্বাস টানল যুবক।

'আপনি দেখছি বেশ অসুস্থ। ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ওটা সাতচল্লিশ সালের উনত্রিশ বৈশাখেই শেষ হয়ে গিয়েছে।'

অজয় থতমত খেয়ে গেল। ছেলেটা চৌষট্টি বছর আগেকার কথা বলছে। কিন্তু ওর বয়স তো একুশ বছরের বেশি নয়।

'তুমি কে?'

'আমি? আপনি কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন? মানিকদা অনুগ্রহ করে আমার কথা লিখেছিলেন। আমার মতো সাধারণকেও সম্মানিত করেছিলেন। শুনুন তবে, আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,/আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।/কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।/বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে /ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?/ কে গাইবে জয়গান?/বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে/ সে কীসের বসন্ত?'

অজয়ের গলায় বাষ্প জমল। জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে কেন?'

যুবক ম্লান হাসল, 'যাদবপুরের যক্ষ্মা হাসপাতালের মেরি হার্বার্ট ব্লকে একটি লোক জমাদারের চাকরি করত। সুভাষদারা আমাকে সেখানেই ভর্তি করেছিল চিকিৎসার জন্য। সেখানে ওই লোকটির ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন বন্ধুরা, যাতে সে আমাকে দেখাশোনা করে। আটাশে বৈশাখ রাতে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলাম। ময়লার মধ্যে পড়ে ছিলাম ঘণ্টা দুয়েক। সে আসেনি। অন্য রোগীরা জেগে উঠে আমাকে দেখে বিছানায় তুলে দিয়েছিলেন। পরের দিন আমি চলে এলাম। সেই জমাদারের চাকরি করা লোকটির তো পৃথিবীতে থাকার কথা নয়। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে হাসপাতালগুলোতে এসে দেখি ওই রকম

মুখের মানুষ এখনও এ সব জায়গায় কাজ করে কি না। কাকে খুঁজব? এখনকার সব মুখই তো ওই মানুষটির মতো হয়ে গিয়েছে। জানেন ভাই, এখনও আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন বেজে যায়। হায়, পৃথিবীর কোনও জঞ্জালই আমি সরাতে পারিনি। আমরাও নয়।' যুবক শ্বাস ফেলল, তার পর বলল, 'ভাল থাকার চেষ্টা করুন ভাই।'

অজয় মাথা নাড়ল। গলায় জমা বাষ্প যেন চোখে উঠে আসছে। সে গাড়ির দরজা খুলে আয়নায় চোখ রাখতেই দেখল পেছনে কেউ নেই। সে ঘুরে দেখল, সিট ফাঁকা।

এ সব কেন হচ্ছে। স্কুলে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা বলে প্রাইজ পেয়েছিল সে। এই হাসপাতালে সে অনেক বার রোগী নিয়ে এসেছে, কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। আজই সেই কবে চলে যাওয়া মানুষটি তার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। অজয় এখন সিদ্ধান্তে স্থির হল, ওই মেয়েটি আসার পরেই এই সব ঘটনা তার জীবনে ঘটে চলেছে।

মিটারে লাল কাপড় জড়িয়ে সে মালিকের গ্যারাজের উদ্দেশে রওনা হল। পথে অনেক হাত উঠছিল থামবার জন্যে, কিন্তু মন শক্ত রাখল সে। জল ভেঙে ভেঙে গাড়ি কোনও মতে গ্যারাজে ঢুকিয়ে মালিকের হাতে চাবি তুলে দিল। মালিক জিজ্ঞাসা করল, 'ফিরবে কী করে?'

'হেঁটে।' অজয় বেরিয়ে পড়ল।

অতটা রাস্তা হাঁটার অভ্যেস ইদানীং অজয়ের ছিল না। গ্রামে থাকতে যা অস্বাভাবিক মনে হত না, আজ তা হল। দুটো পায়ে যেন ভার বাড়ছে। বাড়ি ফিরে ভেজানো দরজা খুলে তাকে দেখতে পেল না। আবার কোথায় গেল ভাবতেই খাটের ওপর বই চাপা দেওয়া কাগজটাকে দেখতে পেল।

কোনও সম্বোধন নেই, মেয়েটি লিখেছে, 'বৃষ্টি ধরে গিয়েছে। মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে চলে যেতে পারব। গত কাল থেকে আপনি যে উপকার করেছেন, তার জন্যে আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকব। কোনও কোনও পুরুষ মানুষ যে আলাদা রকমের হয় তা আপনার জন্যে বুঝতে পারলাম। যদি কখনও এ দিকে আসি তা হলে দেখা করে যাব। আমি জানি, আপনি বিরক্ত হবেন না।' চিঠির শেষে কোনও নাম বা ঠিকানা নেই।

হঠাৎ কী রকম ফাঁকা লাগল অজয়ের। ঠাকুর্দা মেয়েটিকে তাড়াতে বলে গেলেন। অথচ ও নিজেই চলে গেল। একটা রাত সে ছিল এই ঘরে। বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। কিন্তু তবু যেন ভরে ছিল এই ঘর। চিঠিটা দ্বিতীয় বার পড়ল সে। খুব আন্তরিকতায় ভরা। অথচ নিজের ঠিকানাটা লিখল না কেন? ও কি ভয় পেল? ঠিকানা লিখলে অজয় সেখানে গিয়ে হাজির হবে?

সারাটা দিন বেকার গেল। বৃষ্টি আসছে, চলে যাচ্ছে। এক দিনের রোজগার ভাঁড়মে গেল। বেলা দুটোর সময় সে যখন দিবানিদ্রার চেষ্টা করছে, তখন দরজায় শব্দ হল। প্রায় লাফিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলতেই দেখল একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি অজয়? ট্যাক্সি ড্রাইভার?'

'হ্যা।' বেশ অবাক হল সে।

'বড়বাবু ডাকছেন, থানায় চলুন।'

দরজায় তালা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে চেপে থানায় গেল অজয়। বড়বাবু লোকটি খুব রোগা, নিরীহ দেখতে। বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় সল্ট লেকে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন তো, এই ছবির লোক দুটোকে চেনেন কি না!'

ছবিটা দেখল। ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ-স্যার। এরা কাল আমার গাড়ি আটকাতে চাইছিল। মাতাল বলে গাড়ি থামাইনি।'

'লোক দুটো কমপ্লেন করেছে আপনি ওদের চাপা দিতে চেয়েছিলেন। নম্বরটা ওরাই বলেছে। কিন্তু আমরা খবর নিয়ে জানলাম ওরা মেয়েমানুষকে গাড়িতে তুলে ফুর্তি করতে চেয়েছিল। সেই মেয়েটা পালিয়ে আপনার গাড়িতে ওঠে। চাপ দিতে ওরা কথাটা স্বীকার করেছে। সেই মেয়েটা কোথায়?'

'বাইপাসে নেমে গিয়েছিল। কোথায় বাড়ি জানি না।' ঝট করে অর্ধসত্য বলল অজয়।

'এ রকম উটকো মেয়েকে গাড়িতে তুলবেন না।'

'না স্যর, আর তুলব না।'

'যদি কেস ওঠে তাহলে খবর দেব। সাক্ষী দিতে হবে।'

'ঠিক আছে স্যর। যখনই বলবেন চলে আসব।'

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থাকল অজয়। লোক দুটো গায়ের জ্বালা মেটাতে মিথ্যে বলে ফেঁসে গিয়েছে। কিন্তু মেয়েটা কি সব সত্যি বলেছে। হঠাৎ মনে পড়ল, মেয়েটা তার মোবাইল থেকে পাশের বাড়িতে ফোন করেছিল। সে ঝট করে পকেট থেকে মোবাইল বের করল।

।। পাঁচ ।।

নম্বরটা বের করতে কয়েক সেকেন্ড লাগল। টিপতেই রিং শুনতে পেল অজয়। তার পর গলা ভেসে এল, 'হ্যালো! কাকে চাই?'

'নমস্কার। আমি কলকাতা থেকে বলছি। যদি কিছু মনে না করেন তা হলে অঞ্জনাকে ডেকে দেবেন? ও বোধ হয় আপনাদের পাশের বাড়িতে থাকে।' অজয় সবিনয়ে বলল।

কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে যিনি ফোন ধরেছিলেন, বললেন, 'ধরুন, দেখছি!'

এক দুই করে প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল। অজয়ের সন্দেহ হল লাইন চালু আছে কি না। তার পরেই এক জন বয়স্কার গলা কানে এল, 'হ্যালো।'

'নমস্কার। অঞ্জনা বাড়িতে আছে?'

'আপনি কে বলছেন?' গলার স্বর বেশ সরু।

'আমার নাম অজয়। অঞ্জনা আমাকে চেনে।'

'সে তো বাড়িতে নেই।'

'ও। এলে বলবেন যার ট্যাক্সিতে সে সল্ট লেক থেকে এসেছিল, তাকে যেন একটা ফোন করে। আমার ফোন নম্বরটা লিখে রাখবেন?'

'আমার কাছে কাগজকলম নেই। আপনি পরে ওকে ফোন করবেন।'

'একটা কথা, কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'সমস্যা! থানা থেকে লোক এসেছিল। ওকে দেখা করতে বলেছে। তাই শুনে আবার বেরিয়ে গেল। কী হয়েছে তা বললই না।'

'আচ্ছা, রাখছি।' মোবাইল ফোন অফ করল অজয়।

অজয় বুঝতেই পারছিল না ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছে। ওই লোকগুলো পুলিশের হাতে পড়েছে। পড়ে তার ট্যাক্সির নম্বর দিয়ে ঘোঁট পাকাতে চেয়েছে। নম্বর পেয়ে পুলিশ নিশ্চয়ই গ্যারাজে খোঁজ করে তার কথা জানতে পেরেছিল, নইলে এখানে আসবে কী করে! আশ্চর্য ব্যাপার হল, গ্যারাজের মালিক তো তাকে ফোন করে কারণ জানতে চাইল না। অথচ জ্ঞান দেয়, 'আমার ট্যাক্সির ড্রাইভার যদি পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা বাধায়, তা হলে আমি হাত তুলে দেব।' সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু পুলিশ কেন খোঁজ করছে তা জানতে চাইছে না, এটা অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অঞ্জনার বাড়ির ঠিকানা পুলিশ পেল কী করে? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিল না সে।

নিজেকে গালাগাল দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে অজয়। কী দরকার ছিল পরোপকার করার! অঞ্জনা জলে-কাদায় ডুবে পড়ে থাকত রাস্তায়। পাশ কাটিয়ে

চলে এলে এই সব ঝামেলা ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। সে চিৎকার করল, 'এই যে স্যর, আপনি কি ধারে-কাছে আছেন? শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? মেয়েটাকে গাড়িতে তুলেছিলাম বলে খুব পিঠ চাপড়েছিলেন। আরে আপনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আপনাকে যা করলে পাবলিক হাততালি দিয়েছে, এখন আমি করলে পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে। আপনি জ্ঞান না দিলে কি ওকে এই ঘরে নিয়ে আসতাম? আমি জানতাম আপনি মাইকেল মধুসূদনের দরদি বন্ধু। অথচ ওর ভয়ে যে কেটে পড়েছিলেন, তা জানতাম না। কী দরকার ছিল আমাকে পাম্প দেওয়ার। এই বাংলায় আকাশে বাতাসে যেমন মিশে ছিলেন, তেমনি থাকতে পারতেন! যত্ত সব!'

গ্যারাজের মালিকের ফোন এল অনেক পরে। পরিষ্কার কথা, 'অজয়, এখন কয়েক দিন বিশ্রাম করো। আমি অন্য লোককে গাড়ি দিচ্ছি।'

'কেন?' অজয়ের গলা শুকিয়ে এল।

'উত্তরটা তোমার জানা।' লাইন কেটে দিল লোকটা।

মেজাজ বিগড়ে গেল। কলকাতা শহরে গ্যারাজের অভাব নেই। আজ অবধি এক বারও তার বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অপরাধে পুলিশ চিঠি পাঠায়নি। চাইলে আজই সে আর একটা ট্যাক্সি পেতে পারে। কিন্তু অজয় ঠিক করল লোকটা যখন তাকে বিশ্রাম নিতে বলল তখন তাই নেবে। গ্রামে গিয়ে দিনরাত ঘুমাবে।

সারাদিন ঘরেই কাটাল সে। বিকেলে বেরিয়ে চারশো গ্রাম খাসির মাংস কিনে এনে ঠিক করল আজ রাতে জমিয়ে খাবে। মাংস ভাল করে কষে রান্না শুরু হলে গ্লাসে মদ ঢালল অজয়। কাল গ্রামে গেলে ক'দিন মদ খাওয়া বন্ধ। আত্মীয়স্বজনরা ভাবতেই পারে না ওখানে বসে কেউ মদ খাচ্ছে।

দুটো চুমুক দেওয়ার পর সে আবার অঞ্জনাকে ফোন করল। যে সাড়া দিল সে কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'রাতে ডেকে দেওয়া সম্ভব নয়।'

যাচ্চলে! তখনই খেয়াল হল, সে কেন অঞ্জনার সঙ্গে কথা বলতে ফোন করছে? কী দরকার? ক'বার সে যেচে বাঁশ নেবে?

দ্বিতীয় গ্লাস ভরার সময় নাকে গন্ধ এল। মাংসটা বেশ বাস ছাড়ছে।

'বেশ আছ। বেড়ে আছ। চালিয়ে যাও!'

গলাটা কানে আসতেই চমকে সে দরজার দিকে তাকাল। একটা লিকলিকে লোক মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে আছে। সে ফিসফিস করল, 'আপনি কে?'

'আমি কেউ না। এক কালে মাল খেতাম। হুইস্কি, ব্রান্ডি, ওয়াইন, কিন্তু ভুলেও দিশি গলায় ঢালিনি। তোমাকে জম্পেশ করে মাল খেতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। খাও দেখি!'

অজয় হাসল, 'দরজা বন্ধ যখন তখন আপনি নিশ্চয়ই...!'

'হাওয়ায় মিশে থাকি। এক কালে অভিনয় করতাম। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কার সঙ্গে করিনি। আঃ, খাও, না!' ধমকালো লোকটা।

টুক করে এক ঢোঁক গিলল অজয়।

'আঃ!' লোকটা গেলার আওয়াজ করল।

'আপনার নামটা যদি দয়া করে বলেন?'

'এক্সট্রা।' বেশ গম্ভীর গলায় জবাব এল।

'মানে বুঝলাম না।' অজয় বলল।

'টালিগঞ্জের স্টুডিয়োতে কখনও যাওনি মনে হচ্ছে। আমি রোজ যেতাম। মুখ দেখানোর পার্ট পেলে আনন্দের সঙ্গে করতাম। আমাদের বলা হত এক্সট্রা। চাকরবাকরদের চরিত্রে চান্স পেতাম না। সে সব করতেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানী, আশুদারা। কপালে দুটো হাত ঠেকাল লোকটা, এঁরা জাত অভিনেতা ছিলেন। একটা সংলাপ, তাই সই, বলতেন, কোনও চরিত্রই ফ্যালনা নয়। আমার ভাগ্যে মাত্র দু'বার সংলাপ জুটেছিল। প্রীতিদা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এক টেকে ওকে। ডিরেক্টর হতভম্ব। বলে, 'বাঃ। পরের ছবিতে আপনাকে বড় চরিত্রে ভাবব।' আমার কপাল, তার আগেই বেচারা ছবি হয়ে গেল। আঃ, খাচ্ছ না কেন?' ধমকাল লোকটা।

তাড়াতাড়ি আর একটা চুমুক দিয়ে অজয় বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমার কাছে আপনি কী মনে করে এলেন?'

'শুনলাম মধুসূদন দত্ত নাকি এখানে এসেছিল। ওই মাপের মানুষ তো কারণ ছাড়া আসবেন না। এসে দেখলাম তুমি মাল খাচ্ছ। আহা গন্ধে বুক ভরে গেল গো। শোনো, দুটো জিনিস তোমাকে বরবাদ করে দিতে পারে। মেয়েমানুষ আর মদ। প্রথমটা আমার কাছে হার মেনেছিল। ফিল্মে অভিনয় করলেও সারা জীবন চরিত্র হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছি। কিন্তু ওই মদই লিভার পচিয়ে দিয়েছিল। তুমি বোধ হয় জানো না, মধুসূদন দত্তেরও একই কেস। কিন্তু ঠিক সময়ে যদি কন্ট্রোল করতে পারো, তা হলে কোন সমস্যাই হবে না। তা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওই মেয়েমানুষটার সঙ্গে যখন তুমি বিদ্যেসাগরী ব্যবহার করলে তখন আর পেছনে ছুটছ কেন?'

'আপনারা সব জানতে পারেন, তাই না?'

'যে চায় সে পারে। মজাও হয়। এই ক'দিন আগে এক জন গিয়ে বিদ্যেসাগর মশাইকে নমস্কার করে বলল, 'আপনি সাঁতার জানেন?'

বিদ্যেসাগর মশাই অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিলেন, 'না হে।' ব্যস, রটে গেল যিনি সাঁতার জানতেনই না, তিনি কী করে বর্ষাকালে ভয়ানক দামোদর পার হয়ে

গিয়েছিলেন মায়ের কাছে? আবার এক জন এসে আমায় বলল, তুমি তো একটু আধটু অভিনয় করতে, দাড়ি গোঁফ পরতে হত?

তা আমি বললাম, 'নাটক করতে গিয়ে কত পরেছি।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুলে যেত না?'

বললাম, 'যেত না আবার। পঞ্চাশ বছর আগের ব্যাপার, প্রায়ই খুলে যেত আঠা। সব সময় সতর্ক থাকতে হত।'

তা শুনে সে কী বলল জানো? বলল, 'তা হলে মুখে দাড়িগোঁফ লাগিয়ে আফগান সেজে সুভাষ বসু ট্রেনে চেপে যে ভারতবর্ষের এ ধার থেকে ও ধারে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দাড়িগোঁফের আঠা খুলল না কেন? খুললে তো যাওয়া হত না!'

শুনে অজয় ভাবতে বসল। কলেজে পড়ার সময় সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের বর্ণনা সে পড়েছিল। ঠিক কী পড়েছিল মনে করতে চেষ্টা করছিল।

কয়েক সেকেন্ড পরে মুখ তুলে দেখল লোকটা নেই! সে গলা তুলে ডাকল, 'এক্সট্রাবাবু! আপনি কি চলে গেলেন?'

কোনও সাড়া এল না। এতক্ষণ ঘরে কেউ ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। গ্লাসের দিকে তাকাল সে। গুরু বলেছিলেন, খবরদার দুই পেগের বেশি কখনওই খাবি না। আদেশ মেনে চলেছে সে। কিন্তু অঞ্জনার পেছনে সে ছুটছে, এমন অভিযোগ কেন করল লোকটা? কৌতূহলী হয়ে সে দু'বার ফোন করেছিল, সেটাকে কি ছোটা বলে? মাংস ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ল অজয়।

সকালে উঠে চা খেয়ে স্নান সেরে সে যখন গ্রামে যাওয়ার জন্যে দরজায় তালা দিচ্ছে, তখন পুলিশটাকে দেখতে পেল। ইউনিফর্ম না পরা থাকলেও বিহারি পুলিশগুলোকে সহজেই চেনা যায়। ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে বুট জুতো পরে তার সামনে এসে বলল, 'ড্রাইভারভাই, আপনাকে এখন থানায় যেতে হবে।'

'কেন?' প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

'আপনি হয় যাবেন, নয় বলুন যাবেন না।'

তর্ক করে লাভ নেই। লোকটার সঙ্গে পনেরো মিনিট হেঁটে থানায় পৌঁছল সে। সকালবেলায় থানা আর বিয়ের রাতের পরের সকালের ছাদনাতলার চেহারায় বেশ মিল আছে। ঝোলা ব্যাগটাকে নিয়ে অজয়কে বসে থাকতে হল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তার পর বড়বাবু এলেন। ব্যাগ দেখেই বললেন, 'কোথায় পালানো হচ্ছে?'

'পালাচ্ছি না। দেশে যাচ্ছি।'

'নো। এখন স্টেশন ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না। বসো আসছি।'

আরও আধঘণ্টা পর বড়বাবুর ঘরে ডাক পড়ল। সেখানে যেতেই বড়বাবু

বললেন, 'তোমাকে দেখলে ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। যা জিজ্ঞাসা করছি তার ঠিকঠাক জবাব দেবে।'

অজয় চুপ করে থাকল।

'মেয়েছেলেটাকে কত দিন ধরে চেন?'

'কার কথা বলছেন?'

'আঃ।'

'যে মাটিতে শুয়ে সিমপ্যাথি আদায় করে গাড়িতে উঠে বলত টাকা দিন নইলে ইজ্জত নিচ্ছেন বলে চেঁচাব? সল্ট লেকে যাকে তুলেছ সে চেঁচায়নি, কারণ তোমার চেনা মেয়েছেলে। কত দিন চেনো?' বড়বাবু চোখ বড় করলেন।

'বিশ্বাস করুন, ওকে আমি আগে কখনও দেখিনি।'

'তা হলে সে চেঁচিয়ে পাবলিক ডাকল না কেন?'

'আমি জানি না। বিদ্যাসাগর মশাই...।' বলেই থেমে গেল অজয়।

'কোন বিদ্যাসাগর? কোথায় থাকে? সে আসছে কেন এর মধ্যে?'

'আজ্ঞে, যিনি বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন। সত্যি কথা বলতে বলেছিলেন। মানুষের উপকার করতে বলেছিলেন, বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আর ইউ ম্যাড?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বড়বাবু।

'আজ্ঞে, না স্যর।' মাথা নাড়ল অজয়।

'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। যদি তা করি তা হলে জেনো, শি ইজ আ কলগার্ল। ওই সল্ট লেকের মাতাল দুটো কীসের অফিস চালায় জানো?'

'না স্যর।'

'খবরের কাগজের সেকেন্ড পাতায় পত্র-মিতালির বিজ্ঞাপন দেখেছ? টাকা খরচ করে ঠকবেন না। মনের মতো বান্ধবী পাবেন। ফোন নম্বর দেওয়া থাকে বিজ্ঞাপনে। ওই লোক দুটো এই ব্যবসা শুরু করেছিল। কলগার্ল মেয়েটি দেখল নিজে খদ্দের খুঁজলে অনেক হ্যাপা, তাই ওদের ওখানে অ্যাপ্লাই করেছিল। কলকাতায় মালদার লোকজন গোপনে বন্ধুত্ব চাইলে ওরা একে কাজে লাগাবে। কমিশন নেবে। হুঁঃ।' বড়বাবু মাথা নাড়লেন।

'তা হলে সে পালাল কেন?'

'প্রথম দিন খদ্দের হাতের কাছে না থাকায় ওরা ট্রায়াল নিতে চাইছিল। মেয়েটা বিনা পারিশ্রমিকে রাজি হয়নি। তাই পালিয়েছিল। ওর অ্যাপ্লিকেশনের ঠিকানা দেখে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। সে বাড়ি ফিরেই যখন শুনেছে আমরা খোঁজ করছি, অমনি হাওয়া হয়ে গিয়েছে। অবশ্য ওই লোক দুটো ফেঁসে গেছে। অনেক শিক্ষিত ভদ্র মেয়ের নাম ঠিকানা ওদের অফিসে পাওয়া গিয়েছে। এ রকম উটকো মেয়েকে আর গাড়িতে তুলো না। মেয়েটাকে যদি কয়েক দিনের মধ্যে না পাওয়া যায়, তা হলে কেস ড্রপ করে দেওয়া হবে। অন্য মেয়েদের সাক্ষী করে কেস চলবে। কোথায় দেশ?'

'আজ্ঞে মেদিনীপুরে।'

'তাই বিদ্যাসাগরের নাম করেছিলে। যাও, ফিরে এসে দেখা কোরো।'

অজয়ের মনে হল অঞ্জনা যদি চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায়, তা হলে তাকে আর ঝামেলায় পড়তে হবে না।

।। ছয় ।।

ধর্মতলা থেকে বাস ধরে রামনগরে নেমে অটোয় উঠতে হবে। কিন্তু ফিরে আসতে হল অজয়কে। বাসে উঠেই পকেটে হাত চেপে বুঝল মোবাইলটা নেই। পকেটমার হল? চোখ বন্ধ করে ভাবল সে। তার পর মনে হল, তাড়াহুড়োর সময় বেরোবার আগে ওটার কথা সে ভুলে যায়নি তো? এক বার মনে হল, ঘরে পড়ে থাকলে থাক। ক'দিন পরে এসে দেখবে ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে, এই তো! তাকে জরুরি ফোন করার মানুষ তো বেশি নেই। এ রকম ভাবলেও মন থেকে খচখচানিটা গেল না। সে নেমে পড়ল বাস থেকে।

দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকেই সে মোবাইল ফোনটাকে দেখতে পেল। খাটের এক পাশে পড়ে আছে। তুলে দেখল চার বার মিসড কল হয়ে গেছে। চার বারেই একই নম্বর থেকে কল এসেছিল। সে নম্বরটা টিপল। একটু পরেই যে ফোন ধরল, সে জানাল ওটা এসটিডি বুথের নম্বর। ওকে কে ফোন করেছিল তা ছেলেটি জানে না।

ঘড়ি দেখল অজয়। থানা এবং বাস থেকে ফিরে আসতে যে সময় নিয়েছে, তাতে এখন রওনা হলে গ্রামে পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। দুপুরের খাওয়া কোথায় জুটবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে বারোটা নাগাদ রওনা হলে সে সন্ধের পরেই পৌঁছে যাবে। কোনও হ্যাপা থাকবে না। জামাপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা পরে রান্নার জন্যে কাজে হাত লাগাল অজয়, ঠিক তখনই দরজায় শব্দ হল।

পিছন দিকে না তাকিয়ে অজয় চিৎকার করল, 'কে?'

ভেজানো দরজা খোলার শব্দ হল। তার পর চুপচাপ।

অজয় পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হল। অঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে। খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে। চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল। উঠে দাঁড়াল অজয়, 'কী ব্যাপার?'

ঠোঁট কামড়াল অঞ্জনা। তার পর মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন কেন?'

প্রশ্নটা আশা করেনি অজয়। সেই সঙ্গে তার মনে হল মেয়েটাকে পুলিশ খুঁজছে। তার এই ঘরে যদি খুঁজে পায়, তা হলে দেখতে হবে না। হাজারটা

ঝামেলায় তাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। সে গম্ভীর গলায় বলল, ‘ ফোন করেছিলাম কারণ আমি চাই না তুমি এখানে আর আসো। তোমাকে পাইনি বলে জানাতে পারিনি।’

‘ও। কথাটা তো মাকে জানিয়ে দিতে পারতেন!’

‘আমি ওঁকে বিব্রত করতে চাইনি।’

অঞ্জনা পাশ ফিরল। অজয় বুঝতে পারল চলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওর মধ্যে কোনও দুশ্চিন্তা কাজ করছে।

‘তোমাকে দেখে যদি বুঝতে পারতাম তুমি ওই ভাবে উপার্জন করো, তাহলে কখনওই এখানে নিয়ে আসতাম না।’ অজয় বলল।

অদ্ভুত চোখে তাকাল অঞ্জনা।

‘একটা কথা, তুমি প্ল্যান করে আমার গাড়ির সামনে শুয়ে পড়েছিলে। জানতে আমি ব্রেক কষবই, তোমাকে অজ্ঞান ভেবে গাড়িতে তুলে নেব। সবই যখন ঠিক ছিল, তখন আমাকে ব্ল্যাকমেল করোনি কেন? টাকা না চেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার ভান করেছিলে কেন? তার পর যখন এই ঘরে এলে তখনও তো দারুণ সুযোগ পেয়েছিলে। টাকা চেয়ে না পেয়ে চিৎকার করলে পাড়ার লোকেরা আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে জেনেও কিছু করোনি। এ রকম তো তোমার করার কথা নয়।’ অজয় বেশ কেটে কেটে কথাগুলো বলল।

‘আমি যাচ্ছি।’ অঞ্জনা নিচু গলায় বলল।

‘আমি তোমাকে আসতে বলিনি। কিন্তু এসেছ যখন জবাব দিয়ে যাও।’

‘আমার কিছু বলার নেই।’ মাথা নাড়ল অঞ্জনা।

‘থানায় বড়বাবু আমাকে ধমকালেন, তুমি এক জন কলগার্ল, তোমাকে কেন আমি গাড়িতে তুলেছি। সত্যি বলছি, তুমি তাই বুঝলে কখনও গাড়িতে তুলতাম না।’

‘এখন তা হলে বুঝতে পেরেছেন!’ সোজাসুজি তাকাল অঞ্জনা।

‘তুমি বলেছ যে হটরের কাছে থাকো। চাকরি খুঁজতে সল্ট লেকে এসেছিলে। কী চাকরি? না যে সব লম্পট পুরুষ মোটা টাকার বিনিময়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে সঙ্গিনী খোঁজে, তাদের আনন্দ দেওয়ার চাকরি। তাই না?’

‘ওখানে যে ওই ধরনের কাজ করাবে, তা আমি জানতাম না।’

‘কাকে বোঝাচ্ছ? সবাই জানে আর তুমি জানো না?’

‘একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?’ হঠাৎ গলায় অন্য সুর বাজল অঞ্জনার।

অজয় কথা না বলে তাকিয়ে থাকল।

‘সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়, সিগারেট মৃত্যুকে ডেকে আনে। সরকার এই কথাগুলো হাজার বার প্রচার করছে। কিন্তু সিগারেটের দোকানগুলো বন্ধ করছে

না কেন? সিগারেট তৈরি করে যে সব কারখানা, তা উঠিয়ে দিচ্ছে না কেন? জেনেশুনে সাধারণ মানুষকে মরতে সাহায্য করছে না? বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল পাবলিক রিলেশনের চাকরি। কী বুঝব তাতে? কিন্তু খবরের কাগজে ওরা যখন বান্ধবী চাই বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে টাকা খরচ করে, তখন পুলিশ চোখ বন্ধ করে থাকে কেন? সবাই তো জেনেশুনে অন্ধ হয়। আর আমি বোকার মতো ফাঁদে পা দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু পুলিশ যে বলল...!'

'কী বলল? আমি কলগার্ল? ঠিক আছে, আমি থানায় যাচ্ছি।' অঞ্জনা দরজার দিকে পা বাড়তেই অজয় নার্ভাস হয়ে গেল। আগামী সাত দিন যদি পুলিশ অঞ্জনাকে না পায়, তা হলে ওর বিরুদ্ধে কোনও কেস রাখবে না। যদি পায় তা হলে অজয়কে টানাটানি করবে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে। সে বেশ কাঁপা গলায় ডাকল, 'শোনো।'

অঞ্জনা দরজায় হাত রেখে দাঁড়াল।

'তোমার বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। আমি তখন ছিলাম না।'

'খবর পেয়ে তোমাদের থানায় যাওনি কেন?'

'প্রথমে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পরে ঠিক করলাম আমার কাছে কী করে গেল, তা হয়তো আপনি জানতে পারেন। তাই এসেছিলাম।'

'তুমি ওই খাটে বসো।'

'মানে?' অবাক হল অঞ্জনা।

'এখনই থানায় যাওয়ার দরকার নেই।'

'কেন? ওরা আমাকে কলগার্ল বলবে আর আমি মেনে নেব?'

'তুমি প্রমাণ করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে ওদের প্রমাণ দিতে হবে।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। পুলিশ ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। ওরা দিনকে রাত করে দিতে পারে এক নিমেষে। বসো।'

'এক জন কলগার্লকে জেনেশুনে নিজের বিছানায় বসতে বলছেন?'

'কী করব! আমার ঘরে কোনও চেয়ার নেই।'

'কী বলতে চাইছেন তা বলুন।'

'পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করে কোনও লাভ হবে না। তার চেয়ে দিন সাতেক ওদের এড়িয়ে থাকো, কেস ড্রপ হয়ে যাবে।' অজয় বলল।

'তার মানে? আমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে অথচ আমাকেই ওরা দোষী করেছে? উঃ, এটা আমি মেনে নেব?'

'না মেনে করবে কী? সব সময় মাথা গরম করে কোনও লাভ হয় না। সাত দিন পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।' অজয় বলল।

মাথা নাড়ল অঞ্জনা। বোঝা যাচ্ছিল প্রস্তাব মেনে নিতে তার অসুবিধে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'কোথায় যাব। আমার তো একটাই জায়গা, মায়ের কাছে।'

'সর্বনাশ! সেখান থেকে থানায় নিয়ে যেতে পুলিশের সুবিধে হবে। আর কোনও আত্মীয় নেই?'

'না। আমার মা ছাড়া কেউ নেই।'

'যাচ্চলে।' চিন্তায় পড়ল অজয়।

'আপনি এত ভাবছেন কেন?' অঞ্জনা প্রশ্নটা করা মাত্র দরজায় শব্দের সঙ্গে হাঁক শোনা গেল, 'অজয় ড্রাইভার আছেন?'

দ্রুত অঞ্জনাকে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে অজয় বলল, 'এখানে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়াও, প্লিজ।'

বাইরের দরজা খুলতেই সে সকালবেলার পুলিশটাকে দেখতে পেল। লোকটা হাসল, 'আসুন, বড়বাবু গাড়িতে বসে আছেন।'

বাধ্য হয়ে লোকটাকে অনুসরণ করে গলির মোড়ে এসে বড়বাবুকে দেখতে পেল অজয়। গাড়িতে বসে তিনি বললেন, 'এখনও গ্রামে যাওনি?'

'যাচ্ছিলাম...।'

'সমস্যা হয়ে গেল। ওই লোক দুটো বেল পেয়ে গেছে। পিছনে পলিটিক্যাল হাত ছিল। মনে হচ্ছে কিছু প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই মেয়েটাকে যদি পাওয়া যায়, তা হলে ওরা ফেঁসে যাবে। আমরা মেয়েটাকে চাইছি ওরা জানে। ওরা চাইবে না সেটা। খুনটুনও করে ফেলতে পারে। মুশকিল হল, মেয়েটা বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে এলে প্রাণে বেঁচে যেত। তোমার সঙ্গে যোগাযোগ হলে বোলো এ কথাটা। তিন দিন পরে কোর্টকে জানাতে হবে। নইলে কেস ড্রপ হয়ে যাবে। আচ্ছা...।'

বড়বাবু পুলিশটাকে নিয়ে চলে গেলেন।

আর এক সমস্যা তৈরি হল। এখন শুধু পুলিশ নয়, ওই মাতাল দুটো লোকও অঞ্জনাকে খুঁজবে। কেস ড্রপ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটাকে লুকিয়ে রাখতেই হবে। নইলে লোক দুটো তাকেও ফাঁসাতে পারে। ওর ঠিকানা তো বের করতে ওদের বেশি দেরি হবে না। ঘরে ফিরে ব্যাগটা তুলে অজয় বলল, 'চলো।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল অঞ্জনা, 'কোথায়?'

'ওই মাতাল লোক দুটো তোমাকে খুঁজছে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। খুন করবে বলে। ওদের অপরাধের সাক্ষীকে রাখতে চাইবে না। চলো।'

দরজায় তালা দিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল অজয়। পিছনে অঞ্জনা।

বড় রাস্তায় পৌঁছে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'মাথা কাজ করছে না। তোমাকে নিয়ে গ্রামে যাওয়া যাবে না। হাজারটা প্রশ্ন শুনতে হবে। কলকাতায় কোনও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই, যার বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাব। চলো, ওই বাসে উঠি।' হাত নেড়ে বাসটাকে থামাল অজয়।

অঞ্জনা মেয়েদের সিটে, অজয় একেবারে পিছনে। ঝাঁকুনি লাগছে বেশ। বাস যখনই একটু থামছে, তখনই কন্ডাক্টর যাত্রীদের তোলার জন্যে জায়গাগুলোর নাম হাঁকছে। অজয় বুঝতে পারল এই বাস কলকাতা ছাড়িয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যায়। এখনও টিকিট চায়নি কন্ডাক্টর। চাইলে কোথায় নামার কথা বলবে সে? প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়ল সে। জানলার লোকটা নেমে যেতে সে সরে বসে রাস্তা দেখতে লাগল। সাইকেল রিকশা চলছে।

'তোমার কি মাথা স্থির নেই?' প্রশ্নটা পাশ থেকে ভেসে আসতেই অজয় চমকে উঠল। আড়চোখে পাশের আসনে তাকিয়ে সে খুব হতাশ হল। সেখানে কেউ বসে নেই। নতুন যাত্রী ওঠেনি। অথচ কথাগুলো পাশ থেকেই কেউ বলেছে। সে চার পাশে চোখ বুলিয়ে বুঝল কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই।

' কোথায় যাচ্ছ, নিজেই জানো না?' আবার শুনতে পেল অজয়।

চোয়াল শক্ত হল। আশেপাশের কেউ যে কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না, তা মুখগুলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে। সে ঠোঁট চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে? আপনি কি এই বাসেই আছেন?'

'অবশ্যই। আমি তোমার বুকের ভেতরে বসে আছি হে। সে-দিন তোমার প্রশংসা করেছিলাম, পথ থেকে তুলে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছিলে বলে। আজ তুমি পুলিশের ভয়ে সেই মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছ? কোথায় পালাবে? তার চেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাও, শান্তি পাবে।'

খেপে গেল অজয়, 'ওঃ, আপনি! আপনার জন্যে আমার এই দুরবস্থা। এখন আপনি আমার ভেতরে ঢুকে বসে আছেন?' কোনও উত্তর নেই। বুকে হাত বোলালো অজয়, কী মুশকিল।

হঠাৎ খুকখুক হাসি কানে এল, 'ব্রাদার, তোমাকে সাবধান করেছিলাম, ওই বামুনটার কথায় কান দিয়ো না। ও যদি আমার পাশ থেকে সরে না যেত, তা হলে আমি আর একটা মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে পারতাম। কিন্তু মেয়েটা ভাল।'

'আপনি কোথায়?' অজয় নীরবে প্রশ্ন করল।

'তোমার ভেতরে। জায়গাটা ভাল, কিন্তু বামুনটাও এখানে ঢুকে পড়েছে।'

'মরেছে! ভেতরটা কি ধর্মশালা না আত্মাশ্রম?' নীরবে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল অজয়। কোনও জবাব এল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কে কে আছেন? ঠাকুর্দা? সেই এক্সট্রাবাবু? আপনারাও কি আছেন?' কোনও জবাব না আসায় অজয় বুঝতে পারল আপাতত দু'জনই তার বুকের বাসিন্দা। বাস এখন প্রায় খালি। সে উঠে অঞ্জনার কাছে গিয়ে বলল, ' কোথায় নামা যায় বলো তো?'

অঞ্জনা উঠে দাঁড়াল, 'চলুন, সামনেই নেমে পড়ি।'

ভাড়া মিটিয়ে ওরা যেখানে নামল সেখানে তেমন দোকানপাট নেই, রাস্তা শুনশান। হঠাৎ অজয় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে বুকের বাসিন্দারা, এ বার কী করব, আর একটু জ্ঞান দিন!'

'ওমা! আপনার বুকের ভেতরে অনেকে আছে বুঝি? তা হলে আমাকে নিয়ে এলেন কেন? পুরুষমানুষরা বোধ হয় এই রকমই হয়।' বলে অঞ্জনা হনহন করে হাঁটতে লাগল। দূরত্ব কমাবার জন্যে পা চালাল অজয়। দূরত্ব কমছে।

মাটি পায় না তাকে

দুপুর থেকে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বিকেলে তা প্রবল হল। নীপা তাই দেখে আপত্তি জানাল, "মা, তোমাকে আজ যেতে হবে না।"

অপর্ণা অবাক হলেন, "কেন রে?"

"কী ভয়ঙ্কর বৃষ্টি পড়ছে। ট্রেন ছাড়বে কি না কে জানে, আর ছাড়লেও মাঝপথের কোথাও যদি আটকে যায় তো গেল। তুমি একা যাচ্ছ। আর মাসখানেক থেকে গেলে আমরাই তোমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারতাম।" নীপা বলল।

"এতদিন বাড়ি ছেড়ে থাকা যায়? দু'হপ্তা তো হয়ে গেল। তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিস। পথে একটুও অসুবিধায় পড়ব না।" অপর্ণা হাসলেন।

জামাই দিবাকর এল ঘরে। "আমার মনে হয় আপনি কাল যান। যদি আপত্তি না থাকে তাহলে প্লেনের টিকিট কেটে দিচ্ছি।"

"না বাবা। ট্রেনই ভাল। তোমরা চিন্তা করো না।" অপর্ণা বললেন।

পাঁচ মিনিট পরে স্বামী-স্ত্রী তাদের শোওয়ার ঘরে গেলে দিবাকর বলেছিল, "যাই বল, তোমার মায়ের হেভি এনথু আছে।"

কপালে ভাঁজ পড়ল নীপার, "তার মানে?"

"একা চলাফেরা করতে একটুও ভয় পান না। তুমি হলে নিশ্চয়ই যেতে না। কত বয়স হল ওঁর?" দিবাকর নীপার দিকে তাকাল।

"শাশুড়ির বয়স জানতে চাইছ?"

"আশ্চর্য! এতে অপরাধ কোথায়?"

"মায়ের পঁচিশ বছর বয়সে দাদা হয়েছিল। তার পাঁচ বছর পর আমি।"

"বাপস। তোমার দাদার বয়স এখন কত? চল্লিশ। তোমার পঁয়ত্রিশের সঙ্গে পাঁচ প্লাস করছি। তাহলে আমার শাশুড়ি মায়ের বয়স এখন পঁয়ষট্টি, ফাটাফাটি!"

"মানে?"

"এই বয়সে কী ফিগার রেখেছেন ভদ্রমহিলা। ভাবা যায় না!"

"তোমার লজ্জা করছে না মায়ের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে?"

"একটাও লজ্জা করার মতো কথা বলিনি। আসলে আমরা বাঙালিরা, মা-মাসিদের দেবীর আসনে বসিয়ে দূরত্ব তৈরি করে খুশি থাকতে চাই। তাঁরাও যে মানুষ এ কথা ভাবলে আমাদের খারাপ লাগে।"

"তাহলে মাকে তোমার বক্তব্য জানিয়ে আসি?"

"দুটো প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হয় বদহজম হয়ে যাবে নয় হজম করবেন। খামোকা ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী?" দিবাকর হাসল।

বৃষ্টি পড়েই চলছিল। অপর্ণা বলেছিলেন, "তোদের যেতে হবে না। ড্রাইভার তো আছে, কোনও অসুবিধা হবে না।"

মেয়ে-জামাই শোনেনি আপত্তি! মেঘ এবং বৃষ্টির জন্যে আজ তাড়াতাড়ি আলো নিভেছিল। গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার। বলল, "পাহাড়ে ধস নেমেছে।"

নীপা মুখ ঘোরাল, "শুনলে?"

"শুনলাম। কিন্তু আমরা তো পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি না। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় যেতে কোনও পাহাড় পড়ে না।" অপর্ণা হাসলেন।

দিবাকর বলল, "টিয়া যদি আজ এখানে থাকত তাহলে আপনি যেতে পারতেন না। ওর মন খারাপ হয়ে যাবে বলে আপনার আসার খবরটা ওকে দিইনি।"

"ওকে খুব মিস করলাম। কলকাতার বদলে দিল্লিতে পড়তে পাঠালে, আমার কাছে থেকে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারত। এবার ছুটিতে আসার সময় ও যেন কলকাতা হয়ে শিলিগুড়িতে আসে। সেইভাবে টিকিট কেটে রাখবে।" অপর্ণা বললেন।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে যাতে ভিজে না যায় তাই দিবাকর তিনটে ছাতা এনেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিজতে হল। প্ল্যাটফর্মে পা রাখার আগে অপর্ণা বললেন, "এই বৃষ্টিতে তোমরা আর অপেক্ষা করো না।"

"আগে আপনার কামরা খুঁজে বের করি।" দিবাকর বলল।

অন্যদিনের থেকে আজ প্ল্যাটফর্মে ভিড় অনেক কম। এসি টু টিয়ারে তখন পর্যন্ত প্রচুর জায়গা খালি। মেয়ে-জামাই তাঁকে যত্ন করে বসিয়ে দিলে অপর্ণা আবার তাগাদা দিলেন ফিরে যাওয়ার জন্যে।

নীপা বলল, "যাচ্ছি মা যাচ্ছি। বাস্কেটে খাবার দিয়েছি। মনে করে খেয়ে নিও। লুচি, পরোটা দিলাম না, যদি অ্যাসিড হয়ে যায়!"

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তোর মা না তুই আমার?"

শেষপর্যন্ত ওরা বিদায় নিলে কামরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন অপর্ণা। ওরা চোখের আড়ালে চলে গেলে দু'পাশে ঘন ঘন মুখ ফেরালেন। তারপর নিজের আসনে ফিরে গেলেন। চারটে বার্থ, বাকি তিনজন এখনও এসে পৌঁছয়নি। ঘড়ি দেখলেন অপর্ণা। সবে সন্ধে শেষ হল। রাতের খাওয়ার জন্যে ঘণ্টাখানেক জেগে থাকতে হবে।

এই সময় কয়েকজন মহিলা-পুরুষ মালপত্র নিয়ে কামরায় উঠে ভিতর দিকে চলে গেল। চার বার্থের এই জায়গাটুকু একটু বেশি ফাঁকা লাগছে এখন। ট্রেন চলতে শুরু করলে নিশ্চয়ই দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। সামনের পর্দা টেনে দিলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন। অবশ্য ট্রেনে কখনওই তাঁর ভাল ঘুম হয় না। কৃষ্ণেন্দু যখন বেঁচে ছিলেন তখন ট্রেনে উঠলেই বলতেন, "তুমি তো জেগেই থাকবে, জিনিসগুলোর দিকে একটু খেয়াল রেখ। আমি শোব আর ঘুমোব।" কথাটা অন্যভাবেও সত্যি হয়ে গেল। বুকে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতে শুয়ে পড়েছিল কৃষ্ণেন্দু, পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিল চিরকালের মতো।

"নাম্বার এইট। হ্যাঁ, এই তো, এটাই।"

গলার স্বরে মুখ ফিরিয়ে লোকটিকে দেখতে পেলেন অপর্ণা। স্যুটকেস সিটের নীচে ঢুকিয়ে উল্টোদিকে বসলেন ভদ্রলোক। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। চোখাচোখি হতে বললেন, "এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে এলেন কী করে?"

ঠোঁটে একটু হাসি ফুটল কি ফুটল না, অপর্ণা কথা বললেন না।

"ট্রেনটা ফাঁকাই যাচ্ছে। অথচ দিন সাতেক আগে টিকিট কাটতে গিয়ে শুনেছিলাম আমাকে ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হবে। আজ সকালে কনফার্মড হল।" লোকটির বোধহয় একটু বেশি কথা বলার বাতিক আছে, অপর্ণা এবার হাসলেন না।

ট্রেন ছাড়ল। রেলরক্ষী বন্দুক হাতে প্যাসেজ দিয়ে চলে গেল। লোকটি বলল, 'এই ট্রেন কাল সকালে শিয়ালদায় পৌঁছবে। ততক্ষণ আমরা বোবা হয়ে থাকব না ভদ্রজনের মতো কথাবার্তা বলব তা আপনাকে ঠিক করতে হবে।"

এরকম প্রস্তাব এই প্রথম শুনলেন অপর্ণা। তবু বললেন, "আমি কেন?"

"আপনি একজন মহিলা। আপনি ইচ্ছে করলে কথা নাও বলতে পারেন।"

"আমার কোনওটাতেই আপত্তি নেই।" অপর্ণা বললেন।

"বেশ। আমার নাম গৌতম, গৌতম সেন। কলকাতার একটা বেসরকারি কলেজে পড়াই। অল্প বয়সে ঠিক করেছিলাম কখনই প্রেমে পড়ব না। বই নিয়ে থাকব। তারপর যখন মনে হল এরকম ইচ্ছের কোনও মানে হয় না তখন

দেখলাম যাঁরা আমার প্রেমিকা হতে পারতেন তাঁদের সবাই ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছেন, কেউ বা শাশুড়ি, কাছাকাছি বয়সের এমন কোনও অবিবাহিতা মহিলা নেই যার প্রেমে পড়া যায়। তাছাড়া একা থাকতে বেশ কিছু অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছিল যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। এই হলাম আমি।" গৌতম সেন বললেন।

"প্রেম না করেও তো মানুষ সংসার করে।" না বলে পারলেন না অপর্ণা।

"গোড়ার দিকে, যখন মা বেঁচে ছিলেন তখন খুব চাপ দিতেন। পরে যখন আমি একা হয়ে গেলাম তখন মনে হল চিনি না, জানি না এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করে একসঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওটা যে বয়সে সবাই করে তা আমি পেরিয়ে এসেছি। কলকাতায় যাচ্ছেন তো?" আচমকা প্রশ্ন করল গৌতম সেন।

"এই ট্রেন তো সেখানেই যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু মাঝখানে কয়েকটা স্টেশনে থামবে।"

"ও। হ্যাঁ, কলকাতাতেই।"

"আমি একটু আসছি।" বলে উঠে গেলেন গৌতম সেন।

একটু অন্যরকম চরিত্র। অবশ্য যদি বাচাল না হয় বা অন্য মতলব না থাকে তাহলে কথাগুলো খারাপ লাগার কথা নয়। এভাবে নিজের কথা কাউকে বলতে শোনেননি তিনি । ঘড়ি দেখলেন অপর্ণা। ট্রেনটা খুব জোরে ছুটছে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসলে বাইরের পৃথিবীটা অদেখা থেকে যায়। তাই অন্ধকার কীরকম, বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে কি না বুঝতে পারলেন না তিনি।

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এলেন গৌতম সেন। এবার সিগারেটের গন্ধ পেলেন অপর্ণা। বললেন, "শুনেছি ট্রেনে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ।"

"অ্যাঁ? বা বেশ শার্প ঘ্রাণশক্তি আপনার? হ্যাঁ। তাই টয়লেটকে স্মোকিং জোন বানিয়ে নিয়েছি। বিদেশের ট্রেনগুলিতে একটা সিগারেট খাওয়ার কামরা থাকে। ভারতীয় রেল যখন সেই ভদ্রতা করবে না তখন এছাড়া উপায় কী?" আরাম করে বসলেন গৌতম সেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন গৌতম সেন, "শুনুন। আমি পাশের কুপেতে গিয়ে বসছি। ওটাও একদম খালি। টিটি যদি এদিক দিয়ে আসেন তাহলে প্লিজ বলবেন আমি ওদিকে আছি।"

"অস্বস্তি হচ্ছে?"

"একটু।"

"বুঝতে পারছি না। আপনি কথা বলতে চাইলেন, কথা বললাম। আপনি সিগারেট খেতে চাইলে টয়লেটে যেতে পারতেন।"

"একদম ঠিক। আপনি একজন অ্যাডাল্ট মহিলা। বলাই যায়। আমি রোজ নিয়ম করে দুই পেগ করে হুইস্কি খাই। ট্রেনে যেতে হলে সহযাত্রীদের অনুমতি

চাইলে দেখেছি অনেকেই ওই অর্থেও আমার সহযাত্রী। কিন্তু আজ আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আপনি হজম করতে পারবেন না।" গৌতম সেন বললেন।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন অপর্ণা। তারপর বললেন, "আপনি যদি মাতলামো না করেন তাহলে ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই। আমার স্বামীকেও দীর্ঘদিন দেখেছি কিন্তু কখনও তাঁর কথা জড়িয়ে যায়নি। আপনি যদি তা না পারেন তাহলে স্বচ্ছন্দে পাশের কুপেতে যেতে পারেন। যাওয়ার সময় স্যুটকেসটা নিয়ে যাবেন।"

"চমৎকার। আপনার স্বামী কি— !"

"উনি আজ নেই। ওঁর কথা থাক।"

এইসময় টিটি এলেন। টিকিটে দাগ দিয়ে চলে গেলেন রোবটের মতো। স্যুটকেস খুললেন গৌতম সেন। একটা কাচের গ্লাস বের করে বোতল খুলে পানীয় ঢাললেন খানিকটা। তারপর বললেন, "এই যাঃ। জল কেনা হয়নি।"

অপর্ণা কিছু বললেন না। মেয়ে খাবারের বাস্কেটে দু'বোতল জল দিয়েছে যার অনেকটাই তাঁর লাগবে না।

স্যুটকেস বন্ধ করে তার আড়ালে গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়ালেন গৌতম সেন, "যাই, একটু জলের সন্ধান করে আসি। চণ্ডালিকার কথা মনে পড়ছে। জল দাও, জল দাও?"

একটু বাদেই আধবোতল জল নিয়ে ফিরে এলেন গৌতম সেন। গ্লাসে কিছুটা মিশিয়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "চমৎকার!"

অপর্ণা তাঁর ব্যাগ থেকে বাংলা পত্রিকা বের করে চোখ রাখলেন। কিন্তু ঠিক মন দিতে পারছিলেন না। মিনিট দুয়েক পরে চোখ তুলে দেখলেন গৌতম সেন তাঁর দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছেন। অস্বস্তি হল তাঁর। মুখ নামাতেই শুনলেন, "আপনি রবীন্দ্রনাথে ডুবে আছেন, তাই তো?"

হেসে ফেললেন অপর্ণা, "আমি? না তো!"

"সত্যি বলছেন বলে মনে হচ্ছে না।"

"তাই? কী করে আপনার মাথায় কথাটা এল?"

"মাথায় নয়। মনে।"

"ও, আচ্ছা।"

"আপনি কি জানেন রবীন্দ্রনাথের দু'টি নারী চরিত্রের আদল আপনার মধ্যে রয়েছে?" গৌতম সেন জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকটার কথা এখনও জড়ায়নি। কিন্তু উত্তর দিলেন না অপর্ণা।

"কিছুটা এলা, অনেকটা সুচরিতা।"

এবার সোজা হলেন অপর্ণা, "মিস্টার সেন আপনাকে আমি প্রথমবার দেখা হওয়া সত্ত্বেও সহজ কথা বলতে দিয়েছি। আপনি দু'পেগ পান করতে চেয়েছেন,

আপত্তি করিনি। কিন্তু আমাকে অপমান করার অধিকার আপনাকে দিইনি। সেটা করছেন।"

"অপমান? আপনাকে? আর ইউ ম্যাড?"

"আপনি আমার কোথায় সুচরিতা বা এলাকে পেলেন, বলুন?"

গ্লাস শেষ করে একটু ভাবলেন গৌতম সেন, "আমি যখন ওই উপন্যাস দুটো প্রথম পড়ি তখন সুচরিতা বা এলার যে ছবি মনে মনে এঁকেছিলাম তার সঙ্গে লাবণ্য বা দামিনীর একটুও মিল ছিল না। সুচরিতা নিজেকে ক্যারি করতে জানত। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। অতীন এলার চোখে নিজের সর্বনাশ দেখেছিল। ওদের মধ্যে সেই আগুন ছিল যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু কাছে গেলেই তাপ অনুভব করা যায়। আপনার সামনে বসে আমি সেই তাপ বাস্তবে অনুভব করলাম। এতে আপনি অপমানিত বোধ করছেন কেন?"

"মিস্টার সেন, আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। আপনার কাছ থেকে এসব কথা শুনতে আমি রাজি নই।" অপর্ণা বললেন।

"আপনার বয়স কত আমি জানি না। ইন ফ্যাক্ট, আপনাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা যাবে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আপনি সেই ধরনের মানুষ যিনি সত্যি কথা সহজভাবে নিতে পারেন।" কথা শেষ করে গ্লাস স্যুটকেসে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেলেন গৌতম সেন। একটা পাত্র শেষ করে একটা সিগারেট। অপর্ণার মনে পড়ল ট্রেনে কৃষ্ণেন্দু পান করত না। কিন্তু বাড়িতে থাকলে এক পেগ শেষ করেই সিগারেট ধরাত। অপর্ণা বিরক্ত হতেন, "দু'দুটো নেশা একসঙ্গে কর কেন?"

কৃষ্ণেন্দু হাসত, জবাব দিত না।

এই লোকটা, যার নাম গৌতম সেন, কৃষ্ণেন্দুর অভ্যাসের সঙ্গে এর কিছুটা মিল থাকলেও এর একটু আগের বলা কথা কোনওদিন কৃষ্ণেন্দু বলেনি। সত্যি কথা হল, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওর কোনও কৌতূহলই ছিল না। সুচরিতা, এলা কেমন দেখতে ছিল তা দূরের কথা, ওরা কোন কোন উপন্যাসের নায়িকা তা জানার কোনও আগ্রহ কৃষ্ণেন্দুর ছিল না। "আপনার বয়স কত আমি জানি না, ইন ফ্যাক্ট, আপনাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না।" লাইনদুটো মনে আসতেই শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। মেরুদণ্ডে অদ্ভুত কনকনে অনুভূতি। অপর্ণা মনে করার চেষ্টা করলেন, সুচরিতার চেহারার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ কী লিখেছেন? মনে পড়ল না। তারপর ভাবলেন, দুর ভেবে লাভ নেই। গৌতম সেন যখন বললেন তখন ধরে নেওয়াই যেতে পারে সুচরিতাকে দেখতে অনেকটা তাঁর মতো। আহা, এই কথাটা তাঁকে কেউ বলেনি। এখন মনে পড়ছে, অনেকের চোখ সে-কথা বলেছিল বিয়ের আগে।

গৌতম সেন ফিরে এলেন। রেল কোম্পানির রেখে যাওয়া বালিশ কম্বল টেনে

বিছানা করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন। দুটো সিগারেট খেয়েছে এবং একটার বেশি পান করেছে লোকটা। এখন মনে হচ্ছে রাতের খাবারও খাবে না। সঙ্গে খাবারের ব্যাগ নেই, স্যুটকেসে কেউ খাবার নিয়ে আসে না।

হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে শুরু করল অপর্ণার। ট্রেনটা ছুটেই চলেছে। লোকটা কি অকারণে তাঁর স্তুতি করল? কী লাভ হল ওর? এখন শরীরের এলিয়ে থাকা ভাব বলে দিচ্ছে ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে। মতলববাজ মানুষরা এত দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে না। তাঁর জন্যে অনেক খাবার বাস্কেটে ভরে দিয়েছে মেয়ে। গৌতম সেনকে তার অর্ধেক দিলে একটুও কম পড়বে না।

একবার টয়লেটে যাওয়া দরকার। অপর্ণা উঠলেন। চলন্ত ট্রেনের দুলুনি সামলে সেখানে পৌঁছে দরজা বন্ধ করতেই নাকে সিগারেটের গন্ধ পৌঁছে গেল। কৃষ্ণেন্দু সিগারেট ধরাতেই তিনি দূরে সরে বসতেন। কিন্তু এখন গন্ধটা তেমন কটু বলে মনে হল না। সামনের আয়নাটা খুব পরিষ্কার। ট্রেনে এমনটা দেখতে পাওয়া যায় না। অপর্ণা নিজেকে দেখলেন। এখনও তাঁর চুল পাকেনি। চোখের তলায় হালকা দাগ, অনেকটা হাঁসের পায়ের ছাপ। না, এখনও তাঁর দ্বিতীয় চিবুক হয়নি। হেসে ফেললেন তিনি। বাঁদিকের নীচের পাটির একটা দাঁতে মাসদুয়েক আগে শিল্পকর্ম করেছেন দাঁতের ডাক্তার। এখন বোঝার উপায় নেই। আচ্ছা, সুচরিতাদের কি মাঝে মাঝে হাঁটুতে ব্যথা হয়? চুল ঠিক করলেন অপর্ণা। নিজের বার্থে ফিরে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন তিনি, "মিস্টার সেন, উঠুন। না খেয়ে ঘুমোবেন না। আমার কাছে শেয়ার করার মতো অনেকটাই খাবার আছে।"

হিমশীতল

কলকাতা থেকে বাদকুল্লা আর কতটুকু? ট্রেনে তো বটেই, গাড়ি নিয়ে গেলে দিনে দিনেই ফিরে আসা যায়! ছেলেবেলায়, যখন স্কুলের শেষ ধাপে পড়ি তখন মায়ের সঙ্গে দু'দুবার গিয়েছিলাম অবনীমেসোর বাড়িতে। অনেকখানি জমি, গাছপালা, গরুর গোয়াল, হাঁসেদের হুটপাট, তাদের সাঁতার কাটার জন্যে জমির লাগোয়া যে নদী তার নাম অঞ্জনা। এটুকু মনে আছে। সেই অঞ্জনা নদীর জল যাতে জমিতে না চলে আসে তাই ছোট বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। সেই বাঁধের গায়ে বড় বড় নারকোল গাছ ছিল। মাঝরাতে একটা নারকোল খসে গিয়ে যেই জলে পড়ত তখন অদ্ভুত শব্দ হত। ঘুমিয়ে কাদা না হয়ে গেলে বিছানায় উঠে বসতাম। গা ছমছম করত।

অবনীমেসোর স্ত্রী কাজলমাসি মায়ের মামাতো বোন। সম্পর্কটা আমাদের

কাছে বেশ দূরের। সময় যত বয়ে গেছে তত জীবন ছিমছাম হয়ে গেছে। নিকট আত্মীয় যাদের বলা হয় তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ কমে গিয়েছে তো মায়ের মামাতো বোনের সঙ্গে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। একসময় নিজের ভাইবোন, মামা-মামি, কাকা-কাকিমার সঙ্গে গায়ে গা জড়িয়ে থাকতাম। এখন ভাইবোনদের সঙ্গে ফোনে কথা হয়, দেখা অবরে সবরে। কেউ আছে দুর্গাপুরে তো কেউ কুচবিহারে। সবাই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে শেকড় গেড়ে সেই যে বসে গেছে আর নড়াচড়ার বাসনা হয় না। আমিই ফোনে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর ছোট ছেলের বৌটার নাম কী যেন? ও রায়া। সে কোথায়?' অথবা, মামাতো বোনকে ফোনে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁরে, তোর মেয়ে কি এখনও বেঙ্গালুরুতে?' উত্তর শুনে অবাক হই, 'সে কী রে। কবে গেল আমেরিকায়!'

কয়েক বছর আগে মায়ের শরীর যখন খারাপ হত তখন বলতেন, 'হ্যাঁরে! তোর কাছে কাজলদের ফোন নাম্বার আছে?'

চট করে নাম শুনে ঠাওর করতে পারিনি। মাঝখানে তিরিশটা বছর চলে গেছে। নেই শুনে মা বললেন, 'পারিস যদি গিয়ে দেখে আয় না, অনেক দিন খবর পাইনি।' তখনই মনে পড়ল জ্যোছনা রাতে মা আর কাজলমাসি অঞ্জনা নদীর ধারে বসে গান গাইতেন, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে।' কথা খুব কম বলতেন কাজলমাসি। কিন্তু মা গেলে আর চাঁদনী রাত হলে গলায় গান আসত!

তখনও ব্যক্তিগত আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও প্রিয়জনের ইচ্ছাকে সম্মান দিতে অনেকেই যেন আপত্তি করতেন না, আমিও করিনি।

শেয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগরের ট্রেনে চেপে বাদকুল্লায় পৌঁছেছিলাম সকাল ন'টায়। স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে অবনীমেসোর বাড়ির দিকে যেতে যেতে মনে হয়েছিল তিরিশ বছরে যে বদল হয়েছে তা স্মৃতি মুছতে পারছে না। রিকশাওয়ালার সৌজন্যে বাড়ির গেটে পৌঁছে অবাক হলাম। যখন আগে আসতাম তখন বাড়ি একটাই ছিল। দোতলা, ছিমছাম। এখন দু'খানা বাড়ি, মাঝে বাগান। মায়ের কাছে শুনেছি কাজলমাসির একটাই মেয়ে যার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তিরিশ বছর আগে সেই মেয়ের জন্মই হয়নি। একটি মেয়ে জন্মাল, বড় হল এমনকী বিয়েও হয়ে গেল, বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে আমি সেই বাড়িতে এলাম অথচ তাকে জানলামই না।

গাছপালার মধ্যে দিয়ে দুটো বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই চোখ গেল অঞ্জনা নদীর দিকে। দেখা মাত্র মন খারাপ হয়ে গেল। জল আছে কিন্তু ঢেউ নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু যেন চওড়ায় ছোট দেখাচ্ছে।

'আপনি কি বাবুকে খুঁজছেন?' একজন বৃদ্ধ কাজের লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তার দিকে ভাল করে তাকাতেই মুখে এল, 'তুমি বিষ্ণুদা, না?'

'হ্যাঁ। আপনাকে ঠিক— !' বৃদ্ধ চোখ ছোট করলেন।

পরিচয় পেয়েও বৃদ্ধ তেমন উল্লসিত হলেন না। বললেন, 'কার কাছে যাবেন? বাবু না মা?'

একটু অবাক হলাম। কিন্তু সেটা না বুঝিয়ে বললাম, 'অবনী মেসোমশাই বাড়িতে নেই?'

'আছেন। আসুন।'

নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। আমাকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে ঢুকলেন। এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। তিরিশ বছর আগে এ বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার ছিল। পুরোনো বাড়ির ওপাশে গোয়ালঘর এবং রান্নাঘর ছিল। এখন দেখলাম নতুন বাড়ির গায়ে আর একটি রান্নাঘর হয়েছে। অর্থাৎ ধরনটা একই রকম রয়ে গেছে। আগেকার দিনে রান্নাঘর, বাথরুম বা পায়খানা মূল বাড়ির একটু বাইরে তৈরি করা হত। এই নতুন বাড়িটি বেশি দিন আগের না হলেও সেই রীতি মেনেছে।

বৃদ্ধ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সবিতাদিদির ছেলে?'

সবিতা মায়ের বিয়ের আগের নাম। প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে পা রাখতে না রাখতেই ঠাকুর্দা নামটা বদলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাপের বাড়ির লোক পুরোনো নাম ভুলতে পারেনি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তাই বলো, এসো এসো।' বৃদ্ধর মুখে হাসি দেখা দিল।

ভাল লাগল। এই বাড়িতে আমার নিজস্ব কোনও পরিচয় নেই। মায়ের ছেলে বলে এখনও স্বীকৃত।

ভেতরে ঢুকলাম। নতুন বাড়ির ঘরগুলো বেশ ঝকঝকে। আসবাবপত্রও বেশ আধুনিক। দেখলাম একজন মধ্যবয়সিনী একটা বাটি হাতে পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন আমাকে দেখে। বৃদ্ধ বললেন, 'এখন নয়। পরে, পরে—।'

তৃতীয় ঘরে টিভি চলছিল। তার সামনে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন যিনি তিনিই যে অবনীমেসোমশাই তা অনুমান করলাম। তিরিশ বছর আগেকার স্বাস্থ্য এখন নেই, মাথায় চকচকে টাক।

বৃদ্ধ ডাকলেন, 'বাবু।'

অবনীমেসো মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখলেন, 'এসো। তা হঠাৎ কী ব্যাপার?'

'মা আপনাদের কথা খুব চিন্তা করছেন, বললেন, দেখা করে আয়।' আমি জানালাম।

'রাস্তায় দেখা হলে তোমায় চিনতেই পারতাম না। শুনেছি নভেলটভেল লিখে

তুমি নাকি নাম করেছ। তাতে ভাল রোজগার হয়?' অবনীমেসো চোখ সরাচ্ছিলেন না।

'মোটামুটি।' হাসলাম আমি।

'বোসো। বিষ্ণু, ওকে মোড়াটা এগিয়ে দে।'

আমি বসলে তিনি বললেন, 'দুম করে চলে এলে, আমি তো বাড়িতে নাও থাকতে পারতাম। মেয়ের বিয়ের সময় চিঠি পাঠিয়েছিলাম, তোমরা কেউ এলে না। তোমার বাবা তো কোনও দিন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। কত বয়স হল তাঁর?'

'বাবা বহু দিন আগে গত হয়েছেন।'

'বাঃ। তোমরা শ্রাদ্ধের চিঠিটাও পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করোনি। আমি বুঝতে পারছি না হঠাৎ তোমার মা আমাদের খবরের জন্যে উদ্বিগ্ন হলেন কেন? এখান থেকে কি কোনও চিঠিপত্র তাঁর কাছে গিয়েছে?' অবনীমেসো গেঞ্জি খুলে ফেললেন। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল। সত্তরের পরেও বেশ মজবুত।

'না। গেলে মা আমাকে বলতেন।'

'ঝিমলির শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। সে ফোনটোন করেছিল নাকি?'

অনুমানে বুঝলাম ঝিমলি ওঁর মেয়ের নাম। মাথা নাড়লাম, 'না।'

'বিষ্ণু, ওকে চা-টা দে। আমি আজ নিরামিষ খাই। খেতে পারবে তো?'

'আজ্ঞে, আমি সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরব। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'আমি ব্যস্ত হচ্ছি তা তোমাকে কে বলল। আমার সব ঘড়ি ধরা। এখন তেল মাখব। সাড়ে দশটার মধ্যে স্নান শেষ করে ঠাকুরঘরে বসব। বেলা বারোটায় আহার। এই পৃথিবীর কোনও ব্যাপার আমাকে ব্যস্ত করে না।'

বিষ্ণুদা তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন দেখে বিরক্ত হলেন অবনীমেসো, 'সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চা দিতে বললাম না?'

'যাচ্ছি।'

'শোন, সে কোথায়? তাড়াতাড়ি তেল নিয়ে আসতে বল।'

'একটু পরে তেল মাখলে হত না?'

'কেন?' খিঁচিয়ে উঠলেন অবনীমেসো।

'আচ্ছা, ডেকে দিচ্ছি।' বিষ্ণুদা বেরিয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজলমাসিমা কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

অবনীমেসো অবাক হয়ে তাকালেন, 'তিরিশ বছর পরে এসে তার খোঁজ করছ? আচ্ছা, আরও তিরিশ বছর পরে এলে ওই একই প্রশ্ন করবে কি?'

চমকে গেলাম। তাহলে কাজলমাসি কি বেঁচে নেই?

'তিনি আছেন তাঁর মতো। তাঁর খবর নিতেই তো তোমার মা পাঠিয়েছেন। যাওয়ার আগে দেখা করে যেও।'

এই সময় সেই মধ্যবয়সিনী বাটি হাতে ঘরে ঢুকলেন। মাথায় ঘোমটা।

অবনীমেসো বিরক্ত হলেন, 'টাইমের কাজ টাইমে করবে, কতবার বলেছি, অ্যাঁ?' বলে বাঁ হাতটা শূন্যে সোজা করে ধরলেন।

বাটি টেবিলে রেখে তা থেকে আঙুলে তেল তুলে অবনীমেসোর কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত মাখালেন মহিলা। তারপর তেলটাকে বসাতে চেষ্টা করলেন।

'আপনি কি সারা বছর ধরে তেল মাখেন?' না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

'মাখি। কেন, তোমার কি কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

'না না।'

'এই যে শরীরটা দেখছ, প্রতিদিন এর পরিচর্যা করতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক ঘণ্টা ধরে যোগা, প্রাণায়াম করি। সপ্তাহে দু'দিন নিরামিষ। ডিম মাংস ছেড়েছি বহু কাল। মাছ বলতে তিন ইঞ্চির মধ্যে ছোট মাছ। আগে ওই অঞ্জনাতে মেছোরা ধরে দিয়ে যেত, এখন তো নদী বাঁজা হয়ে গিয়েছে। ষোলো ঘণ্টা জাগি, আট ঘণ্টা ঘুমোই। আমার বয়সি দুটো মানুষকে দেখাও তো, এরকম শরীর খুঁজেও পাবে না।'

বাঁ হাত হয়ে গিয়েছিল, এবার ডান হাত। মাঝে মাঝে মহিলার ঘোমটা খসে যাচ্ছিল। শ্যামলা গায়ের রঙ, মুখটি সুন্দর। অবনীমেসো চোখ বন্ধ করে মর্দন উপভোগ করছেন। হঠাৎ সেই অবস্থায় অবনীমেসো খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার? কাল কীসের উপোস করেছিলে? এটা কি মালিশ হচ্ছে?'

শোনামাত্র মহিলা সজোরে এমন হাত চালালেন যে মাথা থেকে আঁচল খসে পড়ল। বুঝলাম মধ্যবয়সিনী এখনও যুবতী।

উঠে দাঁড়ালাম, 'আমি একটু কাজলমাসির সঙ্গে দেখা করে যাই?'

'তা তো যাবেই। আমি কে? তাকে বিয়ে না করলে তো মেসো বলে ডাকতে না। ঠিক আছে, হাত ছেড়ে এবার পায়ে তেল দাও।' শেষ কথাগুলো যে মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলা তা বোঝার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ফিরে গিয়ে মাকে অবনীমেসোর তেল মাখার গল্প করতে পারব না।

বাড়ির বাইরে আসতেই বিষ্ণুদা ছুটে এলেন, 'ভালই হয়েছে। ওখানে চা না খেয়ে মায়ের কাছে বসে খাবে চলো।'

পুরোনো বাড়িতে ঢুকলাম। এবার সব মনে এল। তিরিশ বছর আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম সব কিছু অবিকল রয়েছে। একজন প্রৌঢ়া এগিয়ে আসতেই বিষ্ণুদা বললেন, 'মাকে বলেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'যাও বাবু, এর সঙ্গে যাও।'

কাজলমাসি আরও রোগা হয়েছেন। আমায় দেখে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিনতে পারছ?'

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন কাজলমাসি। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। প্রৌঢ়া দ্রুত এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল, 'কাঁদছ কেন? কেঁদো না। তোমাকে দেখতে এসেছেন উনি।'

নিজেকে সামলাতে প্রায় মিনিট খানেক লাগল। দেখলাম, কাজলমাসির মুখে বয়সের থাবা ভালরকম পড়েছে। যে জামা পরে আছেন তা ঢলঢল করছে কিন্তু মাথার চুল একদম কালো।

শেষ পর্যন্ত তাকালেন কাজলমাসি, 'এত দিন আসিসনি কেন?'

অপরাধ স্বীকার করলে কখনও কখনও মার্জনা পাওয়া যায়। কোনও যুক্তি না দাঁড় করিয়ে বললাম, 'অন্যায় হয়ে গিয়েছে।'

'তোর মা কেমন আছে?'

'এই বয়সে যা থাকা সম্ভব, মাঝে মাঝে বাতের ব্যথা খুব বাড়ে।'

'খুব দেখতে ইচ্ছে করে!'

'মা ঘরের ভেতরেই হাঁটাচলা করেন। এত দূর আসতে পারবেন না।' আমি বললাম, 'তুমি চলো।'

'আমি? এ বাড়ি থেকে যখন বের হব তখন মানুষ বয়ে নিয়ে যাবে। মেয়ে কতবার চেয়েছে নিয়ে যেতে— !' বড় শ্বাস ফেললেন কাজলমাসি। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এলেন, আমার বুকে হাত রেখে বললেন, 'তুই কত বড় হয়ে গেছিস রে!'

'বাঃ। কত বয়স হয়ে গেছে চিন্তা করো!'

'নারে! তুই কত বই লিখেছিস। কত গল্প। ওই মানদাকে দিয়ে আমি মাত্র দুটো বই কিনে আনাতে পেরেছিলাম। হাতে টাকা থাকে না তো। ঝিমলি বলেছিল এনে দেবে। কিন্তু সে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।'

কথাটা শুনেও না শোনার ভান করলাম। বললাম, 'তুমি চিন্তা কোরো না, আমার সব বই তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

'নারে! পাঠাস না। পড়তে পারব না।'

'কেন?'

'এই চশমাটায় ছোট অক্ষর আর দেখতে পাই না।'

'চোখ দেখিয়ে নতুন চশমা নাও।'

হাসলেন কাজলমাসি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোকে কিছু বলল ও?'

'এমনি গল্প করলেন।'

'খারাপ কিছু বললে মনে করিস না।'

'তোমরা দুজনে দুটো আলাদা বাড়িতে কবে থেকে থাকছ?'

এবার গম্ভীর হলেন কাজলমাসি। এই সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলেন বিষ্ণুদা, 'নাও, খেয়ে নাও। কিন্তু এই সময় এসে দুপুরে না খেয়ে চলে যাবে?'

হেসে বললাম, 'কলকাতায় কাজ ফেলে এসেছি।'

বিষ্ণুদা বললেন, 'যাক, তবু তো এসেছ।'

চা-জলখাবার খেতে খেতে জানলাম, এখনও রোজ পাঁচ কেজি দুধ হয়। কর্তার নির্দেশে তার চার কেজি বিক্রি করে দেওয়া হয়। চারটে ছাগল আছে। দুটোর বাচ্চা হবে শিগগির। বাড়িতে যত নারকোল গাছ আছে তা বাজারের এক দোকানদারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ফেরার আগে কাজলমাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাই, যাবে?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল তাঁর মুখে, 'নারে! এখন আর হয় না।'

নিজের টেলিফোন নাম্বার একটা কাগজে লিখে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। অবনীমেসোর বাড়ির দরজা বন্ধ। অত বড় বাড়িতে শুধু পাখির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

ফিরে এসে মাকে সব কথা বলিনি। অবনীমেসোর মালিশের মেয়ের কথা তো নয়ই। তবে তাঁরা আলাদা বাড়িতে থাকেন শুনে মা যেন খুশি হলেন, 'যাক গে, এবার ও নিজের মতো নিশ্চয়ই থাকতে পারছে।'

বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমি চাইলাম না।

মা চলে যাওয়ার পর শ্রাদ্ধের কার্ড পাঠিয়েছিলাম। আমাদের রীতি অনুযায়ী ওটা অবনীমেসোর নামেই পাঠাতে হয়েছিল। কোনও প্রতিক্রিয়া পাইনি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত কাজলমাসিকে অবনীমেসো খবরটা দিয়েছেন কিনা।

বছর দুয়েক বাদে এক সকালে ফোনটা এল, 'আপনি বোধহয় আমাকে চিনবেন না!'

কোনও মহিলা কণ্ঠ এভাবে শুরু করলে আমি বিরক্ত হই। যদি সেই সংশয় থাকে তাহলে নিজের নাম বলেই তো শুরু করতে পারে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মহিলার বোধ ফিরল। 'আমি ঝিমলি, আমার মাকে আপনি কাজলমাসি বলেন।'

মুহূর্তেই বদলে গেলাম, 'ওহো! কেমন আছ?'

'আপনার সঙ্গে আমার কখনও কথা বলার সুযোগ হয়নি। এই টেলিফোন নাম্বারটা আমি বিষ্ণুকাকার কাছ থেকে পেয়েছি। আপনি মাকে দিয়ে এসেছিলেন।'

'খুব ভাল লাগছে তোমার ফোন পেয়ে। কাজলমাসি কেমন আছেন?'

'মা, মায়ের মতন আছেন।' একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিছু জানেন না?'

'কী ব্যাপারে বলো তো?'

'মাকে দেখতে প্রত্যেক সপ্তাহে দু'দিন আমাকে যেতে হয়।' ঝিমলি বলল।

'কেন?'

'মায়ের মন ভাল নেই।'

'ভাল না থাকারই কথা। অন্তত সেবার গিয়ে আমার তাই মনে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'অবনীমেসোমশাই কেমন আছেন?'

ঝিমলি বলল, 'অবনীবাবু দিব্যি আছেন।'

হেসে ফেললাম, 'তুমি অবনীবাবু বলো নাকি?'

'কী বলব?' তীক্ষ্ণ শোনাল ঝিমলির গলা।

'সবাই যা বলে থাকে।'

'সরি। ওই লোকটিকে আমি আবার বাবা বলে মনে করি না। আচ্ছা আজ রাখছি। আপনার মোবাইলে নিশ্চয়ই আমার নাম্বার দেখতে পেয়েছেন।'

ঝিমলির শেষ কথাটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল। কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছিল ওকে ফোন করে কারণ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ওই লাইনটা বলার সময় গলার স্বরে যে অভিব্যক্তি ফুটেছিল তার পরে আর খোঁচাতে চাইনি।

এরও কয়েক মাস পরে কৃষ্ণনগরের বইমেলায় আমন্ত্রণ পেলাম। উদ্যোক্তারা বললেন, অনুষ্ঠানের পর রাত্রে থাকার ভাল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমি ফিরে আসতে চাইলে ঠিক হল ওঁরা গাড়িতে পৌঁছে দেবেন। একটু রাত হবে এই যা।

যাওয়ার সময় ট্রেনে গেলাম। বাদকুল্লা স্টেশনটি দেখার পর কাজলমাসির মুখ মনে পড়ল। ঝিমলি বলেছিল কাজলমাসির মন ভাল নেই। কাজলমাসি আর মা অঞ্জনা নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাত্রে গান গেয়েছিলেন।

বইমেলার অনুষ্ঠান শেষ করে গাড়িতে উঠতে রাত আটটা বেজে গেল। এখন আমি আর ড্রাইভার। বারোটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাব বলে আশ্বাস দিয়েছে ড্রাইভার।

বাদকুল্লায় আসামাত্র মনে হল পাঁচ মিনিট দেরি হলে এমন কোনও ক্ষতি হবে না, কাজলমাসির সঙ্গে দুটো কথা বলেই যেতে পারি। ড্রাইভার রাজি হল। কিন্তু অবনীমেসোর বাড়ির সামনে পৌঁছাতেই টায়ার থেকে হাওয়া বের হয়ে গেল। ড্রাইভার বিরক্ত-গলায় বলল, 'শালারা পেরেক ছড়িয়ে রেখেছে। তাড়াতাড়ি আসুন, স্টেপনি লাগিয়ে নিচ্ছি।'

ভেতরে ঢুকলাম। অবনীমেসো যে বাড়িতে থাকেন তার জানলার কাচে আলো জ্বলছে। এখন শীতের শুরু। বেশ ঠাণ্ডা ভাব। এই সময় চাঁদ উঠল।

দ্রুত জ্যোৎস্না গিলে খেল চরাচরকে। দেখলাম অঞ্জনা নদী আরও শুকিয়ে গিয়েছে। জল বোধহয় হাঁটুর ওপরে স্থির।

'কে?'

'আমি। বিষ্ণুদা নাকি?'

এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ, হাতে টর্চ। মুখের ওপর আলো ফেলে চাপা গলায় বললেন, 'একি? তুমি? ও হ্যাঁ, তোমার তো আজ কেশনগরে যাওয়ার কথা। পোস্টার পড়েছে। যাক, তবু মনে পড়ল।'

'কেমন আছ তোমরা?'

'কোনও খবর পাওনি? ঝিমলি বলেছিল ফোন করেছে।'

'হ্যাঁ। করেছিল। অবনীমেসোর খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

'দাঁড়াও।' সামনের বাড়ির দরজার কড়া নাড়ল বিষ্ণুদা। একটু বাদে যিনি দরজা খুললেন তিনি যে আগের মধ্যবয়সিনী নন তাতে আমি নিঃসন্দেহ। বিষ্ণুদা তাকে চাপা গলায় কিছু বলতে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে মাথা নাড়লেন।

বিষ্ণুদা বললেন, 'যাও। জেগে আছেন। তবে বেশিক্ষণ থেকো না।'

মহিলাই আমাকে নিয়ে গেল অবনীমেসোর ঘরে। সেখানে তখন টিভি চলছে। অবনীমেসো টিভি দেখছিলেন। তাঁর বাঁ দিকের টেবিলে মদের গ্লাস, জল আর মাছ ভাজা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এত রাত্রে? হঠাৎ?'

'কৃষ্ণনগরে এসেছিলাম, ফেরার পথে ভাবলাম—।'

'নিশ্চয়ই আমার কাছে আসোনি?'

'আমি তো প্রথমে আপনার কাছেই এলাম।'

'বাঃ। গুড। তুমি কি এসব খাও?'

'খাই না বলব না, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আমি খাই, রোজই।'

'পরিমিত খেলে অসুবিধে কিছু নেই।'

'বাঃ। দ্যাখো, জীবন তো একবারই আসে, যায়। এই সময়টুকু যে যার মতো যদি উপভোগ করে তাহলে কি তুমি অপছন্দ করবে?'

'নিশ্চয়ই না।'

'আরে! তুমি দেখছি অন্যরকম। তোমাকে ভুল ভেবেছিলাম। বসো বসো।'

'আমাকে এখনই কলকাতায় ফিরতে হবে যে।'

'কেন? আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাও।'

'উদ্যোক্তারা গাড়ি দিয়েছে। আমাকে পৌঁছে ওটা আবার ফিরবে।'

'এখান থেকেই ফিরে যাক। গাড়ি ক'টা চাও? কাল সকালে ব্যবস্থা হবে।'

'না মেসোমশাই—।'

'আবার না বলে!' লম্বা চুমুক দিলেন অবনীমেসো। এমনিতেই গলার স্বর জড়িয়ে এসেছিল, বোঝা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ পানে আছেন। হঠাৎ বললেন, 'তুমি নাকি একজন লেখক। আমার ডাক্তার বলেন, তুমি ভাল লেখো। আমাকে তোমার কেমন লাগে?'

আমি হাসলাম। ঘড়ি দেখলাম।

'আমার মেয়ে ঝিমলির সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'একদিন ফোন করেছিল।'

'অ। সে আমাকে বাবা বলে স্বীকার করে না।' বলেই হো হো শব্দে হাসলেন অবনীমেসো, 'আরে আমি যদি না থাকতাম তুই পৃথিবীতে আসতিস? ইডিয়ট! আমি ওকে বলি প্রোডাক্ট অফ ডিপ ফ্রিজ। মানে বুঝলে?'

'না।'

'বিয়ের পরেই বুঝলাম আমার বিয়ে হয়েছে একটি ডিপ ফ্রিজের সঙ্গে যা শুধু ঠাণ্ডা নয়, হিমশীতল। কোনও রকমে তিনি মা হয়ে যেতেই মেরুবাসিনী হয়ে গেলেন। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। আমি বাঁচার রাস্তা খুঁজে নিলাম। আর তাতেই আমি নাকি লম্বট, মাতাল, চরিত্রহীন হয়ে গেলাম। আমাকে বাবা বলতে মেয়ের ঘৃণা হয়। তোমার কি তাই হচ্ছে?'

'আজ্ঞে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি দেখছি বংশছাড়া! এঃ, বড্ড দেরিতে আলাপ হল হে! আজকাল, বুঝলে, জীবনটাকে ঠিকঠাক উপভোগ করতে পারি না। না না, মন চায় কিন্তু শরীর বাদ সাধে। এই যে শরীর, ওপরটাকে ঠিকঠাক করে রাখি কিন্তু ভেতরের গড়বড় তো আমি সারাতে পারব না। ডাক্তার পাল্টে পাল্টে চলেছি।' বলেই খেয়াল হল, 'এই যে খুকুসোনা, গ্লাসটা যে কাঁদছে চোখে পড়েনি?'

যার উদ্দেশে বলা সে এগিয়ে এসে যখন বোতল থেকে হুইস্কি ঢালছিল গ্লাসে তখন ভাল করে দেখলাম। না, মহিলা বদলে গেছে। এই মফস্‌সলে ব্যক্তিগত কাজের জন্যে মহিলা পাওয়া যায়? অবনীমেসো চুমুক দিয়ে বললেন, 'তুমি যখন এসেছিলে তখন এ ছিল না। আগেরটি বড্ড চুরি করত।'

বললাম, 'এবার উঠতেই হবে।'

'হোক। আমার ইচ্ছেয় আসনি, আমার ইচ্ছেয় যাবে না। এসো মাঝে মাঝে। একবার একসঙ্গে খাওয়া যাবে। বুঝলে, আগে আট-দশ গ্লাস বেমালুম মেরে

দিতাম, এখন পাঁচের বেশি পারি না। নেশা হয় না কিন্তু পেটের ভেতরে পিঁপড়ে কামড়ায়। একদম লাল পিঁপড়ের কামড়।'

'ডাক্তার কী বলছেন?'

'ডাক্তার বী বলবে? আমার ঠিকুজিতে আছে অষ্টাশি বছর সাত মাস তিন দিন বাঁচব। লং ওয়ে টু গো।' অবনীমেসো আবার গ্লাস তুলতেই আমি বেরিয়ে এলাম।

জ্যোৎস্নার তেজ বেড়ে গেছে এর মধ্যেই। গাড়ির হর্ন কানে এল। সম্ভবত চাকা পরিবর্তন করে ড্রাইভার জানান দিচ্ছে। বিষ্ণুদা ছিলেন কাছাকাছি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখলে?'

'হ্যাঁ।' তারপর দ্বিতীয় বাড়ির দিকে তাকালাম, 'কাজলমাসি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'না।'

আমি সেদিকে এগোতেই বিষ্ণুদা বললেন, 'না গেলেই নয়?'

'মানে? এ বাড়িতে এসে কাজলমাসির সঙ্গে দেখা না করে চলে যাব?'

'বেশ!'

ঘরে খুব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। বিছানায় বসে আছেন কাজলমাসি। চট করে মনে হবে পাথরের মূর্তি। পরনে ময়লাটে সাদা শাড়ি। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, 'কাজলমাসি?'

অবাক হয়ে দেখলাম ওঁর কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। চোখে কম দেখছিলেন শুনে গিয়েছিলাম, কানেও কি শুনতে পাচ্ছেন না? বিষ্ণুদা পেছনে ছিলেন, তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি মাথা নিচু করলেন।

এবার এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাজলমাসি, আমাকে চিনতে পারছ না?'

চোখের পাতা পড়ল না। ঠোঁট কাঁপল না একটুও, যেমন বসে ছিলেন তেমনি রইলেন। আমি মরিয়া হয়ে দু'বার চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকার পর বিষ্ণুদার গলা কানে এল, 'মা শুনতে পাচ্ছেন না।'

'মানে?'

'মা আর কানে শোনেন না, কথা বলতে পারেন না। খাইয়ে দিলে খান। প্রত্যেক হপ্তায় কলকাতা থেকে ঝিমলিদিদি আসেন। প্রথম প্রথম মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতেন। অনেক বড় ডাক্তারকে এখানে এনেছেন। তাঁরা বলেছেন মায়ের শরীরটা রয়েছে কিন্তু মন মরে গেছে। এই অসুখ নাকি সারে না।' বিষ্ণুদা বললেন।

'কবে থেকে হয়েছে?'

'তুমি যে বছর এসেছিলে তার পরের বছর, দোলপূর্ণিমার দিন।'

'কীভাবে হল?'

'শুনে কী করবে?'

'তবু শুনি—!'

'জ্যোছনার মধ্যে মা অঞ্জনা নদীর ধারে গিয়েছিলেন। ওই বাড়ির ঘাটেই। হঠাৎ দুটো লোক এসে বাবুর দরজায় আঘাত করে। আমি আটকাতে পারি না। ওরা বাবুকে খুব গালমন্দ করে। বাবু বন্দুক বের করেন। ওরা মেয়েটাকে নিয়ে চলে যায়। লোক দুটোর একজন ছিল মেয়েটার স্বামী। ওই সব শুনে, দেখে, মা খুব জোরে কেঁদে ওঠেন। তখন বাবুর নজর পড়ে মায়ের ওপর। মাকে গালাগাল করতে শুরু করেন। মা ভয় পেয়ে বসে পড়েন। আমরা কোনও মতে মাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাই। মায়ের সারা শরীর প্রচণ্ড কাঁপতে থাকে। ডাক্তার ডেকে আনি। কোনও লাভ হয়নি। সেই থেকে মা বেঁচে মরে আছেন।' বিষ্ণুদা কেটে কেটে কথাগুলো বললেন।

'অবনীমেসোমশাই এসেছিলেন?'

'এসেছিলেন। পরদিন বিকেলে। ততক্ষণে ঝিমলি খবর পেয়ে চলে এসেছিল। সে বাবুকে ঢুকতে দেয়নি।'

'দেয়নি?'

'না। মুখের ওপর বলেছিল, আপনি আমার মায়ের কেউ নন। যার সঙ্গে মায়ের বিয়ে হয়েছিল সেই লোকটা মরে গেছে। আপনি এই বাড়িতে ঢুকবেন না।' বিষ্ণুদা জানালেন।

কাজলমাসির দিকে তাকালাম।

সেই কিশোরবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে পাশের অঞ্জনা নদীর ধারে বসে মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাজলমাসি গেয়েছিলেন, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে।'

ওঁর হাত দু'হাতে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলাম।

গাড়িতে বসে আচমকা মনে হল, এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন কি কাজলমাসির মন বেঁচে ছিল? অবনীমেসো যে মনকে হিমশীতল বলেছেন তাকে তপ্ত করার কোনও চেষ্টাই কোনও দিনও করেননি। দুটি হৃদয় পাশাপাশি রয়েছেন এত দিন। একজন জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে আর একজন নিজস্ব আনন্দের সন্ধানে জীবন খুঁড়ে যাচ্ছেন অবিরত। এই খোঁড়া সব সময় সুখের হয় না, যন্ত্রণা চলে আসে ভেতর বাইরে।

কিন্তু নির্লিপ্ত কাজলমাসির মন শরীর আরও গভীর নির্লিপ্তিতে চলে গেছে। সাধকদের সমাধি হলে শরীর মন চৈতন্যলুপ্ত হয়।

কাজলমাসির জন্য আর আমার খারাপ লাগছিল না। উনি ভালই আছেন।

মনের আয়না

মুখ হল মনের আয়না। যেদিন প্রথম এই লাইনটা পড়েছিলাম সেদিনই আশপাশের মানুষের মুখ খুঁটিয়ে দেখা শুরু করলাম। কারও চোখে, নাকে, চিবুকে নরম নরম সরল ভাব দেখতে পেলেই ভেবে নিতাম এর মুখ আকাশের মতো উদার। তখন আমার ষোল বছর বয়স। পিতৃদেবের মুখের দিকে তাকালে কংস বলে মনে হত। আমাকে দেখলেই তাঁর মনে হত পড়াশুনা ছাড়া আর সব করছি। সেই মনে হওয়াটা বাক্যের মধ্যে মিশিয়ে দিতেন তিনি। তাঁর মুখে কোনো নরম ভাব ছিল না।

পাশের বাড়ির বিনয়দার মুখ ছিল শরতের আকাশের মতো। দেখলেই মনে হত দিনটা ভালো যাবে। ওর ঠাকুমা নাকি ঘুম থেকে উঠে চোখ না খুলে চেঁচিয়ে ডাকতেন, 'ও বিনু, বিনুরে, সামনে আয়, তোকে দেখতে দেখতে চোখ খুলি।' সেই বিনয়দা আচমকা আমাকে বললেন, 'এই চার আনা দে তো।'

বললাম, 'চার আনা নেই, আধুলি আছে।'

'তাই দে।'

দেওয়ার সাতদিন পরে ফেরত চাইলে বললেন, 'সেকি রে! দিয়ে আবার ফেরত চাইছিস? তোর তো কালীঘাটে গিয়ে কুকুর হতে হবে।'

এই বিনয়দাকে কুড়ি বছর পরে আবার দেখলাম। জামাকাপড় বলে দিচ্ছে আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে সরল হাসি হাসলেন, 'কুড়িটা টাকা দে তো?'

বললাম, 'তুমি দেখছি একটুও বদলাওনি।'

বিনয়দা বললেন, 'আমি এককথার মানুষ, কেন বদলাবো?'

বাল্যকালে শুনতাম, মা-মাসিরা বলতেন, 'মুখ দেখে বোঝা যায় না; পেটে পেটে এত?' তাহলে সত্যি মুখ দেখে বোঝা যায় না? অথচ মুখ মনের আয়না? খুব বিপাকে পড়লাম।

আমার প্রিয় বন্ধু মণ্টি একদিন ঘোষণা করল সে প্রেমে পড়েছে। আমরা অবাক। সেই প্রথম একজন জীবন্ত প্রেমিককে দেখলাম। যখন বলছিল তখন মণ্টির মুখখানা একদম অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। একটু লাজুক লালচে, খুশিতে ঝকঝকে। প্রেমে পড়লে যদি মানুষের মুখ অন্যরকম হয়ে যায় তাহলে মানতেই হবে মুখ মনের আয়না। শুধু মুখ নয়, ওর কথাবার্তার ধরন এবং ব্যবহারও বদলে গেল। কিছু চাইলেই আপত্তি না করে দিয়ে দিচ্ছে। বেশ্ উদার হয়ে গেল সে।

এখন প্রশ্ন হল, প্রেমিকাটি কে? উত্তরটা কিছুতেই দেবে না মণ্টি, বলল, 'ওটা

আমার গোপন ব্যাপার।' শেষ পর্যন্ত চাপাচাপিতে জানাল মেয়েটি সদর গার্লস স্কুলের ক্লাশ এইটের ছাত্রী। আমাদের ইচ্ছে হল তাকে দর্শন করার। মন্টির তীব্র আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে আমরা ছুটির একটু আগে স্কুলের গেটের সামনে ব্রিজের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু বাদেই বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা বেরুল হৈ হৈ করতে করতে। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম অজান্তেই। ওরা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় গ্রাহ্যই করছে না। সবাই এক ইউনিফর্মে। আমরা মন্টিকে জিজ্ঞাসা করছি কোন মেয়ে তার প্রেমিকা কিন্তু সে জবাব দিচ্ছিল না। এইসময় এক দঙ্গল মেয়ে গেট থেকে বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে। কিশোরীবেলা শেষ হচ্ছে ওদের। ওদের মধ্যে লম্বা সুন্দরী মেয়েটি যেন একটু বেশি হাসছে। কিন্তু যেই তার চোখ আমাদের ওপর পড়ল অমনি হাসি মুছে গিয়ে অন্ধকার নামল মুখে। পৃথিবীর সব গাম্ভীর্য মুখে এঁটে সে একটি রিকশায় উঠে চলে গেল। দ্বিতীয়বার তাকায়নি সে। যেন ছিল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, হয়ে গেল কালবৈশাখী। এত দ্রুত যদি মুখের চেহারা বদলে যায় তাহলে কি বুঝতে পারি? মন্টি শ্বাস ফেলে বলল, 'রিকশায় যে উঠল সে-ই সুদর্শনা। রিকশাতেই যাতায়াত করে ও।' এক বন্ধু ফিসফিস করে বলল, 'একদম মধুবালার মতো দেখতে।'

দু'দিন বাদে মন্টি এলেই ওর মুখ দেখে মনে হল, আকাশজোড়া কালো মেঘ, যেকোনো মুহূর্তেই বৃষ্টি নামবে। এই বোঝাটা যে মিথ্যে হল না তাতে আমি খুশি হলাম। মন্টি জানাল সুদর্শনা আর তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। খবরটা পাওয়ার পর সে সারারাত ঘুমাতে পারেনি। সুদর্শনার ভালোবাসা ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভালো। কিরকম পাগল পাগল লাগছে তার।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ সুদর্শনা এই সিদ্ধান্ত কেন নিল?'

পকেট থেকে একটা ছোট কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে মন্টি আমাকে দিলে পড়লাম, 'আমি চিড়িয়াখানার জীব নই যে লোক জুটিয়ে দেখাতে আনবে! আমি কি বারোয়ারি দুর্গাপ্রতিমা? ছিঃ।'

মন্টি বলল, 'বাকিটা ও লেখেনি, বন্ধুকে বলতে বলেছে।'

আমি ওর কাঁধে হাত রেখেছিলাম, 'যে মেয়ে এক লহমায় নিজের মুখের চেহারা বদলাতে পারে সে খুব বিপজ্জনক। গেছে, ভালোই হয়েছে।' সেই বয়সে মেয়েদের সঙ্গে মেশার সুযোগ না পেয়েও একজন বিশেষজ্ঞের মতো কথা বলেছিলাম।

মাস দেড়েক বাদে মন্টি এক রবিবারের সকালে এল আমাদের বাড়িতে। ও এসেই বাইরে থেকে সাইকেলের বেল বাজাত, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখা করতাম। মা বলতেন, 'ওই যে শ্যামের বাঁশি বাজল।'

সাইকেলে হেলান দিয়ে মন্টি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এক জীবনে ক'জনকে ভালোবাসা যায়? ভালো করে ভেবে বল!'

'বোকার মতো প্রশ্ন। মাকে ভালোবাসি বলে পিসিমাকে ভালো বাসব না কেন? বোন কি দোষ করল? তাকেও তো ভালোবাসি। এতে ভাবাভাবির কি আছে?'

'আঃ! ওই ভালোবাসার কথা বলছি না। মায়ের সঙ্গে তো প্রেম করি না।'

'ও!'

'সেদিন বাংলা স্যার বলছিলেন প্রকৃত প্রেমের মৃত্যু হয় না। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন। কাজে ব্যস্ত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন, আর কখনও বৃন্দাবনে আসার সময় পাননি। কিন্তু রাধা আর কাউকে ভালোবাসেননি।' মন্টি বলেছিল মুখ গম্ভীর করে।

সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ওর ওই গাম্ভীর্য সুদর্শনার জন্যে নয়। হৃদয় আহত হলে মুখের যে চেহারা হয় সেরকম মুখ হয়নি। এখন ওর মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ।

'এর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ভালো তো জোর করে বাসা যায় না। হঠাৎ হঠাৎ মনে এসে জুড়ে বসে। কোনো সমস্যা হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

নীরবে মাথা নাড়ল মন্টি, 'টিউলিপ।'

'টিউলিপ? মানে?'

'সুদর্শনা আর টিউলিপ একই ক্লাসে পড়ে।'

'এরকম নাম আগে শুনিনি।'

'তুই পারুল, চামেলি, বকুল, টগর, গোলাপী, রজনীগন্ধার নাম শুনিসনি?'

'শুনেছি। কিন্তু টিউলিপ তো বিদেশি ফুল।'

'ঠিক তাই। ওকে দেখলে তোর মনে হবে ও বিদেশিনী। খুব ফর্সা, চোখ নীল, হাঁটু অবধি ঢেউ খেলানো চুল কিন্তু কালো।'

'মুখ?'

হেসে ফেলল মন্টি। গালে লাল ছোপ পড়ল, বলল, 'কি করে বোঝাই!'

'একটু চেষ্টা কর।' বললাম আমি।

চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে মন্টি বলেছিল, 'ও সামনে এসে তোর দিকে তাকিয়ে একবার হাসলে সব শোক ভুলে যাবি।'

'কিন্তু—!' আমি ওর আবেগের বহর দেখে চিন্তায় পড়লাম, 'ও যখন জানবে তোর সঙ্গে সুদর্শনার প্রেম-প্রেম সম্পর্ক ছিল তখন কি হবে? এক ক্লাসে পড়ে যখন তখন জানতেই পারবে।'

মন্টি আমার কাঁধে হাত রাখল, 'টিউলিপ ওসব নিয়ে মোটেই ভাবে না। আমাকে লিখেছে। এই দ্যাখ।'

পকেট থেকে খাম বের করে দিল সে। খামের ভেতর সুন্দর কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'ফুল ভেবে কাঁটায় হাত দিলে রক্ত তো ঝরবেই। কিন্তু সেই স্মৃতি মনে রাখলে আরও বেশি ভুল করা হবে। আপনার জন্যে আমারও কষ্ট হচ্ছে। সত্যি।'

মন্টি জিজ্ঞাসা করল, 'কি বুঝলি?'

'অসাধারণ।'

'ও হাসলে তাই মনে হয়। গজদাঁত আছে যে।'

'তোর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ হয়েছে?'

'এখনও হয়নি। হবে। রাত ভোর হলে সূর্য তো উঠবেই।'

মুখ যদি মনের আয়না হয় এবং সেই মুখে যদি গজদাঁত থাকে তাহলে তার ব্যাখ্যা কি হবে? গজদাঁত সবার থাকে না। মাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সুন্দর গজদাঁত থাকলে হাসি খুব মিষ্টি হয়। টিউলিপের গজদাঁত সুন্দর কিনা আমি জানি না।

আমার অনুরোধে মন্টি এক বিকেলে নিয়ে গেল সদর স্কুলের সামনে। এদিন অন্য বন্ধুদের বলা হয়নি। শর্ত দিয়েছিল আমি যেন কখনও আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে না আসি। এক ভুল সে দ্বিতীয়বার করতে চায় না।

স্কুলে ছুটি হল। হাসতে হাসতে মেয়েরা বের হচ্ছে। আড়াল থেকে দেখতে পেলাম সুদর্শনা রজনীগন্ধার মতো ঝকঝকে হয়ে বান্ধবীদের সঙ্গ ছেড়ে রিকশায় উঠল তাদের হাত নাড়তে নাড়তে। ওর মুখে বিন্দুমাত্র বিষাদ নেই। আরও কয়েকটি মেয়ে বেরিয়ে আসার পরে যে মেয়েটি বই-এর ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বের হল সে তেমন লম্বা না হলেও দেখতে মিষ্টি। পাশে দাঁড়িয়ে মন্টি ফিসফিস করে বলল, 'টিউলিপ।'

স্বাভাবিক মুখে হেঁটে যাচ্ছিল টিউলিপ। ঠোঁট বন্ধ থাকায় আমি ওর গজদাঁত দেখতে পাচ্ছি না। রিকশায় উঠে সে যখন চলে গেল তখন মন্টি জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখলি?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।' সত্যি কথাই বললাম আমি।

'কেন?'

'ওর মুখ ভালো করে দেখতে পেলাম না যে।'

'আহা, মাথা থেকে পা অবধি তো দেখলি!' মন্টি বিরক্ত হল।

'হাত-পা দেখে মন বোঝা যায় না।' জবাব দিয়েছিলাম।

বাবুপাড়া পাঠাগার থেকে গল্পের বই আনার নেশা ছিল। সবই বাংলায়। হঠাৎ ইংরেজি বই-এর আলমারির সামনে গিয়ে দেখতে দেখতে বইটাকে পেয়ে গেলাম। ওটা বের করে যখন খাতায় লিখে নিচ্ছি তখন লাইব্রেরিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা তুমি পড়বে?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। বুঝলাম তিনি বেশ অবাক হয়ে গেছেন।

বইটির নাম, দি ফেস। ইংরেজি বই পড়ার অভ্যেস ছিল না। পাশে অভিধান রেখে পড়তে গিয়ে দেখলাম অসুবিধে হচ্ছে না। পুরুষদের কপালের গড়ন, চোখের আকৃতি, চোখের তারার রঙ, ভ্রু, নাকের গঠন, ঠোঁট, চিবুক থেকে শুরু করে গাল এবং কান পর্যন্ত প্রতিটি অংশের ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ওরকম যদি কোনো মানুষের সঙ্গে মেলে তাহলে তার স্বভাব কেমন হবে। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল আমি বেশ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি। কিন্তু মুশকিল হল, ওই বই-এ গজদাঁত নিয়ে একটি বাক্যও বলা হয়নি। অথচ টিউলিপের গজদাঁত রয়েছে।

এক রবিবারে বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'এই রেকর্ডগুলো অবনীবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। উনি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন, ওঁর জিনিস আর রাখা উচিত নয়।'

'অবনীবাবু কে?'

'দু-দিন এসেছিলেন এই বাড়িতে। বিকেলে বাড়িতে থাকলে তো জানতে পারবে? উনি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।' বাড়িটা বুঝিয়ে দিলেন বাবা।

মফস্বল শহরের ওইরকম পদাধিকারীরা নিজেদের কেউকেটা ভাবেন বলে আমি বা আমার বন্ধুরা খবর রাখতে চাই না। বাবার আদেশে যেতে হল। বিশাল লন, ফুলের বাগানের ওপারে দোতলা বাড়ি। মনে মনে বললাম, সরকারের টাকায় কি সুখে আছে!

বেয়ারা বলল, 'সাহেব একটু আগে বেরিয়ে গেলেন, ফিরতে রাত হবে।'

বললাম, 'এই রেকর্ডগুলো ওঁকে দিয়ে দিও।'

'একটু দাঁড়ান, কেউ কিছু দিলে সাহেব নিতে নিষেধ করেছেন। আমি ওপরে গিয়ে মেমসাহেবকে দেখাই, তিনি নিতে বললে আপনি চলে যাবেন।'

বেয়ারা রেকর্ডগুলো নিয়ে চলে গেলে মনে হল সাহেব লোকটা বোধহয় সৎ মানুষ। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ব্যবসায়ীরা উপঢৌকন দিতেই চাইবে।

বেয়ারার সঙ্গে যে মেয়েটি নেমে এল তার পরনে রঙিন স্কার্ট। মুখে একটু গম্ভীর ছাপ থাকলেও 'দি ফেস' বলছে মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী এবং স্পষ্টবাদী।

'আপনি কি সুজনকাকার কেউ হন?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ। উনি আমার বাবা।'

'বসুন। মা আপনাকে একটু বসতে বললেন। আপনার নাম আমি জানি, কাকার মুখেই শুনেছি। আমি টিউলিপ।' মেয়েটি হাসতেই গজদাঁত দেখতে পেলাম।

আমার বুকে তখন ঝড় উঠেছে। মন্টির দ্বিতীয় প্রেমিকা আমার বাবার পরিচিতজনের মেয়ে। কথা বলার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা এখান থেকে চলে যাচ্ছেন বলে শুনলাম।'

'রাইট। বাবা ট্র্যান্সফার হলে আমাদেরও সঙ্গে যেতে হয়।'

'এই শহরের কিছু মনে থাকবে তখন?' মন্টির জন্যে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

'নিশ্চয়ই। এখানে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। আমাদের স্কুলটা খুব ভালো। স্কুলের বান্ধবীরাও চমৎকার। খুব মিস করব ওদের।' বলল টিউলিপ।

'আর কিছু মিস করবেন না?'

'নিশ্চয়ই। এখানকার নদী, চা-বাগান—অনেক কিছু।'

'কোনো মানুষকে মনে পড়বে না?'

টিউলিপ আমাকে স্পষ্ট দেখল, 'কয়েকজনকে মনে থাকবে। তবে ক'দিন থাকবে তা জানি না। কেউ অকারণে দুঃখ পেলে আমার খুব খারাপ লাগে।'

এইসময় টিউলিপের মা নেমে এলেন। বেশি বয়স বলে মনে হচ্ছে না, সুন্দরী। মুখ দেখলাম, সুখের ছবি সেখানে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খারাপ লাগে তোর?' বলেই সামনে বসে বললেন, 'সুজনবাবুর ছেলে তুমি! কি নাম?'

আমি কিছু বলার আগেই টিউলিপ নাম বলে দিল।

মহিলা বললেন, 'কি খাবে বল? ঠাণ্ডা না গরম?'

মাথা নাড়লাম, 'এই সময় আমি কিছু খাই না। হ্যাঁ, কেন খারাপ লাগে?' আমি টিউলিপের দিকে তাকালাম।

টিউলিপ হাসল, 'আমার লেটেস্ট খারাপ লাগার ব্যাপারটা বলো মা।'

মহিলা বললেন, 'ও একদম পাগল। ওদের ক্লাশের একটি মেয়ের সঙ্গে কোনো একটা ছেলের আলাপ হয়েছিল। ছেলেটি তার বন্ধুদের নিয়ে এসেছিল দূর থেকে ওই মেয়েটিকে দেখাবে বলে। সেটা জানতে পেরে মেয়েটি রেগে গিয়ে সম্পর্ক রাখতে চায়নি। এটা শুনে আমার মেয়ের মনে দুঃখ হল। ভাবল ওই ছেলেটি অকারণে কষ্ট পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুই লাইন লিখে সান্ত্বনা দিয়ে দিল। এসব করলে যে লোকে অন্য মানে করবে তা মাথায় ঢুকল না।'

'অন্য মানে করবে মানে? আমি কাউকে স্বাভাবিক হতে সাহায্য করতে পারি না? আর যদি করে তো করুক। আই ডোন্ট কেয়ার। কাউকে সান্ত্বনা দেওয়া মানে নিশ্চয়ই প্রেম করা নয়।' বলে টিউলিপ আমার দিকে তাকাল, 'ওই ছেলে যাকে

চিনি না জানি না তাকে মনে রাখতে যাব কেন? বলুন।'

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওকে চিঠিটা দিলেন কি ভাবে?'

'আমার সঙ্গে একটা মেয়ে পড়ে যে কিনা ছেলেটির পাশের বাড়িতে থাকে। সেই মেয়েকে বলেছিলাম ওকে বল ভুলে যেতে। সে বলল, আমি বললে কানে তুলবে না, তুমি লিখে দাও। দিয়েছিলাম। এর মধ্যে অন্যায় কোথায়?'

টিউলিপরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়াতে মন্টি খুব শোকার্ত হয়েছিল। কিন্তু সেটা চার সপ্তাহের বেশি নয়। তৃতীয় প্রেমিকার সন্ধান পেয়ে গেল সে। এসে বলল, 'ভালোবাসা হল মেঘের মত। বুকের আকাশে আসে আবার মিলিয়ে যায়। কোন মেঘ চিরকাল আকাশে এক জায়গায় আটকে থাকে বল? কিন্তু এটা অসাধারণ। তবে ওর মুখে নেপালি নেপালি ছাপ আছে। একটু দেখে বলবি?'

'দি ফেস' বইতে সব আছে, কিন্তু মঙ্গোলিয়ান মুখ নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওর পায়ের পাতা সমানভাবে মাটিতে পড়ে?'

'জানি না। কেন?'

'না পড়লে ও দুটো খড়ম পা। তুই দুঃখ পাবি।'

বিরক্ত হয়ে মন্টি বলল, 'তুই এতদিন বলতিস মুখ হল মনের আয়না।'

'ঠিক তাই। তবে আপাদমস্তক বলে একটা কথা আছে। তাতে পাকেও খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'

তবু যেতে হল। এবার স্কুলে নয়। পুজোর প্যান্ডেলে। এটা বেশ ভালো দেখতে। কিন্তু চোখ চেরা, নাক চাপা। আমার জ্ঞানে এই মুখ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। অন্যমনস্ক হয়ে প্রতিমার দিকে তাকালাম। ডাকের সাজের দুর্গা। নাক বোঁচা, চোখ চেরা। মায়ের এই মুখ দেখে কি মনের অস্পষ্টটা ধরা পড়বে? ওই মুখ দেখলে বিশ্বাসই হবে না ইনি যুদ্ধ করছেন!

মন্টিকে বললাম, 'খুব ভালো। ঠিক দুর্গা ঠাকুরের মতো।'

'তার মানে?' হকচকিয়ে গেল সে।

'দুর্গা তো পাহাড়ের মেয়ে। হিমালয়ে বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কৈলাসে। তাই চোখ-নাক ওরকম। এটাও ওই দুর্গার মতো শান্তির পরিবেশ তৈরি করবে।' বললাম আমি।

বাড়িতে এসে 'দি ফেস' বইটা আবার পড়লাম। আগের বার পড়ার সময় শেষ করার পর পাতা ওল্টাইনি। আজ সেটা ওল্টাতেই একটা লাইন চোখে পড়ল, 'মুখ দেখে যে ব্যাখ্যা এই বইতে করা হয়েছে তা মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'

মনোজ মাতাল

উত্তর বাংলার শেষ প্রান্তে এই ছোট্ট গঞ্জ এলাকায় দু-চারটে খবরের কাগজ অবশ্যই আসে। কিন্তু তাদের খদ্দের বেশি নয়। চৌমাথায় কানাই-এর চায়ের দোকানে সবচেয়ে সস্তার যে কাগজটা রাখা হয়ে থাকে সেটাকে নিয়ে সকাল থেকে একটার পর একটা দল রাজাউজির সারে। দুপুরের মধ্যেই কাগজটাকে ঠিকঠাক চেনা যায় না। কানাই-এর চায়ের দোকানের সামনেই বাস স্টপ। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি থেকে যেসব বাস আরও দূরে যাচ্ছে তারা মিনিট পাঁচেকের জন্যে দাঁড়ায়। যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে নামে। তাদের ওপর ভরসা করেই কানাই ব্যবসা চালায়।

এই বিকেলে যখন ছেঁড়া কাগজ নিয়ে তিনটে বেকার যুবক খবর খোঁজার চেষ্টা করছিল তখন শিলিগুড়ির বাস এসে দাঁড়াল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েকজন চা পান করে উঠেও গেল বাসে। তখনই ওই দোকানের একটি কর্মচারী চিৎকার করে বলল, 'আরে! বই ফেলে গেছে।' কানাই বলল, 'যা, তাড়াতাড়ি যা, বাসে দিয়ে আয়।' কিন্তু বাসের নাগাল পেল না ছেলেটা।

কানাই জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, বাংলা না ইংরেজি?'

কর্মচারী বলল, 'মনে হচ্ছে ইংরেজি।'

'রেখে দে ওপাশে।'

যে তিনজন ছেলে কাগজ নিয়ে বসে ছিল তাদের একজন শম্ভু। দশ ক্লাস পাশ করে বেকার বসে আছে। বলল, 'দেখি, কী বই!'

কর্মচারী যেটা দিয়ে গেল সেটা একটা রঙিন ইংরেজি পত্রিকা। ভেতরের পাতায় কিছু ছবি। বাবরি মসজিদ ভাঙার বিষয় নিয়ে কিছু লেখা। শম্ভু সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিল মদন হাত বাড়িয়ে নিল। মলাটে বাবরি মসজিদ ভাঙার ছবি। কারও মুখ গামছায় বাঁধা কারও খালি। হঠাৎ উত্তেজিত হল মদন, 'আই, দ্যাখ দ্যাখ'। সে আঙুল রাখল যার ছবিতে সে এই গঞ্জেই থাকে। এককালে ভাল ছাত্র ছিল। ওর মতো ফর্সা সুন্দর চেহারা কারও ছিল না। এখন দিনরাত হাঁড়িয়া অথবা বাংলা খেয়ে পড়ে থাকে বলে ওর নাম হয়েছে মনোজ মাতাল। কেন সে মদ ধরল, ধরল তো কেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেল তা নিয়ে অনেক গল্প আছে। মা মারা গিয়েছিল আগেই, বাবা মারা যাওয়ার পর ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। পৈতৃক ব্যবসা দাদা দ্যাখে বলে বাড়ির অন্যান্যদের অন্নের অভাব হয় না। শম্ভু এবং ছোটকা একমত হল। এই ছবি মনোজ মাতাল ছাড়া আর কারও নয়। কিন্তু কী করে সম্ভব? উত্তর বাংলার এই নিঝুম গঞ্জ থেকে মনোজ মাতাল কি করে অযোধ্যায় গিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙবে? এখানে সিপিএম, আর এস পি আর কংগ্রেস ছাড়া

কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। বিজেপি বা উগ্রবাদী হিন্দুদের কোন দলের সঙ্গে মনোজ মাতালের যোগাযোগ হওয়ার কথাই নয়। তাছাড়া এখান থেকে অযোধ্যা তো কম দূর নয়। অতটা পথ ট্রেনে চেপে মদ না খেয়ে সে যাবে কী করে? মদ ছাড়া যার এক বেলাও চলে না ট্রেনে সে মদ খাবে কী করে। কিন্তু ছবি বলছে এই লোকটা মনোজ মাতাল ছাড়া আর কেউ নয়। মনোজ মাতাল মসজিদ ভাঙছে। এরকম জঘন্য অপরাধ করল মনোজ মাতাল? পুলিশ জানতে পারলে নির্ঘাৎ দশ বছর জেল।

শম্ভু বলল, 'ওই অন্যায় কাজটা যখন করেছে তখন ওর জেলেই যাওয়া উচিত।' ছোটকা বলল, 'আচ্ছা, শুনেছি পৃথিবীতে একই রকম দেখতে দুটো লোক থাকে।' মদন মাথা নাড়ল, 'আমিও শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে এই ছবিটা মনোজ মাতালের ডুপলিকেটের। আগে যখন মদ খেতো না তখন মনোজদা বলতাম। মনোজদা মহম্মদ রফি, তালাত মামুদের গান গাইত, মনে আছে?'

শম্ভু উঠে দাঁড়াল, এখনও ওকে বাড়িতে পাওয়া যাবে। পাঁচটার সময় বেরিয়ে রামচন্দ্রের ভাটিখানায় যায়। তার আগেই ওকে ছবিটা দেখাই, কী বলে শুনে আসি।'

বাজারের পেছনে মোটামুটি নির্জন এলাকায় বাড়িটা। গেট খুলতেই বিরাট উঠোন। উঠোনের দুপাশে দুটো কাঠের দোতলা। একটা লোক গরুকে খাবার দিচ্ছিল। শম্ভু তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মনোজদা বাড়িতে আছে?'

'এখনও আছে।' লোকটি জবাব দিল। তারপর বাঁ দিকের দোতলা দেখিয়ে বলল, 'ওপরে চলে যাও।'

কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই মনোজ মাতালকে দেখতে পেল ওরা। একটা ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে আছে। আশেপাশে কেউ নেই। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে।

মদন ডাকল, 'মনোজদা!'

মনোজ মাতাল তাকাল, 'এখানে কেন? চাঁদা তো দাদাই দেয়।'

'আমরা চাঁদার জন্যে আসিনি। এই পত্রিকাটা একটু আগে পেলাম। দ্যাখো।'

'আমি দেখে কী করব?' হাত নাড়ল মনোজ মাতাল।

'তোমার ছবি ছাপা হয়েছে।' ছোটকা বলল।

'ভ্যাট। কই, দেখি!'

পত্রিকার মলাটে চোখ রাখল মনোজ মাতাল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট কামড়াল সে, 'না না এটা আমার ছবি না। কি যে দেখিস তোরা।'

'তোমার মুখের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। ডান হাতে যে কোদালটা ধরেছ তার আঙুলের আংটিটা দ্যাখো।' শম্ভু বলল।

'কাকে কাকে দেখিয়েছিস পত্রিকাটা?'

'আমরা তিনজন ছাড়া কেউ দ্যাখেনি। তোমার ছবি নয় বলে যখন বলছ তখন কোন ভয় নেই। ঠিক আছে, চলি।' মদন বলল।

'দাঁড়া। ওটা রেখে যা। ভেতরের লেখাগুলো পড়ব।'

'কখন পড়বে? তোমার তো কাল দুপুরের আগে হুঁস ফিরবে না।'

'কি? এত বড় কথা বললি? বলতে পারলি?' চিৎকার করল মনোজ মাতাল।

ওরা আর দাঁড়াল না। পত্রিকাটা নিয়েই নিচে নেমে এল। ফেরার সময় ওরা তিনজনেই একমত হল, ছবিটা মনোজ মাতালের। সেই গরুর পরিচর্যা করা লোকটি একটা ব্যাগ নিয়ে ফিরছিল, যেচে জিজ্ঞাসা করল। 'কথা হয়েছে?'

শম্ভু বলল, 'হ্যাঁ।'

লোকটা হাসল, 'গত দুই বছরের মাত্র দুবার ওর কাছে লোক এল।'

'দুবার। আগেরবার কে এসেছিল।'

'ছোটোবাবুর কলেজের বন্ধু। দু'রাত ছিল। বাড়ি থেকে বের হয়নি। ওই দুদিন নেশা করেনি ছোটবাবু। তারপর বন্ধুর সঙ্গে কোথাও চলে গিয়েছিল। ফিরে এল কিছুদিন আগে। আচ্ছা, চলি।'

ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকাল। আর কোন সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত ওরা একমত হল। এরকম জঘন্য অপরাধ যে করেছে তাকে ছেড়ে দেওয়া খুব অন্যায় হবে। হোক গঞ্জের ছেলে, মনোজ মাতাল বলে ক্ষমা করা উচিত নয়। ওরা পরের দিন সকালে থানায় গেল। থানা মাইল দশেক দূরের গঞ্জে। দারোগাবাবু সব শুনে চোখ কপালে তুললেন। মনোজ মাতালের নাম তিনি ভাল করে জানেন। ভাটিখানায় মারপিটের অপরাধে ওকে ধরে এনেছিলেন একবার। ভদ্র বাড়ির শিক্ষিত ছেলে বলে সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবি দেখার পর তাঁর মনে হল মনোজ মাতালকে গ্রেপ্তার করলে সেটা জব্বর খবর হবে। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে। সময় নষ্ট না করে কয়েকজন সেপাইকে জিপে বসিয়ে ছুটে গেলেন গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও লোকটাকে বাড়িতে পেলেন না তিনি। শুনলেন রোজ যেমন পাঁচটা নাগাদ বের হয় গতকালও তাই বেরিয়েছে। বুঝলেন রামচন্দ্রের ভাটিখানায় আকণ্ঠ গিলে পড়ে আছে এখনও।

রামচন্দ্র পুলিশ দেখে হাতজোড় করল সে মাথা নেড়ে বলল, 'মনোজ মাতাল গতকাল তার ভাটিখানায় আসেনি। পরশু বারোটাকা আট আনা বাকি রেখে গিয়েছিল, বলেছিল গতকাল এসে শোধ করে দেবে কিন্তু আসেনি।'

তখন কয়েকটা মাতাল ইতিউতি বসেছিল। তারাও একই কথা বলল।

দারোগাবাবু ফাঁপরে পড়লেন। গেল কোথায় লোকটা।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর হাল ছেড়ে দিলেন দারোগাবাবু। সবাইকে জানিয়ে রাখলেন, মনোজ মাতালকে দেখলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়। তারপর এস পি সাহেবের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন। বাবরি মসজিদ ভাঙার অন্যতম কালপ্রিট মিসিং।

কিন্তু মনোজ মাতালের আর খবর পাওয়া গেল না। গঞ্জে তাকে কেউ দেখতে পেল না।

এরপর বহুবছর কেটে গেছে। মনোজ মাতালের কথা ভুলেই গেছে গঞ্জের মানুষ। শম্ভু এখন ভাল ব্যবসা করে। চা-বাগানগুলোতে চা পাতা সাপ্লাই দেয় সে। দুটো পয়সা হয়েছে। বিয়ে থা করেছে। শম্ভুর মা অনেকদিন ধরে বায়না ধরেছিলেন তিনি তীর্থ করতে যাবেন। অন্তত হরিদ্বার-কনখল-ঋষিকেশটা দেখার খুব ইচ্ছে। এই বছর লাভ একটু বেশি হওয়াতে শম্ভু মা বউ বাচ্চাকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বের হল। হরিদ্বার তাদের ভাল লাগল। দিদির হোটেলের নিরামিষ খাবার বেশ উপভোগ করল। তারপর টাঙ্গা ভাড়া করে গেল কনখলে। সেখানে অনেক আশ্রম, অনেক মন্দির। মা বললেন, 'শম্ভু রে, তুই আমাকে এখানে রেখে যা। মন ভরে পুণ্যি করি।'

শম্ভু বলল, 'পাগল নাকি!'

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা আসার পর গঙ্গার ধারে একটি মন্দিরের সামনে বেশ ভিড় দেখল ওরা। জিজ্ঞাসা করে জানল ওটা অন্নদামায়ের মন্দির। মা একেবারে ঘরের মেয়ের মতো। আজ মায়ের উৎসবতিথি। স্বামী মহানন্দ সিদ্ধ পুরুষ। তিনিই মায়ের প্রধান সেবক। তাঁর দর্শনেও মহাপুণ্যলাভ হয়।

ওরা, লাইন দিল। ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা পাঁচিল ঘেরা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করল। পুরো চত্বরটা ভক্তদের ভিড়ে ভরে গেছে, মা অন্নদার মূর্তি দেখে ওরা খুব খুশি হল। ঠিক বাঙালি মায়ের ঘরোয়া মূর্তি। দেখলেই মনে শান্তি আসে। স্বামী মহানন্দের দর্শন পেল ওরা। মানুষটির শরীর থেকে যেন জ্যোতি বের হচ্ছে। অনেক বয়স হওয়া সত্ত্বেও শরীর এখনও টানটান। বললেন, 'কোন কিছু দরকার নেই। দুবেলা চোখ বন্ধ করে শুধু মা বলবেন। তাতেই হবে।'

ফেরার পথে টাঙ্গাওয়ালার খোঁজ করল শম্ভু। তাদের নামিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে যাওয়ার সময় বলেছিল অপেক্ষা করবে। লোকটার চেহারা ভাল করে মনে রাখেনি।

দূরে দাঁড়ানো একটা টাঙ্গাওয়ালার কাছে গিয়ে শম্ভু জিজ্ঞাসা করল, 'দিদির হোটেলের কাছে যাব। কত নেবে?'

লোকটার মাথায় টাক, চিবুকে দাড়ি। মুসলমান বলে মনে হচ্ছিল। হিন্দীতে বলল, 'পঞ্চাশ টাকা।'

শম্ভু বলল, 'আসার সময় তিরিশ দিয়েছি।'

'আপনার যা ইচ্ছে। হয় যাবেন নয় যাবেন না।'

অগত্যা উঠল ওরা। টাঙ্গাওয়ালার পেছনে বসেছিল শম্ভু। চলতে শুরু করামাত্রই তার নাকে গন্ধটা লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মদ খেয়েছ?'

টাঙ্গাওয়ালা কথা বলল না।

'এই জায়গায় মাছমাংস ডিম মদ নিষিদ্ধ না?'

আচমকা বাংলায় কথা বলল লোকটা, ' তোমার এত মাথাব্যথা হচ্ছে কেন?'

চমকে উঠল শম্ভু। গলার স্বর বাংলা শোনার পর চেনা লাগল।

'আপনার নাম কি?'

লোকটা উত্তর দিল না।

দিদির হোটেলোর কাছাকাছি এসে বলল, 'নেমে যাও।'

পঞ্চাশটা টাকা বাড়ানো হাতে দিল শম্ভু। তারপর চাপা গলায় বলল, 'মনোজদা না?'

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে লোকটা মাথা নাড়ল, 'মনোজ মাতাল।'

ভিসার নাম ভালবাসা

পোর্টঅথরিটি বাস টার্মিনাসের গায়েই ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের রেল স্টেশন। অ্যাটালান্টিক সিটিতে সারা দুপুর কাটিয়ে নব্বই ডলার হেরে বাসে চেপে ফিরে এসেছিল রামানন্দ। বারো ঘণ্টার আসা-যাওয়ার জন্যে বাসের টিকিট কাটতে গায়ে লাগে না কারণ নামার পরই ওই অঙ্কের কুপন দেওয়া হয় জুয়ো খেলার জন্যে। আজ প্রায় আড়াইশো ডলার জিতেছিল সে, কিন্তু লোভই কাল হল। সেটা খেয়ে নিয়ে স্লট মেশিন খুশি হল না, পকেটের নব্বই ডলারও গিলে ফেলল। ফেরার পথে কেবলই মনে হচ্ছিল, প্রায় চার হাজার পঞ্চাশ টাকা নষ্ট করার গল্প দেশে ফিরে গিয়ে কাউকে বলা যাবে না।

রামানন্দ নিউইয়র্কে এসেছিল একটা সেমিনারে যোগ দিতে। আসা-যাওয়ার প্লেনভাড়া লাগেনি। দুদিন সেমিনারের আতিথ্য নেওয়ার পর সে চলে এসেছিল কুইন্সের ইউনিয়ন টার্নপাইকের এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধু ব্যস্ত মানুষ। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যার ফেরে। তাতে কোনও অসুবিধা হয় না রামানন্দর। শহরটাকে সে মোটামুটি চেনে।

আজ প্ল্যাটফর্ম একদম ফাঁকা, ছুটির দিনে কেউ সন্ধের পরে বোধহয় এই

অঞ্চলে দরকার না পড়লেও আসে না। ট্রেনও চলাচল করে একটু সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতেই রামানন্দ লোকটাকে দেখতে পেল। খাটো চেহারা, বেশ রোগা, চোখে চশমা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, বগলে একটা জীর্ণ চামড়ার ব্যাগ। পরনের জামাটাও বিবর্ণ। লোকটাকে দেখামাত্র হরিপদ কেরানির কথা মনে এসে গেল। পশ্চিমবাংলার শহরে শহরে এইরকম চেহারার অনেক মানুষ ছড়িয়ে আছেন যাঁরা ভাগ্যের কাছে হেরে গিয়ে বাঁচার জন্যে বাঁচছেন। সে লক্ষ করল মানুষটা চারপাশে তাকাচ্ছে বেশ দুর্বল চোখে। চামড়ার রং বলছে ইনি সাদা আমেরিকান। লোকটির সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হল রামানন্দর। লোকটি যদি কেতাদুরস্ত এবং সচ্ছল চেহারার হত তাহলে ইচ্ছেটা হত না। বেশির ভাগ আমেরিকানের ইংরেজি উচ্চারণ সে বুঝতে পারে না। তাই বাধ্য না হলে কথা বলে না।

সে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইউনিয়ন টার্নপাইকের ট্রেন এখানেই পাব তো?'

লোকটি মুখ তুলে তাকে দেখল। চশমার কাচের তলায় চোখ কুঁচকে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর মাথা নেড়ে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'তাই তো পাওয়া উচিত?'

'আমি তো বাসের রাস্তা চিনি না, ট্রেনই ভরসা।' রামানন্দ বলল।

লোকটা কোনও কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকল।

'এখন ইন্ডিয়াতেও মাটির তলায় ট্রেন চলছে।' কথা খুঁজল রামানন্দ।

'ইন্ডিয়া!'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে ইন্ডিয়া নামে একটা দেশ আছে। আমার দেশ।'

লোকটা হাসল, 'আমি জানি। অবশ্য এদেশের অনেক মানুষ জানে না। ইন্ডিয়া, যার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা। কেন যে ওরা ওঁকে মেরে ফেলল! বেশ জোরে শ্বাস ফেলল লোকটি।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল রামানন্দ। ঠিক তখনই ট্রেন এসে গেল। দরজা খুলতেই ভেতরের খালি বেঞ্চির একটাতে বসতেই সে লোকটিকে দেখতে পেল। ট্রেনে উঠে এপাশ-ওপাশ দেখছে রামানন্দ। হাসল, মাথা নেড়ে তার দিকে আসতে বলল। লোকটি গুটিগুটি তার পাশে বসতেই ট্রেন চালু হল। কলকাতায় পাতাল রেল চললে ভেতরে বসে কথা বলা যায় না ভয়ঙ্কর আওয়াজের জন্য। এখানে এরা শব্দটাকে মেরে রেখেছে।

রামানন্দ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম জানতে পারি?'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'আমি হ্যারি।'

'আমি রামানন্দ। আপনি রাম বলতে পারেন,' বলেই তার বেশ মজা লাগল।

যাকে সে হরিপদ বলে ভেবেছিল তার আসল নাম টম ডিক অ্যান্ড উইলি যা

হোক একটা হতে পারত, হ্যারি কেন হল? হ্যারি আর হরিপদ একদম কাছাকাছি। সে জিজ্ঞেস করল, 'আজ তো ছুটির দিন। বেড়াতে বেরিয়েছিলেন?'

মাথা নাড়ল হ্যারি, 'না। এই সপ্তাহের কাজ কিছু বাকি ছিল, তা শেষ করে এলাম।'

'ওভারটাইম কাজ করলে নিশ্চয়ই বেশি রোজগার হবে?'

'না! আজ না গেলে মাইনের টাকা থেকে পেনাল্টি হিসেবে খানিকটা কেটে নিত! কেন সপ্তাহের কোটা আমি সপ্তাহে শেষ করিনি!' বলেই হ্যারি তাকাল, 'আপনাদের দেশে এই ব্যবস্থা নেই?'

'না। কাজ শেষ না করার জন্য কাউকে পেনাল্টি দিতে হয় না। বরং ছুটির দিনে কাজ করলে এক্সট্রা রোজগার হয়।' রামানন্দ বলল।

'আমি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট। অ্যাকাউন্টেন্সি খুব ভাল জানি, কিন্তু এখানে যা রোজগার করি তাতে খরচ চালাতে পারছি না। খুব কষ্টের মধ্যে আছি।' বেশ জোরে শ্বাস ফেলল হ্যারি।

চমকে উঠল রামানন্দ। একজন আমেরিকান যে অ্যাকাউটেন্সি খুব ভাল জানে, কী কথা বলছে? চেহারা এবং পোশাকে এই কথার সমর্থন আছে। কিন্তু এমন হতে পারে লোকটা কোনও কাজই জানে না এবং করে না, সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। ইদানীং সেই সাহায্যের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করছেন ওবামা সরকার, তাই এই লোকটা বানানো গল্প বলছে। হ্যারি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের দেশে বাড়িতে রান্না করে খেলে একটা মানুষের কীরকম খরচ হয়?'

'কী খাবে তার ওপর নির্ভর করছে।'

হ্যারি তার কাঁচাপাকা চুলে আঙুল বুলিয়ে ভাবল। তারপর বলল, 'ধরো, সকালে এক কাপ চা, ব্রেকফাস্টে একটা বয়েলড এগ অথবা ওমলেট আর দু'পিস ব্রেড, দুপুরে দুটো স্যান্ডউইচ আর রাত্রে—থেমে গেল হ্যারি।

'হ্যাঁ, বলো।'

'রাত্রে আমি একটু ভালো খেতে চাই। রাইস, ভেজিটেবল আর দুটুকরো মাংস দিয়ে অনেকখানি ঝোল। সব একসঙ্গে। এখন শুধু ভেজিটেবল স্টু খাচ্ছি।'

রামানন্দ হিসেব করে বলল, 'খুব বেশি হলে ফিফটি সেন্ট।'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠল হ্যারি, 'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি।'

'মাই গড!' চোখ বন্ধ করল হ্যারি, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'একটা ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাট ভদ্র এলাকায় কী রকম ভাড়ায় পাওয়া যায়?'

'মফসসলে অনেক কম, কলকাতায় মাসে একশো ডলার!'

'কী বলছ রাম, এ তো স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।'

'ভারতবর্ষে এটাই সত্যি।'

'তুমি এখানে আর কতদিন আছ?'

'আছি। ধরো, দিনসাতেক।'

নামবার আগে বন্ধুর দেওয়া মোবাইলের নাম্বার দিতে হল হ্যারিকে, হ্যারি বলল, 'আমি যদি তোমাকে ফোন করি তাহলে বিরক্ত হবে না তো?'

'বিন্দুমাত্র না।' ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনে নেমে পড়ল রামানন্দ।

স্টেশন থেকে বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছতে মিনিট বারো হাঁটতে হয়। ছবির মতো রাস্তা। তবে লোকজন নেই। মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে জোর গতিতে। মাঝপথে ডান দিকে একটা কবরখানা পড়ে, বন্ধুর সঙ্গে একদিন গিয়েছিল ভেতরে। প্রচুর গাছগাছালির মধ্যে অজস্র মৃত মানুষকে নিয়ে রয়েছে ফলকগুলো।

বন্ধু হেসে বলেছিল, 'এখন এইরকম দেখছ, মাঝরাত্রে ওঁরা কবর থেকে বেরিয়ে এসে গল্প করেন।'

রামানন্দ জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাঃ! গল্পের সাবজেক্ট কী?'

বন্ধু বলেছিল, এক বৃদ্ধ সদ্য আসা একজন প্রৌঢ়কে জিজ্ঞেস করবে, ওহে এখন গ্যাসের দাম কত হয়েছে? প্রৌঢ় পাল্টা জিজ্ঞেস করবে, 'এখানে আসার আগে কত দেখে এসেছিলেন?' বৃদ্ধ বলবেন, 'বেড়েছিল, গ্যালনে ষাট থেকে সত্তর হয়েছিল।' প্রৌঢ় হাসবে, 'এখন এক গ্যালনের দাম চার ডলার নব্বই সেন্ট।' শোনামাত্র বৃদ্ধ তাঁর কবরে ফিরে যাবেন। সেখানে গ্যাসের দরকার হয় না। সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির মুখ মনে পড়ল। লোকটার যে গাড়ি নেই তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু একজন আমেরিকান কলকাতার বাজারার শুনে স্বপ্ন ভাবছেন একথা দেশের বন্ধুরাও বিশ্বাস করতে চাইবে না।

ঠিক দুদিন পরে হ্যারির ফোন এল। রামানন্দ তখন ইলিশের আঁশ ছাড়াচ্ছে। জ্যাকসন হাইটের এক বাংলাদেশির দোকানে ইলিশের দাম পাউন্ড প্রতি বারো ডলার। দুই পাউন্ড মানে আট ডলার, দেশের টাকায় তিনশো ষাট টাকা। আসার আগে মানিকতলা বাজারে গিয়ে শুনেছিল ইলিশ পাঁচশো টাকা কেজি, আর নিউইয়র্কে সে এককেজি কিনেছে তিনশো ষাট ভারতীয় টাকায়। কেনার সময় পাথরের চেয়ে শক্ত ছিল মাছটা, মাছওয়ালা বলেছিল, 'দশ মিনিট পানিতে রাখলে দেখবেন কী হয়।' সত্যি একদম টাটকা মাছ হয়ে গেল যেন। সেই মাছের আঁশ ছাড়াবার সময় ফোনটা বাজল।

'হ্যালো!' রামানন্দ জানান দিল।

'মিস্টার রাম?' হ্যারির গলা।

'হ্যাঁ! মিস্টার হরিপদ, আই থিঙ্ক, মিস্টার হ্যারি?'

'কী আশ্চর্য! আপনি আমাকে চিনতে পারলেন?'

'নিশ্চয়ই! বলুন, কী করতে পারি?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করে একটু কথা বলা যাবে?'

'কোথায় দেখা করলে আপনার সুবিধা হয়, বলুন।'

'আমরা এখন ইউনিয়ন টার্নপাইক স্টেশনের সামনে আছি।'

'আপনারা মানে?'

'আমি আর আমার স্ত্রী।'

'ওহো! ওখান থেকে আমি যেখানে থাকি সেখানে হেঁটে এলে বারো মিনিট লাগবে। চলে আসুন।' বাড়ির নাম্বার রাস্তার নাম বলে দিল রামানন্দ।

ইলিশ মাছের ভাপে ভাপে করা খুব সহজ। গোটা ছয়েক টুকরো ভাপেতে বসিয়ে দিয়ে সাবানে হাত ধুতেই নিচে বেল বাজল।

নিচে নেমে দরজা খুলতেই হ্যারি বলল, 'গুড মর্নিং। ইনি আমার স্ত্রী এলিজাবেথ।'

এলিজাবেথ মাথা নেড়ে বললেন, 'গুড মর্নিং।'

'মর্নিং। আসুন ওপরে চলে আসুন আমার সঙ্গে।' দরজা বন্ধ করে ওপরের বসার ঘরে নিয়ে এসে ওদের বসতে বলল রামানন্দ।

এলিজাবেথকে হ্যারির সমবয়সি বলে মনে হচ্ছে, বেশ রোগা কিন্তু চুল এখনও পাকেনি। চোখে চশমা, হাতের ব্যাগটি বেশ বড়। পরনে পা ঢাকা স্কার্ট।

'রাম।' একটু ঝুঁকে বসল হ্যারি, 'লিজের সঙ্গে আমি আলোচনা করে দেখলাম। আমরা তোমাদের দেশে গিয়ে থাকতে চাই। আমি ভাল অ্যাকাউন্টেন্ট, কম্প্যুটার ব্যবহার করছি বহু বছর ধরে। তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পারবে?' এতটা ভাবেনি রামানন্দ, 'তোমরা আমেরিকান হওয়া সত্ত্বেও ইন্ডিয়াতে গিয়ে থাকবে?'

উত্তর দিল এলিজাবেথ, 'এই দুইদিন আমরা ইন্ডিয়া সম্পর্কে অনেক খবর নিয়েছি। একজন ইটালিয়ান মহিলা এখন ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় পার্টির প্রেসিডেন্ট। তিনি যদি থাকতে পারেন তাহলে আমরা কেন পারব না?'

'কিন্তু কেন আমেকিায় থাকতে চাইছ না?'

'আমি আড়াই হাজার ডলার মাইনে পাই। আড়াই শো ডলার কোম্পানিতে নানান খাতে কেটে নেয়। বাড়িভাড়া দিতে হয় নয়শো ডলার। তারপর ইন্সিওরেন্স কোম্পানিকে প্রতিমাসে পেমেন্ট করতে হয়। আমার ছেলে মরে গিয়েছে। তার চার বছরের বাচ্চা আমাদের কাছে আছে। ওর মা আর একজনকে বিয়ে করে চলে গেছে। আগে জিনিসপত্রের দাম কম ছিল। কোনওরকমে ম্যানেজ করতাম। নাতির স্কুলের ফিজ দেওয়ার পরে চোখে অন্ধকার দেখছি। তুমি ইন্ডিয়ার কথা যা

বলেছিলে তাতে আমাদের মনে হয়েছে বাকি জীবনটা ভাল ভাবে বাঁচতে পারব।' হ্যারি বলল।

রামানন্দ বলল, 'কিন্তু ইন্ডিয়ার আর কিছু তোমরা জানো না।'

এলিজাবেথ মাথা নাড়ল, 'শুনেছি অনেক মানুষ সেখানে। কোনও ডিসিপ্লিন নেই। রাস্তাঘাট পরিষ্কার নয়। গ্রামের দিকে মেডিক্যাল ফেসিলিটিস নেই। কিন্তু ওখানকার মানুষদের মন খুব ভাল। জিনিসপত্রের দাম যতই বাড়ুক আমেরিকার তুলনায় কিছুই নয়, শুনেছি পাঁচ-ছয় সেন্টে এক কাপ চা পাওয়া যায়।'

'কিন্তু ওখানে তোমরা ডলারে রোজগার করবে না।'

'আমাদের আড়াইজনের থাকা-খাওয়ার জন্যে কত খরচ হবে ওখানে?'

'পঁচিশ হাজার। মানে সাড়ে পাঁচশো, পাঁচশো ডলার।'

হ্যারি হাসল, 'তাহলে কোনও চিন্তাই নেই, আমি চাকরি ছেড়ে দিলে অফিস আমাকে মাসে বারোশো ডলার পেনশন দেবে। তাহলে চারশো ডলার বেঁচে যাবে। আমার ওখানে একটু নিরিবিলি জায়গায় থাকতে চাই। বড় শহরেই।

'কিন্তু ইন্ডিয়াতে যাবে কী করে?'

হ্যারি হাসল, 'প্লেনের ভাড়া আমরা জোগাড় করে নেব।'

'না না। ইন্ডিয়াতে ঢুকতে তো ভিসা লাগবে?'

এলিজাবেথ অবাক হল, 'আমেরিকানদের কি ভিসা দরকার হয়?'

'ইন্ডিয়া তো কানাডা নয়? অবশ্য দরকার হবে।'

'ঠিক আছে, আমরা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করব।'

'বেশ! অ্যাপ্লাই করলে তোমাদের ট্যুরিস্ট হিসেবে তিন মাস বা ছয় মাসের ভিসা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট। সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে চলে আসতে হবে। নইলে আইন তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে।' রামানন্দ বলল।

স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকাল। এলিজাবেথ কাতর গলায় রামানন্দকে বলল, 'শুনেছি ইন্ডিয়া অহিংসায় বিশ্বাস করে। ইন্ডিয়ানদের মন খুব বড়, আমরা যদি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপিল করি, আমাদের থাকতে দাও, তাহলে কি দেবে না?'

রামানন্দ কী বলবে বুঝতে পারছিল না। এলিজাবেথ তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে বলল, 'অ্যাপিল নিশ্চয়ই করতে পারেন, তবে ওখানে গিয়ে করার চেয়ে যাওয়ার আগে করা ভাল।'

হ্যারি বলল, 'শুনেছি ইন্ডিয়াতে কয়েক কোটি মানুষ থাকে। আরও তিনজন যদি যোগ হয় তাহলে কী এমন তফাত হবে।'

রামানন্দ হেসে ফেলল। 'ঠিকই! আচ্ছা, আমি আমার প্রিয় মাছ রান্না করেছি। আসুন একসঙ্গে মাছভাত খাই।'

'ক্যাট ফিস?' এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল।

'না ইলিশ! অনেকটা আপনাদের সার্ডিন মাছের মতো।'

'কাঁটা আছে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আছে। কিন্তু স্বাদ অতুলনীয়।'

'সরি রাম, আমি কাঁটাওয়ালা মাছ খেতে পারি না।'

'আমিও।' বলল এলিজাবেথ। 'তোমরা কি খুব মাছ খাও?'

'হ্যাঁ! তবে নিরামিষ খেতে অনেকে পছন্দ করেন।' রামানন্দ উঠে দাঁড়াল, 'ঠিক আছে, কাল রাত্রে চিকেন করেছিলাম। তাই দিচ্ছি ভাতের সঙ্গে।'

এলিজাবেথ বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা এখানে খেতে পারব না। আমার নাতি এখন একা বাড়িতে আছে। ফিরে গিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে তিনজনে একসঙ্গে খাব।'

'একটু দাঁড়াও।'

রান্নাঘরে গিয়ে একটা বড় প্লাস্টিকের কৌটোয় অনেকটা ভাত, মুরগির মাংস ঝোল সমেত সযত্নে আর একটাতে ঢেলে ক্যারিব্যাগে ভরে নিয়ে এল সে, 'এইটা নিয়ে যাও প্লিজ! তোমাদের তিনজনের হয়ে যাবে।'

'কী আশ্চর্য! কেন?' এলিজাবেথ উঠে দাঁড়াল।

'আজ আমি ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাব আর তোমাদের নাতি শুকনো স্যান্ডউইচ চিবোবে, খুব খারাপ লাগবে আমার।'

ক্যারিব্যাগটা হাতে নিয়ে এলিজাবেথ বলল, 'রাম, আমরা এই পৃথিবীটাকে অনেক ভাগে ভাগ করে যে যার দখলে রেখেছি। কাউকে অন্যের ভাগকে নিজের ভাগ ভাবতে দিই না, অ্যাপিল করলেও ওরা দয়া করবে কি না জানি না, কিন্তু মানুষের মনে কোনও ভাগাভাগি নেই, সেখানে পৌঁছতে পাসপোর্ট বা ভিসার দরকার হয় না।'

হ্যারি বলল, 'ভুল বললে। হয়। সেই ভিসার নাম ভালবাসা। বাই রাম! তোমাকে আমাদের মনে থাকবে।'

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দুই প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াকে ক্যারিব্যাগ হাতে হেঁটে যেতে দেখল রামানন্দ। আজ দুপুরে ওরা তিনজন নিশ্চয়ই খেয়ে তৃপ্তি পাবে।

কুদমা

চাকরিটা যে বড়বউদির মামার এক কথায় হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি শিবশংকর। ভদ্রলোকের নাম হরিচরণ শর্মা। ব্রেবোর্ন রোডের তিনতলা জুড়ে অফিসটার দরজার বাইরে সাতটা কোম্পানির নাম লেখা। ভিতরের ঘরগুলোতে প্রচুর লোক কাজ করছে। এরকম অফিসে চাকরি পেলে বউবাজার থেকে হেঁটে আসতে বাসভাড়াও লাগবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা তাকে বলেছে, কোনও আশা কোরো না, চেষ্টা করে যাও।

নিজের নামের তলায় বড়বউদির মামার নাম লিখে স্লিপ দিয়েছিল বেয়ারার হাতে। আধঘণ্টা বাদে ডাক পড়ল। চওড়া টেবিলের ওপাশে সাফারি স্যুট পরা প্রবীণ ব্যক্তিটি তাকে দেখে বললেন, 'অ্যাপ্লিকেশন এনেছেন?'

দ্রুত ব্যাগ থেকে খামটা বের করে এগিয়ে দিল শিবশংকর।

খাম খুলে কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে হরিচরণ শর্মা বললেন, 'শিবশংকর। ভগবানের নামে নাম। খুব ভাল। দেখুন ভাই, যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁর সম্মান আমার রাখা উচিত। কিন্তু আমার অফিসে নতুন লোক রাখলে তাকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই সেটা চাইবেন না!'

দ্রুত মাথা নাড়ল শিবশংকর, 'না।'

'গুড। আপনি যেতে পারেন, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে নেব।'

শিবশংকর ঢোঁক গিলল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে ভাবল, চেষ্টার বিকল্প যখন নেই, তখন চেষ্টা করেই যেতে হবে।

'ওহো, দাঁড়ান, এদিকে আসুন।' হরিচরণ শর্মার গলা শুনতে পেল সে।

আদেশ মান্য করতে হরিচরণ শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ে করেছেন?'

'না।' অদ্ভুত প্রশ্ন, মনে মনে বলল শিবশংকর।

'কলকাতা থেকে দূরে গেলে থাকতে পারবেন?'

কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে যখন, তখন কি কোনও আশা আছে? সে মিথ্যে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনাকে এখনই চাকরি দিতে পারি। আপাতত মাসে পাঁচ হাজার পাবেন। এক বছর কাজ করে দেখান, তারপর মাইনে ঠিক করব। রাজি?'

'হ্যাঁ।' গলার কাছে হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছিল শিবশংকরের।

'বাইরে গিয়ে পিওনকে বলুন পাণ্ডেজির কাছে নিয়ে যেতে। আমি ওঁকে সব বলে দিচ্ছি।' হরিচরণ শর্মা হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন।

বড়বউদি চোখ কপালে তুলেছিলেন, 'সে কী? তুমি কলকাতার বাইরে চলে যাবে?'

'চাকরি তো পাচ্ছিলাম না, তোমার মামার জন্যে যখন পেলাম তখন যা পেয়েছি তাতেই খুশি থাকতে হবে।'

'ভাগ্যিস তুমি প্রেম-টেম করোনি—!' বড়বউদি হেসেছিল।

মাঝরাতে জংশন স্টেশনে নেমে ভোর অবধি অপেক্ষা করে লোকাল ট্রেনে উঠেছিল শিবশংকর। পাণ্ডেজি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কীভাবে পৌঁছতে হবে। খরচ বাবদ দুই হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছেন। ওটা নাকি হরিচরণ শর্মার নির্দেশ। লোকাল ট্রেন যাচ্ছিল প্রায় শামুকের মতো। সারারাত জেগে কাটানোয় ভোরের বাতাসে তার ঘুম পাচ্ছিল। ফাল্গুনের শুরুতেও বাতাসে ঠাণ্ডা ভাবটা রয়ে গিয়েছে। ছত্তিসগড়ের এই দিকটায় বোধহয় দেরিতে শীত যায়। শিবশংকর সোজা হয়ে বসল। ঘুমিয়ে পড়লে নামার স্টেশনটা পেরিয়ে যাবে ট্রেন। কামরায় এখন দশ-বারোজন যাত্রী। বেশিরভাগের চেহারা এই জীর্ণ লোকাল ট্রেনের মতন। শুধু উল্টোদিকের কোণে যে বৃদ্ধ বসে আছেন তাঁর পোশাক ও মুখ বলে দিচ্ছে তিনি বাকিদের থেকে আলাদা। বেশ খাটো, রোগা শরীর। তাঁর পাশে যে মহিলা বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মাথায় ঘোমটা থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বাপ-মেয়ে, নয়তো শ্বশুর-পুত্রবধূ। দ্বিতীয়টা না হওয়ারই কথা।

শিবশংকর বাইরে তাকাল। এখানকার মাঠ বুনো ঝোপ আর নুড়িপাথরে ভরা। বোঝাই যায় চাষ করা হয় না। দূরে দূরে কিছু গাছ যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ দেখলে আর তাকাতে ইচ্ছে করে না।

সকাল আটটা নাগাদ ট্রেনটা হাঁপাতে হাঁপাতে যে স্টেশনে থামল সেখানেই নামতে বলেছিলেন পাণ্ডেজি। বড় ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শিবশংকর দেখতে পেল বৃদ্ধ ও মহিলা নামার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। স্টেশনটি খুব ছোট।

পাণ্ডেজি বলেছিলেন, 'খবর পাঠাচ্ছি যাতে কেউ এসে স্টেশন থেকে আপনাকে নিয়ে যায়। ওখানে আমাদের টাঙা আছে, তাতেই যাবেন।'

কোনও চেকার নেই, রেলের সাধারণ কর্মচারীকেও প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল না।

অল্প কয়েকজন ট্রেন থেকে নামল, উঠল তারও অর্ধেক। শিবশংকর বাইরে এসে কোনও টাঙা দেখতে পেল না।

এর মধ্যে রোদের তেজ বেড়ে গেলেও সেটা সহ্যের সীমা ছাড়ায়নি। কোনও রিকশা নেই, ট্যাক্সিওয়ালাদের হাঁকাহাঁকিও নেই। নিশ্চয় যে আসছে সে একটু দেরি করে ফেলেছে। সে চারপাশে তাকাতেই গাছটাকে দেখতে পেল। লম্বা গাছ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে টকটকে লাল ফুল ফুটতে শুরু করেছে। বউবাজারের পার্কে কৃষ্ণচূড়া এবং রাধাচূড়া গাছ আছে। তাদের ফুলের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। সে গাছটার নীচে পড়ে থাকা একটা ফুল তুলে নিল। নাম না জানা এই ফুল কি শুধু বসন্তকালেই ফোটে?

'আপনি বাঙালি?'

মুখ ফিরিয়ে সে বৃদ্ধকে দেখতে পেল। কাছে এসে গিয়েছেন। সে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'ওই ফুলের রস খুব বিষাক্ত, হাতে লাগলে ঘা হয়ে যেতে পারে।'

শোনামাত্র শিবশংকর ফুলটাকে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ফুল এটা?'

'এখানকার দেহাতিরা বলে কুদমা। যারা আত্মহত্যা করতে চায় তারা এই সময় ওই ফুল তিন-চারটে খেয়ে নেয়। হাসপাতাল তো সেই জংশন স্টেশনে, নিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ পাওয়া যায় না। কোথায় যাবেন?'

'সুখাইচক।'

'এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। পাণ্ডববর্জিত জায়গা।'

'আপনি? মানে, আপনারা?'

'বাবা সদানন্দের আশ্রমে যাব। প্রত্যেক বছর, তা ধরুন বছর তিনেক হয়ে গেল, এই সময়ে আসছি। তিন-তিনটে বছর আমাদের দেখেছেন তিনি, এবার সদয় হয়ে বলেছেন দীক্ষা দেবেন।' হাতজোড় করে কপালে ঠেকালেন তিনি।

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'ব্রজবল্লভ ঘোষ।'

এই সময় দূরে একটা টাঙা দেখা গেল। স্টেশনের দিকে আসছে। শিবশংকর খুশি হল। পাণ্ডেজির পাঠানো খবর তা হলে এখানে পৌঁছেছে। চালকের পাশ থেকে নেমে এল রোগা লম্বাটে এক প্রৌঢ়, হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার ঘোষসাহেব, সর্বাঙ্গীন কুশল তো?'

ব্রজবল্লভ হেসে বললেন, 'একটু বাকি আছে, সেটা গুরুর আশীর্বাদে পূর্ণ হবে।'

প্রৌঢ় বলল, 'গুরুদেব বলেন, ভক্তই ভগবানকে প্রতিষ্ঠা দেয়, আপনাদের আশা পূর্ণ হবে। আমি কি খুব দেরি করে ফেললাম?'

ব্রজবল্লভ বললেন, 'না না। ট্রেন তো এইমাত্র এল।'

প্রৌঢ় এবার ভদ্রমহিলার সামনে গেল। 'মায়ের কি কোনও অসুবিধে হয়েছে?'

মাথা নেড়ে 'না' বললেন মহিলা। ঘোমটায় এখনও মুখ ঢাকা।

প্রৌঢ় বললেন, 'তা হলে চলুন, এমনিতেই বিলম্ব হয়ে গিয়েছে।'

বৃদ্ধ সযত্নে মহিলাকে টাঙায় তুলে দিয়ে নিজে উঠতে গিয়ে না পেরে প্রৌঢ়ের সাহায্য নিলেন।

শিবশংকর দেখল টাঙা ঘুরিয়ে নিয়ে চালক ফিরে গেল। প্রথমে মনে হল, বৃদ্ধ তো তাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না এগিয়ে দিতে হবে কি না। তারপরেই সে ভাবল, হয়তো ওঁরা সুখাইচকের বিপরীত দিকে যাচ্ছেন।

আরও মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে থাকার পরেও যখন সে কাউকে আসতে দেখল না, তখন ঠিক করল হেঁটেই যাবে। বৃদ্ধ বলেছেন পাঁচ কিলোমিটারের পথ। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে মেট্রো সিনেমা। কী আর এমন। শিবশংকর রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, এক আধটা গাছ যৌবন পার হব-হব আইবুড়ো মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে। রাস্তার লালচে ধুলো একটু বাদেই জুতোর বারোটা বাজিয়ে দিল। কিন্তু আকাশ অপূর্ব মায়াময় নীলে মাখামাখি। হাঁটতে ভাল লাগছিল শিবশংকরের। অনেকটা হাঁটার পরে সে ফাঁপরে পড়ল। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোন দিকে হাঁটলে সুখাইচকে পৌঁছনো যাবে? দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোনও মানুষ নেই। আচ্ছা, ওরা তো তাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বলে দিতে পারত কোন পথে যেতে হবে! আশ্চর্য মানুষ!

মিনিট দশেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মানুষ দেখার আশায়। তারপরে মনে হল ডানদিক থেকে একটা কিছু এগিয়ে আসছে। আর একটু স্পষ্ট হলে বুঝতে পারল সাইকেল চালিয়ে কেউ আসছে। একদম কাছে এসে গেলে শিবশংকর আবিষ্কার করল সাইকেল চালাচ্ছে একটি মেয়ে। পরনে জিন্‌সের ওপর গেঞ্জি। এই পোশাক এখন কলকাতার সর্বত্র দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তা বলে এরকম জায়গায় দেখবে ভাবতে পারেনি সে। তাকে ডিঙিয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে সাইকেল দাঁড়াল। তারপর ফিরে এল কাছে, 'এনি প্রবলেম?'

'হ্যাঁ।' ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করল শিবশংকর, 'সুখাইচকের রাস্তা কোনটা?'

এবার হিন্দিতে বলল মেয়েটি, 'সুখাইচকে কেন যাবেন?'

'ওখানে আমার চাকরি হয়েছে।'

'শর্মা'জ আইল্যান্ড-এ?'

'হ্যাঁ।'

'পিছনে উঠে বসুন।'

এক সেকেন্ড দেরি না-করে সুটকেস সামলে সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে বসল সে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'বাঙালি?'

'হ্যাঁ।'

সাইকেল চলল। এরকম জায়গায় এই মেয়ে কী করছে? বোঝাই যাচ্ছে পেটে বিদ্যে আছে। হয়তো বাপের জমিদারি আছে এখানে, ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। মেয়েটি চুপচাপ সাইকেল চালাচ্ছিল। বাতাস লাগছিল শরীরে তাই রোদের তাপ খারাপ লাগছিল না। কিন্তু মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, 'শর্মা'জ আইল্যান্ড'? এখানে দ্বীপ আসবে কী করে? চারধারে তো শুকনো মাঠ। আরও খানিকটা যাওয়ার পথে দূরে টিনের চালওয়ালা কয়েকটা বাড়ি দেখতে পেল সে। বাড়িগুলো ঘিরে রেখেছে অনেক গাছ। তারপরই চোখে পড়ল একটা টাঙা দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। ওটাই কি বাবা সদানন্দের আশ্রম! আশ্চর্য! এত জায়গা থাকতে এরকম উদ্ভট জায়গায় আশ্রম করলেন কেন বাবা সদানন্দ?

অনেকটা সময় যাওয়ার প'র আচমকা চোখ জুড়ানো জলরাশি ছবির মতো সামনে ভেসে উঠল। একে কি বিল বলে? পুকুর বা হ্রদের চেয়ে এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি। জল স্থির। তবে বাতাস ছোট ছোট ঢেউ তুলছে।

খানিকটা যাওয়ার পর মেয়েটি সাইকেল থামাল, 'এখানে নেমে যেতে হবে।'

'সুখাইচক?' সাইকেল থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল শিবশংকর।

'এইটে। ওই যে দ্বীপ দেখছেন ওটাই আপনার গন্তব্যস্থল।'

'কিন্তু কী করে যাব।'

সাইকেলটাকে স্ট্যান্ডের ওপর রেখে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে এগিয়ে ধরল মেয়েটি। দ্রুত মাথা নাড়ল শিবশংকর। একটা সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটি বলল, 'এখানেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। নৌকো দেখলে চেঁচিয়ে ডাকবেন, চলে আসবে। আবার দেখা হবে।'

'আপনি কি এখানে থাকেন?'

'মাস ছয়েক হল আছি। আরও মাইলখানেক দূরে আমার অফিস। আমি এখানকার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। আমি কুসুম ভার্গব।'

'ভার্গব?'

হাসল কুসুম, 'ইউপি-র ব্রাহ্মণের মেয়ে। বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন জামশেদপুর। আপনি?'

'শিবশংকর।'

'ওয়েল শিব, যখন একলা লাগবে আমার মোবাইলে ফোন করবেন। নাম্বার নিন।' তারপরে মাথা নাড়ল কুসুম, 'আপনার মোবাইলের নাম্বার বলুন। কল করলে নাম্বার পেয়ে যাবেন।'

মাথা নাড়ল শিবশংকর। 'আমার সঙ্গে মোবাইল নেই।'

'ওঃ। তা হলে চললাম। বাই শিব।' আধখাওয়া সিগারেট মাটিতে ফেলে জুতোয় নিভিয়ে সাইকেলে চড়ে চলে গেল কুসুম।

একজন বিডিও সাইকেলে ঘুরছে, ওর তো জিপে ঘোরার কথা। তাছাড়া ওইরকম অল্পবয়সি মেয়ে চাকরির জন্যে এখানে একা রয়েছে ভাবতেও অবাক লাগছে। তবে মেয়েটা খুব স্মার্ট তাতে সন্দেহ নেই।

আধঘণ্টা বাদে নৌকো দেখা গেল। তাকে ডাকাডাকি করে জল পেরিয়ে দ্বীপে পৌঁছল শিবশংকর। দ্বীপটি গাছগাছালিতে ভর্তি বলে ভিতরটা ওপার থেকে দেখা যায় না। ভিতরে এসে দু'টো ইটের দেওয়াল আর টিনের চাল-ওয়ালা বাড়ি দেখতে পেল সে। একটা বেশ লম্বা, দ্বিতীয়টা ছোট। পাণ্ডেজি বলেছিলেন এখানকার কেয়ারটেকারের নাম লছমন। সেই নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকার পরও কারও সাড়া পাওয়া গেল না। শিবশংকর দেখল ঘর দু'টোর দরজা ভেজানো। প্রথমে বড় ঘরটায় ঢুকল সে। ঘরের কোণে খাটিয়ায় বিছানা, পাশে রান্নার সরঞ্জাম এবং প্রচুর বস্তা পাহাড় হয়ে আছে। দ্বিতীয় ঘরটি পরিষ্কার সেখানেও খাটিয়াতে বিছানা পাতা, টেবিল চেয়ার এবং একটা বেশ বড় হ্যারিকেন ছাড়া টর্চ রাখা আছে। বাইরে বেরিয়ে এসে আবার লছমনের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে কিছুক্ষণ ডাকল সে।

লোকটা গেল কোথায়? পাণ্ডেজি বলেছিলেন লছমন এখানে পঁচিশ বছর ধরে আছে। কিন্তু বয়স এবং অসুস্থতার কারণে সে ভালভাবে কাজ করতে পারছে না। এটা যে একটা দ্বীপ তা পাণ্ডেজি বলেননি। বলেছিলেন, 'ওখানে প্রচুর গাছ আছে, আমেরই বেশি। মাস দু'য়েক পরে কয়েক কুইন্টাল আম পাওয়া যাবে। সেগুলো আধপাকা হতেই প্যাক করে রাখবেন। লছমনই দেখিয়ে দেবে। আমাদের লোক ট্রাক নিয়ে যাবে আনতে। চাষের জমি আছে। দু'টো ফসল হয়। যারা চাষ করে তারা প্রতিবছর ঠিক সময়ে এসে যায়। এবার তারা টাকা বাড়াতে বলেছে। কথাবার্তা বলে আমাদের জানালে আপনার কাছে টাকা পাঠিয়ে দেব। প্রচুর দামি গাছ আছে ওখানে। সেগুলো যাতে কেউ চুরি করে কেটে নিয়ে না যায় তা লক্ষ রাখতে হবে আপনাকে। আপনার মোবাইল আছে? নেই! ঠিক আছে, লছমনের মোবাইল ব্যবহার করবেন।'

সেই লছমনকেই পাওয়া যাচ্ছে না! দ্বীপটাকে ঘুরে দেখতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। বিশাল সম্পত্তি। এতক্ষণে খিদে পেয়ে গিয়েছে তার। সেই শেষরাতে জংশন স্টেশনে মুখ ধুয়ে এক কাপ চায়ের পর পেটে কিছু পড়েনি। লোকটাকে না পেলে কতক্ষণ অভুক্ত থাকতে হবে তা কে জানে। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে গিয়ে বস্তুটিকে দেখতে পেয়ে সজাগ হল শিবশংকর। বিলের জল খানিকটা খাল হয়ে জমিতে যেখানে ঢুকেছে তার কাছে যেটা পড়ে আছে সেটা যে মোবাইল ফোন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দ্রুত পৌঁছে সেটা তুলে নিয়ে দেখল ব্যাটারি ডাউন হয়ে গিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই লছমনের সম্পত্তি। কিন্তু এখানে পড়ে আছে কেন?

অসতর্ক অবস্থায় ওর পকেট থেকে পড়ে যাওয়ায় টের পায়নি! কিন্তু এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ করে কীভাবে? কয়েকবার বোতাম টেপার পরে যখন আলো জ্বলল না তখন মনে হল, যন্ত্রটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় লছমন ফেলে দেয়নি তো! সে জলের দিকে তাকাল। তখনই মনে হল লছমনকে কেউ মেরে ফেলেনি তো? মেরে এই বিলের জলে ফেলে দিলে ভেসে না ওঠা পর্যন্ত, তার খোঁজ পাওয়া দায়। বয়স্ক অসুস্থ মানুষকে মারতে কোনও সমস্যা নেই। সে জলের কাছে এগিয়ে গেল। না, কোনও চিহ্ন নেই।

দ্রুত বিলের সেই জায়গায় শিবশংকর চলে এল যেখানে সে নৌকা থেকে নেমেছিল। লছমনের নিরুদ্দেশের খবরটা পুলিশকে এবং পাণ্ডেজিকে জানানো দরকার। এখানে থানা কোথায়? তার মনে হল কুসুম ভার্গবের কাছে তার যাওয়া উচিত। বিডিও কিছু বললে থানা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। দূরে একটা নৌকো দেখতে পেয়ে সে হাত নেড়ে চিৎকার করতে লাগল। প্রথমে সেই চিৎকার উপেক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত কাছে চলে এল নৌকো। শিবশংকর তার বাজারি হিন্দিতে অনুরোধ করল ওপারে পৌঁছে দিতে। নৌকোয় দু'জন মানুষ, একজনকে দেখলেই বোঝা যায় মালিক শ্রেণির, অন্যজন কর্মচারী। যার হাতে বৈঠা। বৈঠাধারী বলল, 'আমাদের খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। আমরা আশ্রমে যাচ্ছি। সেখানে আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি।'

আশ্রমটা যেহেতু ওপারেই তাই নৌকোয় উঠে বসল শিবশংকর। মালিক ব্যক্তিটি চুপচাপ লক্ষ করছিলেন। এখন ডিবে থেকে পান বের করে মুখে পুরলেন। শিবশংকর দেখল নৌকোর খোলে প্রচুর উপঢৌকন রাখা আছে। সম্ভবত আশ্রমের জন্যেই।

দূর থেকেই কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ঘাটে নৌকো লাগতেই দু'জন লোক লম্বা তক্তা নিয়ে এল মালিক ব্যক্তিকে নামানোর জন্য। মোটাসোটা মানুষটির শরীরে প্রচুর গহনা। কোনওমতে তক্তা বেয়ে নীচে নামলেন তিনি। তাঁকে চোখের আড়ালে যেতে দিয়ে শিবশংকর দু'জনের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে থানা কোথায়?'

'থানা? বিশ মাইল দূরে। থানায় গিয়ে কী হবে? যদি কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তা হলে বাবার কাছে যান। এখানে বাবাই শেষ কথা।' লোকটা জানাল।

শব্দ অনুসরণ করে শিবশংকর যেখানে পৌঁছল সেখানে জনাষাটেক মানুষ বাবু হয়ে বসে আছেন। উল্টোদিকের বেদিতে যিনি বসে আছেন তাঁর মাথায় জটা, সাদা দাড়ি নাভি স্পর্শ করেছে। চট করে বয়স বোঝা মুশকিল। চমৎকার হিন্দিতে বাবা সদানন্দ বলছিলেন, 'তুমি যেভাবে জীবনযাপন করে সুখ পাও তা অনায়াসে করতে পারো। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে যদি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-

প্রতিবেশীদের দুঃখের কারণ হও তা হলে পরমাবতার তোমাকে স্নেহ করবেন না। তোমরা বলছ নতুন বিডিও মেয়েমানুষ হয়েও সিগারেট খায়, শার্ট-প্যান্ট পরে। সে যদি পুরুষ হত তা হলে কি তোমরা বিরক্ত হতে? হতে না। এখন দেখতে হবে নতুন বিডিও এলাকার মানুষের বিপদে আপদে কতটা সাহায্য করছেন! সরকার তাঁর ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা তিনি পালন করছেন কি না। তাতে যদি কোনও ফাঁকি না থাকে তা হলে প্যান্ট আর সিগারেট নিয়ে তোমরা কেন এত দুশ্চিন্তায় পড়েছ? নাগা সন্ন্যাসীরা কুম্ভমেলায় যোগ দিতে হিমালয় থেকে যখন নেমে আসেন তখন কি সরকার তাঁদের প্রকাশ্য স্থানে উলঙ্গ থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করেন? করেন না।' বলতে বলতে শিবশংকরের ওপর নজর যেতেই থেমে গেলেন বাবা সদানন্দ, 'পরমাবতার অনুগ্রহ করে আমাকে যে স্মরণশক্তি দিয়েছেন তাতে কাউকে একবার দেখলে আমি ভুলি না। তোমাকে নিশ্চয়ই আমি আগে দেখিনি।'

'না। আমি আজ সকালের ট্রেনে এসেছি।' শিবশংকর উত্তর দিল।

'ও হো! তা হলে তো তুমি নিশ্চয়ই এখন ক্ষুধার্ত। বিশ্রামের প্রয়োজন। বাবা যাদব, যাও, এই আগন্তুককে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো।'

'যথা আজ্ঞা বাবা।' একজন লোক এগিয়ে এল শিবশংকরের দিকে।

শিবশংকর দেখল বাবা সদানন্দ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছেন। সে মরিয়া হয়ে লছমনের ব্যাপারটা তাঁকে জানাল। চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেন বাবা সদানন্দ। তারপর হেসে বললেন, 'ভবিতব্য কে খণ্ডাবে? তার যদি যাওয়ার হয় তা হলে চলেই গেছে। কী বলো, কিষেণচাঁদ? সামনে বসা সেই ধনী মালিক, যাঁর নৌকোয় শিবশংকর এসেছিল, মাথা নাড়লেন সমর্থনে। যাদব শিবশংকরকে বলল, 'চলুন।'

ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে লোকটা তাকে ফল এবং পায়েস খেতে দিল। শিবশংকর জেনারেটরের শব্দ পেয়ে যাদবকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের কাছে মোবাইল চার্জার আছে?'

যন্ত্রটাকে দেখে হাসল যাদব, 'এটা তো লছমনের মোবাইল। দু'দিন অন্তর ও এখানে এসে চার্জ করিয়ে নিয়ে যেত। দিন, বসিয়ে দিচ্ছি।'

পেট ভরে গেল খেয়ে। এখন কী করা উচিত? বিশ মাইল হেঁটে থানায় যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। লছমনকে যে পাওয়া যাচ্ছে না এক দঙ্গল মানুষের সামনে বাবা সদানন্দকে সে জানিয়েছে কিন্তু তিনি একটুও গুরুত্ব দেননি। উল্টে তাঁর কথায় ওই কিষেণচাঁদ মাথা নেড়ে হেসেছে। ব্যাপারটা পাণ্ডেজিকে জানানো দরকার।

আধঘণ্টা পরে যাদব এসে মোবাইল ফেরত দিয়ে বলল, 'যা হয়েছে তাতে কথা বলা যাবে।'

বোতাম টিপতেই আলো জ্বলল। কিন্তু পাণ্ডেজির নাম্বার সে তো জানে না। সে বোতাম টিপে দেখল ওই মোবাইলে একটাই নাম্বার স্টোর করা আছে। সেই নাম্বার থেকে ফোন এসেছে এবং গিয়েছে। সেই নাম্বারটাই টিপল শিবশংকর। একটু পরেই রিং শুনতে পেল সে এবং তারপর গলা, 'হ্যালো। কী ব্যাপার? বাঙালিবাবু পৌঁছে গিয়েছে?'

গলাটা পাণ্ডেজির বুঝতে পেরে শিবশংকর বলল, 'আমি শিবশংকর। লছমনকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। ওর মোবাইল জলের ধারে পড়ে ছিল। কী করব?'

'সে কী! আপনি এক কাজ করুন, ওখানে একটা আশ্রম আছে। গিয়ে দেখুন সেখানে তাকে পান কি না! না পেলে থানায় খবর দিতে হবে।'

'আমি আশ্রম থেকে বলছি। এখানে লছমন নেই। আর থানা অনেক দূরে।'

'তা হল বিডিও অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করুন। খুব দরকার না থাকলে লছমন ওখান থেকে বের হয় না। আর যদি যায় সঙ্গে মোবাইল রাখে। কী হল জানাবেন।' লাইন কেটে দিলেন পাণ্ডেজি।

যাদব চুপচাপ শুনছিল। বলল, 'ওই বাগানের ওপর অনেকের লোভ আছে। লছমন বলেছিল ওকে নাকি ভয় দেখানো হচ্ছে। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।'

'আচ্ছা, এখান থেকে বিডিও অফিস কতদূরে?'

'এক মাইল হবে। বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা।' তারপর হাসল, 'কিষেণজির সঙ্গে আজই আলাপ?'

'আলাপ হয়নি। ওঁরা দয়া করে নৌকোয় তুলে নিলেন। উনি যে বাবা সদানন্দর শিষ্য তা বুঝতে পারলাম। খুব ধনী মানুষ?'

'খু-উ-ব। আর কিছু জানতে চাইবেন না ওঁর সম্পর্কে।'

'আমি এখন বিডিও অফিসে যাব। বাবা সদানন্দকে দয়া করে বলে দেবেন।'

যাদব ঘাড় নাড়ল।

বলেছিল এক মাইল, বিডিওর অফিসে পৌঁছতে যে সময় লাগল তাতে শিবশংকরের মনে হল অন্তত আড়াই কিলোমিটার সে হেঁটেছে। তা হলে থানায় যেতে হলে যা বলেছিল তার ডবল পথ হাঁটতে হত।

এখন ভরদুপুর। দুটো অফিসঘর। একটাতে কয়েকজন কর্মচারী গুলতানি করছে। বিডিও মেমসাহেবের খোঁজ করতে তারা প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগল কী দরকার, সমস্যা কী? একজন বলল, বিডিও মেমসাহেবের ভীষণ রাগ, তাঁর কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তারাই তাকে সাহায্য করতে পারে।

শিবশংকর বুঝতে পারল এরা বেশ লোভী মানুষ। সে বলল, 'উনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গেল লোকগুলো। পিওন গোছের একজন লোক বলল, 'ওই বাড়িতে ওঁকে পাবেন। যান।'

দরজা ভেজানো ছিল, শব্দ করতে কুসুম বেরিয়ে এল, 'এ কী! আপনি?'

দ্রুত কথাগুলো বলল শিবশংকর।

'আপনার কি মনে হচ্ছে লোকটা খুন হয়েছে?'

'আমি জানি না। কোথাও গেলে মোবাইল মাটিতে ফেলে যাবে কেন?'

কুসুম একটু ভাবল। তারপর ভিতরে চলে গেল। ওর পরনে একটা লুঙ্গি এবং ফুলহাতা জামা। বোধহয় এখন ওর বিশ্রামের সময়।

কয়েক মিনিট পরে সে বেরিয়ে এল সকালের পোশাকে। বারান্দা থেকে হাত নেড়ে বেয়ারাকে কাছে ডেকে বলল, 'আমি একটা এনক্যুয়ারিতে যাচ্ছি। কোনও প্রব্লেম হলে ফোন করবে।' তারপর শিবশংকরকে বলল, 'আসুন।'

যে পথ দিয়ে শিবশংকর এসেছিল সেই পথ না ধরে পেছনে একটা পথে হাঁটতে লাগল কুসুম। মেয়েটা বেশ লম্বা। পাঁচ ফুট সাত তো বটেই।

সে যে ওর চেয়ে চার ইঞ্চি বড় তা এখন মনে হচ্ছে না। লম্বা পা ফেলে হাঁটছে সে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে। মিনিট দশেক যাওয়ার পর সেই বিলটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। একটা নৌকো বাঁধা আছে ঘাটে। কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'নৌকো বাইতে পারেন?'

'কখনও করিনি।'

দু'জনে নৌকোয় ওঠার পর কুসুম দাঁড় হাতে নিয়ে বাইতে বাইতে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কী কী করেননি?'

কী জবাব দেবে বুঝতে পারল না শিবশংকর।

'কাউকে খুন করেছেন কখনও? করেননি। ড্রাগ বা গাঁজা খেয়েছেন? খাননি? হুইস্কি বা ভদকা? তাও না। বাঃ।'

নৌকো চালাতে লাগল কুসুম। শিবশংকর বুঝতে পারছিল না ওকে। খুনের কথা কেন জিজ্ঞাসা করল? ও কি ভাবছে সে লছমনকে খুন করেছে? শিরশিরিয়ে উঠল মেরুদণ্ড।

'আপনি বিয়ে করেছেন?' আচমকা প্রশ্ন এল।

'না।' দ্রুত মাথা নাড়ল শিবশংকর।

'প্রেম? প্রেম করেছেন?'

একটু কুঁকড়ে গেল শিবশংকর, মাথা নেড়েই নিঃশব্দে না বলল।

'সাবাস। সাঁতার কাটতে পারেন?'

'না, মানে শেখা হয়নি।'

'ও। তা হলে যদি এখন নৌকোটাকে উল্টে দিই তা হলে আপনি কী করবেন?'

'ডুবে যাব। মরে যাব, যদি আপনি না বাঁচান।'

হাসল কুসুম। আর কিছু বলল না।

এখন সূর্য পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছে। জলের ওপর চমৎকার বাতাস বইছে। বসন্ত ঋতুতে আকাশ যেমন হয় ঠিক সেইরকম। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে নৌকো ভিড়ল দ্বীপে। কুসুম বিরক্ত মুখে বলল, 'ওদের বলেছিলাম নৌকোয় ফুটো সারাতে, যেমন ছিল তেমনই রেখে দিয়েছে। ফেরার সময় জল বের করে ফেলতে হবে।' শিবশংকর দেখল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঢুকেছে নৌকোর খোলে।

এখন দ্বীপে গাছের ছায়া। কুসুমকে নিয়ে গোটা দ্বীপ ঘুরতে হল শিবশংকরকে। যেখানে মোবাইল পড়েছিল সেই জায়গাটা দেখাল সে। কুসুম খুঁটিয়ে দেখল। ঘাসের ওপর কাউকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। নদীর গায়ের মাটি ভাঙা থাকা, তা নেই। রক্তেরও দাগ নেই। কুসুম বলল, 'লোকটাকে এখানে খুন করা হয়নি। ঠিক আছে, আমি থানায় ব্যাপারটা জানিয়ে দেব। কিন্তু আপনি এখানে একা থাকতে পারবেন? খাওয়াদাওয়া করতে তো হবে।' সে সিগারেট ধরাল।

'আমি বুঝতে পারছি না কী করব।' বিড়বিড় করল শিবশংকর।

ওরা ফিরে এল দ্বীপের ওদিকে। তখনই দেখা গেল নৌকোটাকে। যার একদিকে আয়েস করে বসে আছেন কিষেণচাঁদ। কর্মচারীটি নৌকো বাইছে। মাঝখানে বসে আছে ঘোমটা মুখ ঢাকা সেই স্বাস্থ্যবতী মহিলা। আর এপাশে বসে বৃদ্ধ মুখ তুলে আকাশ দেখছেন। কুসুম বলল, 'সোয়াইন!'

'আপনি কিষেণচাঁদজিকে চেনেন?' শিবশংকর অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'হাড়ে হাড়ে। আমাকে একলা থাকতে দেখে ভেবেছিল, যাক গে! আপনি ওকে চিনলেন কী করে? এই তো সবে এসেছেন।' কুসুম তাকাল।

'বাবা সদানন্দর আশ্রমে দেখা হয়েছিল। ওই যে মহিলা এবং বৃদ্ধ, ওঁর সঙ্গে যাচ্ছেন, ওঁরা আমার সঙ্গে একই ট্রেনে এসেছিলেন।'

'তাই বলুন। এর জন্য কিষেণচাঁদ বাবা সদানন্দর আশ্রমে অনেক টাকা প্রণামী দিয়েছে। ওই বুড়ো বছর খানেক পরে বউ-বাচ্চা নিয়ে এসে বাবা সদানন্দকে পুজো দিয়ে যাবে টাকা গহনা দিয়ে।' কুসুম বলল।

'ওদের সঙ্গে বাচ্চা নেই তো!'

'এখন নেই। এক বছরের মধ্যে হয়ে যাবে। কিষেণচাঁদের সেই খ্যাতি আছে।' কুসুম বলল, 'আপনি তা হলে এখানে থাকুন, আমি চলি।'

'আপনি চলে যাবেন?' কাতর গলায় বলে ফেলল শিবশংকর।

'না গিয়ে কী করব?'

'না, ঠিক আছে।'

'আপনি কখনও হ্যাঁ বলতে শেখেননি, না? 'হাসতে হাসতে বলে একটা গাছের দিকে তাকাল কুসুম, 'এই গাছটাকে এখানে রেখেছে এরা?'

শিবশংকর গাছটাকে দেখল। কুসুম জিজ্ঞাসা করল, 'এই গাছটাকে চেনেন?'

মাথা নেড়ে শিবশংকর বলল, 'হ্যাঁ।'

'চেনেন? পশ্চিমবাংলায় এই গাছ হয়? কী নাম বলুন তো?'

'কুদমা। ওই সুন্দর লাল ফুলগুলো খুব বিষাক্ত।' বলল শিবশংকর।

'বিষাক্ত?'

'হ্যাঁ, লোকে আত্মহত্যা করতে চাইলে ওই ফুল গোটাকয়েক খেয়ে নেয়।'

'অ্যাঁ? এ সব তথ্য কোথায় পেলেন?' চোখ বড় হয়ে গেল কুসুমের।

'কিষেণচাঁদজির নৌকোয় যে বৃদ্ধ বসে ছিলেন তিনি স্টেশনের বাইরে এসে এই গাছ দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন। রস লাগলে হাতে ঘা হয়ে যাবে।'

কুসুম এগিয়ে গিয়ে গাছের নীচে পড়ে থাকা একটা ফুল তুলে বলল, 'কথাটা সত্যি, এখানে এই ফুলকে কুদমা বলা হয়। কুদমা শব্দটার আর একটা মানে আছে। যে মেয়ের বিয়ের পরে বাচ্চা হয় না তাকে এরা কুদমা বলে। শুভকাজে তাদের ডাকা হয় না।'

'সে কী!'

'ওই বৃদ্ধ আপনাকে বিভ্রান্ত করেছেন। যে জন্য এখানে এসেছেন তা তাঁকে শান্তি দিচ্ছে না হয়তো তাই যা সুন্দর তাকেই বিষাক্ত বলছেন।' ফুলের পাপড়ি মুখে দিল কুসুম। চিবিয়ে বলল, 'বেশ মিষ্টি স্বাদ! এখানকার যারা খুব গরিব মানুষ তারা বসন্তকালে এই ফুল খেয়ে বেঁচে থাকে। খেয়ে দেখুন!' একটা পাপড়ি এগিয়ে ধরল কুসুম।

একবার চিবিয়েই বৃদ্ধের ওপর তার রাগ হল। এত বড় মিথ্যে বলল লোকটা। কুসুম বলল, 'আমি যাচ্ছি। আজ রাত্রে কিছু করার নেই। কাল দেখা যাবে।'

সে নৌকো থেকে জল বের করে উঠে বসল, 'কেমন লাগল কুদমা?'

'বেশ মিষ্টি।'

'কুদমা একটি কুসুম। কুসুম আবার আমারও নাম।'

সেই সময় লছমনের মোবাইল বেজে উঠল। দ্রুত কানে চেপে হ্যালো বলতেই শিবশংকর পাণ্ডেজির গলা শুনতে পেল, 'লছমনকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই। ও খুব অসুস্থ বলে পাটনায় চলে গিয়েছে। মোবাইলের ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাওয়ায় কথা বলতে পারেনি। রাগে ছুড়ে ফেলেছিল ওখানে।'

'ও।'

'আপনার থাকার একটু অসুবিধে হলেও লছমন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত মানিয়ে নিন। রাখছি।'

কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল কুসুম। শিবশংকর হাসিমুখে বলল ঘটনাটা। কুসুম বলল, 'থ্যাঙ্ক গড। এখানে আপনাকে ভূতের ভয় পেতে হবে না আবার পুলিশকে বলে ঝামেলায় জড়াতে হবে না। বাঃ, দেখছেন।'

শিবশংকর দেখল আকাশের কোণে আধুলির মতো চাঁদ লাফিয়ে উঠে বসল। চাঁদের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে কুসুমের দিকে তাকাতে সে দেখল ছিপছিপে লম্বা মেয়েটা নিঃশব্দে নৌকো বেয়ে চলে যাচ্ছে নদীর ওপারে। হঠাৎ মন ভাল হয়ে গেল শিবশংকরের। খু-উ-ব ভাল।

মোমবাতির দু'দিক

এক বছর আগে স্বামীকে সুস্থ করে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল সোহাগ। মাত্র দিন দশেক হাসপাতালে ছিল অবনী। এই দশ দিন ঝড় বললে কম হয়, মনে পড়লে শরীর হিম হয়ে যায় এখনও। কলকাতার সেই হাসপাতালে ঈশ্বরের একজন পুত্র আছেন। সে সময় সোহাগের এমনই মনে হয়েছিল। কারণ যে মানুষটা আর বাঁচবে না বলে চেনাজানা ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন রায় দিয়েছিল, তাকে উনি বাঁচিয়ে দিলেন।

অবনী স্কুলে পড়ায়। একদিন পড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সবাই ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে আসে। ধুম জ্বর চলে কিছুদিন। পাড়ার ডাক্তার জ্বর কমাতে না পেরে রক্ত পরীক্ষা করতে বললেন। পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল অবনীর রক্তে ক্যানসার হয়েছে। কান্নাকাটি সামলে সোহাগ ছুটেছিল কলকাতার হাসপাতালে। অবনীর বন্ধু সতীশ সেই সময় অনেক করেছে। এ-ডাক্তার, সে-ডাক্তার, সোহাগ তো কিছুই চিনত না। সতীশই ঘুরে ঘুরে সন্ধান নিয়েছে। যে শুনেছে সে-ই বলেছে এই কেসে কিছু করার নেই।

সতীশ বন্ধু বটে কিন্তু বেশি মাখামাখি পছন্দ করত না অবনী। চল্লিশ পেরিয়েও বিয়ে-থা করেনি। রাতে একা একা মদ খায়। এমন লোক বাড়িতে যত কম আসে, তত ভালো। বাইরের বন্ধুত্ব বাইরেই রাখতে চেয়েছিল সে। কিন্তু অবনীর অসুখ হতে সতীশই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সোহাগ আর তার ছেলে নবীনকে বলল, ভয় নেই, চেষ্টার শেষ দেখব।

লোকটা সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল, কিন্তু সেটা কাটতে সময় লাগল না। ওই সতীশই পার্ক স্ট্রিটের হাসপাতালের খবর আনল। সেখানে এই রোগের চিকিৎসা হয়। তিনজনে মিলে অনেক কষ্টে অবনীকে নিয়ে পৌঁছে গেল এক সকালে। টিকিট করে দোতলায় উঠতেই মনে হয়েছিল কোনও নার্সিং হোমে এসেছে। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে তখন বেজায় ভিড়। সবাই একসঙ্গে নিজেদের অসুখের কথা বলছে। সুদর্শন বৃদ্ধ ডাক্তার হাসিমুখে সব শুনছেন, জবাব দিচ্ছেন। অবনী ভর্তি হতে গিয়েছিল এক শর্তে। কেনা রক্ত আনা চলবে না, নিজেদের রক্ত দিতে হবে আত্মীয়কে বাঁচাতে। তাতে টান থাকবে প্রাণের। দশ দিন রোজ দু'বেলা সোহাগ

গিয়েছিল সতীশের সঙ্গে হাসপাতালে। একটু একটু করে ডাক্তারবাবু আশার কথা বলেছিলেন। জ্বর কমে গেলে সতীশের হাত জড়িয়ে অবনী বলেছেন, আমাকে বাঁচাও সতীশ, আমি বাঁচতে চাই। সতীশ কথা দিয়েছিল। সে চেষ্টা করবেই। দশ দিনে আট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। দু'হাজার ঘরে ছিল, বাকিটা সতীশ দিয়েছিল। ওই দশ দিনে একই সঙ্গে অবনীর জন্য আশঙ্কা আর সতীশ সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে গেল সোহাগের। কোনও কোনও দিন প্রয়োজনে দুপুরে থাকতে হয়েছিল হাসপাতালে। তখন সতীশ তাকে খেতে নিয়ে গিয়েছে পার্ক স্ট্রিটের চিনে দোকানে। কোনও দিন ওসব অভিজ্ঞতা ছিল না সোহাগের। সতীশ খুব গম্ভীর মুখে বসে থাকত, সঙ্গে হাঁটত। কোনওরকম তরল কথা বলত না। শেষ পর্যন্ত সোহাগ বলেছিল, 'আপনার অনেক টাকা বন্ধুর জন্য খরচ হচ্ছে, তার ওপর এসব—।' সতীশ জবাব দেয়নি। সোহাগ আবার বলেছিল, 'আমার ভালো লাগছে। আজকাল খুব কম ভালো লাগে, লাগে না বললেই হয়। এটুকু থেকে বঞ্চিত করবেন?'

'আপনি বিয়ে-থা করেননি কেন?'

'করা হয়নি। তাছাড়া করে ফেললে সে কি রোজ আপনার সঙ্গে আসতে দিত?'

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছিল সোহাগের। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাও সত্যি। মুখ নামিয়ে নিয়েছিল সে। খাবার গলায় আটকে যাচ্ছিল কিন্তু সতীশ আর কথা বাড়ায়নি। শুধু কথা নয়, ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়নি তার।

বাড়িতে ফিরে বারো বছরের নবনীকে অকারণে জড়িয়ে ধরেছিল সোহাগ। এমন আদরে ইদানীং অভ্যস্ত নয় অবনী। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা কি বাঁচবে না মা?'

চমকে সোজা হয়ে সোহাগ জবাব দিয়েছিল, 'না, না। ডাক্তারবাবু বলেছেন তোর বাবার শরীরে ওষুধ ভালো কাজ করছে। বেঁচে যাবেই।'

'সতীশকাকুর জন্যে বাবা বেঁচে যাবে, না?'

'ভগবানের জন্যে রে। তিনি সব করেন।'

দশ দিন পরে ডাক্তার অবনীকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে প্রতি মাসে একবার করে এখানে নিয়ে আসবে। আমি পরীক্ষা করব। এই চিকিৎসা তিন বছর ধরে চলবে। যে ওষুধগুলো লিখে দিয়েছি, তা নিয়ম করে খাওয়াবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, যেন তিনি দয়া করেন।'

বাড়িতে এসে খাওয়াদাওয়া ইত্যাদিতে বেশ তাজা হয়ে উঠল অবনী। কাজে যোগ দিল। যারা বলেছিল বাঁচবে না তারা এবার বলল নিশ্চয়ই ব্লাড ক্যানসার হয়নি, অন্য কিছু হয়েছিল। প্রথম মাসে কলকাতায় ওকে এনে দেখিয়ে গেল সতীশ। ডাক্তার উন্নতি দেখে খুব খুশি।

সতীশ বাড়িতে রোজ আসছে, সোহাগের সঙ্গে কথা বলছে এটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না অবনীর। সতীশের কাছে ধার হয়ে গিয়েছে অত টাকা, এটাও ভালো লাগছিল না। সে সতীশকে ডেকে একদিন বলল, 'তোমার টাকা কীভাবে শোধ করব—!'

'আমি তোমাকে শোধ করতে বলেছি? নিজের পরিবারের জন্যে লোকে কি করে না? আমাকে যদি বাইরের লোক বলে মনে করো, তা হলে অন্য কথা।'

হঠাৎ এক ধরনের স্বস্তি হল অবনীর। মনে যা-ই থাক, সে মুখে কিছু বলল না। যতই তাজা ভাব দেখাক, ভেতর ভেতরে সে বোঝে আগের মতো নেই শরীরটা। ডাক্তার যেসব নিষেধ করেছেন তার মধ্যে একটি হল যৌনসম্পর্ক করা। এ ব্যাপারে অসুখের আগেই আগ্রহ কমে গিয়েছিল। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। সোহাগকে যেহেতু স্পর্শ করতে হচ্ছে না, তাই সতীশ যদি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে, খুশি থাকে, তাতে আর আপত্তি করার কিছু নেই।

দ্বিতীয় মাসে অবনীকে তাড়া দিল সোহাগ কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসতে। সতীশ সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু যাওয়ার দিন সে খবর পাঠাল তার জ্বর হয়েছে। উঠতে পারছে না। অবনী তাকে দেখে এসে বলল, 'নিজেই যাব। এখন তো আর চলাফেরার কোনও অসুবিধে নেই।'

অবনী চলে গেল। নবনী স্কুলে। সোহাগের মন ছটফট করছিল। লোকটা অসুস্থ হয়েছে অথচ অবনী দেখে এসে বলল না কেমন আছে। মানুষটা তাদের জন্য এত করল আর তার অসুখের সময় চুপ করে থাকবে। হঠাৎ মনে হল অবনীর অসুখের সময় যেতে যেতে উদ্বেগ কমে গিয়ে এক ধরনের ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল। সেইটে আর নেই। দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। সতীশের বাড়ি বেশি দূরে নয়।

একটা বুড়ো চাকর নিয়ে সতীশ থাকে। চাকরটিকে সে চিনত। প্রয়োজনে সতীশ অনেকবার ওকে বাড়িতে পাঠিয়েছে।

চাকর বলল, 'বাবুর খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকতে দিচ্ছেন না। আপনি একটু চলুন।'

সতীশ শুয়ে ছিল বিছানায়। চোখ বন্ধ। পায়ের শব্দেও চোখ খুলল না। কপালে হাত রেখে সোহাগ দেখল পুড়ে যাচ্ছে। চাকরকে বলে আর ন্যাকড়া এনে জলপটির ব্যবস্থা করল। মাথার পাশে বসে জলপটি দিতে লাগল। সতীশ কালো চোখ মেলে হাসল। সোহাগ জিজ্ঞেস করল, 'বাধালেন কী করে?'

'ঠাণ্ডা লেগে। কিছু না। সেরে গেলে ভালো হয়ে যাব।' তারপর হাসল, 'এখন আমার জ্বর কমে যাবে।'

একটু কাঁপুনি এল যেন শরীরে। সোহাগ ঠোঁট কামড়াল। বুড়ো চাকর ডাক্তার ডেকে আনল। তিনি ওষুধ দিলেন। এরকম জ্বর আজকাল খুব হচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। তবে মাথা ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে হবে।

ডাক্তার চলে গেল। বুড়ো চাকর গেল ওষুধ আনতে। আর ওসব কাজ নিজের হাতে করল সোহাগ।

ঠিক এই সময়ে এ বাড়িতে এল অবনী। এসে দৃশ্যটা দেখেও রাগ করল না। বলল, 'বাড়িতে ফিরে বুঝলাম তুমি এখানে এসেছ, তা কেমন আছে ও এখন?'

'জ্বর আছে।'

'বেচারা। ভাগ্যিস তুমি এসেছ।' কিছুক্ষণ বসে রইল অবনী। সে আসার পর থেকে সোহাগ আবিষ্কার করল তার মধ্যে আড়ষ্টতা এসেছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। সতীশ ওই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতায় গিয়েছিলে?'

অবনী জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'ডাক্তার কী বলল?'

'উন্নতি হচ্ছে।'

'বাঃ, খুব ভালো খবর!' সতীশ হাসল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হঠাৎ সোহাগকে জড়িয়ে চুমু খেল অবনী। পাশের ঘরে নবনী শোয়। তার দরজা আলাদা। সোহাগ বলল, 'শুয়ে পড়ো।'

অবনী শুনল না। মরিয়া হয়ে সে তার স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠা করল। অনেক বাধা দিয়েছিল সোহাগ। ডাক্তারের নিষেধের কথা বলেছিল। অবনী জানিয়েছিল,আজ নাকি সে ডাক্তারের অনুমতি পেয়েছে। পেতে পারে, কিন্তু সোহাগের মনে হয়েছিল অসুস্থ সতীশকে সেবা করতে দেখার পর এই কাণ্ড করল অবনী। মন তেতো হয়ে গেল সোহাগের। আর সেই সঙ্গে অবনীর ওপর রাগ।

পরদিন সে ইচ্ছে করেই গেল না সতীশকে দেখতে। অবনী বিকেলে জিজ্ঞাসা করল, 'সতীশকে দেখতে যাওনি?'

জবাব দিল না সোহাগ। সেদিন রাতে অবনী তাকে স্পর্শ করল না। পরের দিন সতীশ নিজেই এল। রুগ্ণ শরীর নিয়ে তাকে আসতে দেখে রাগ করল সোহাগ। সতীশ হাসল, চা খেল, তারপর রিকশায় বাড়ি ফিরে গেল। সেই রাতে আবার জোর-জবরদস্তি। কোনওমতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ফোঁস করে উঠল সোহাগ, 'তুমি কী চাও? সতীশবাবু এ বাড়িতে না আসুক?'

'হঠাৎ সতীশের কথা?'

'তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?'

'করি। তাই রোজ মনে করিয়ে দিতে চাই আমি তোমার স্বামী।'

ঘেন্নায় কথা বলতে ইচ্ছে করল না সোহাগের।

বাক্যালাপ বন্ধ। সতীশ নিয়মিত আসে। তার সঙ্গে কথা বলে অবনী। কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রাখে সোহাগ। যতটা সম্ভব। অবনী সম্পর্কে সে নিস্পৃহ হয়ে পড়ল। সতীশ এসে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে। তখন কথা বলতেই হয়। আর মনে মনে শঙ্কিত হয় রাতে আক্রমণ হবে। কিন্তু ইদানীং অবনীর প্রায়ই জ্বর হচ্ছে। মাথা ঘোরে। অবনীকে ডাক্তার দেখানোর কথা বললে সে জানায় কলকাতার ডাক্তারবাবু বলেছে উন্নতি হচ্ছে, এটা নেহাতই সাধারণ জ্বর।

সতীশের সঙ্গে সোহাগ কথা বলে না লক্ষ করেছে অবনী। এই নিয়ে সে রাগারাগি করে। আর এইটে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে সোহাগকে। তার মনে হয় অবনী তাকে ব্যবহার করতে চাইছে। একদিন এক জোড়া সোনার বালা বিক্রি করে জমিয়ে রাখল সে। সতীশ এলে ধারটা শোধ করবে। তার মুখের ওপর বলে দেবে আর এ বাড়িতে না আসতে। বলে দেবে অবনীর মনের কথা।

কিন্তু সেই দুপুরেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল অবনী। সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু বলছে, মরে-যাব, মরে যাব। নবনীকে স্কুল থেকে ডাকিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গে অবনীকে রিকশায় তুলে কলকাতার ট্রেন ধরতে ছুটল সোহাগ। যাওয়ার সময় সতীশের জন্যে রাখা টাকাটা নিতে ভুলল না।

কোনওভাবে অবনীকে হাসপাতালে এনে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ছুটে গেল সোহাগ। ওই অসময়ে ডাক্তারবাবু রক্তের স্লাইড দেখছিলেন। চমকে উঠলেন কান্না শুনে, 'আমার স্বামীকে বাঁচান ডাক্তারবাবু?'

'তোমার স্বামী? কী হয়েছে তার?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু। এক বছর আগে ওঁকে নিয়ে এসেছিলাম। অবনী, অবনী দত্ত, ব্লাড-ক্যানসার পেশেণ্ট।'

'ওঃ গড! এতদিন কোথায় ছিলে?'

'এতদিন আমি আসিনি, ও তো এসেছিল প্রতি মাসে।'

'মিথ্যে কথা। একবার এসেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে। আর আসেনি।'

চমকে গেল সোহাগ, 'কী বলছেন! ও প্রতি মাসে আপনার কাছ থেকে ঘুরে গিয়ে বলত উন্নতি হচ্ছে।'

'তোমার স্বামী গত এগারো মাস আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আমি পইপই করে বলে দিয়েছিলাম প্রতি মাসে চেক না করলে আমি বাঁচাতে পারব না। নিশ্চয় স্বামীর প্রতি তুমি কেয়ারলেস। আমি কিছুই করতে পারব না।'

'আপনার কাছে ও আসেনি?' বিস্ময় তখনও কাটছিল না। 'আপনি সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেননি?'

'কোন্ নিষেধাজ্ঞা? তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।'

ডুকরে কেঁদে উঠল সোহাগ। এই কান্নার অর্থ ভুল বুঝলেন ডাক্তারবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় সে?'

'নীচে।' কাঁদতে কাঁদতে সোহাগ বলল, 'আজ দুপুরে আবার ওইরকম হয়েছে, আপনি ওকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। ওকে ভর্তি করে নিন।'

'আজ কোনও বেড খালি নেই। অসম্ভব। কাল নিয়ে এসো।'

'ওকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।' সোহাগ কাঁদছিল।

ডাক্তারবাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'কে ব্লাড দেবে? আমি ফ্রেশ ব্লাড নেব। কেনা ব্লাডে কাজ চলবে না।'

'আমি দেব। আমার ছেলে দেবে।'

'তোমাদের গ্রুপ কী?'

'তা তো জানি না।'

ডাক্তার নির্দেশ দিলেন ব্লাড ব্যাঙ্ক এদের রক্ত পরীক্ষা করতে। তারপর ছুটলেন পেশেন্টকে ভর্তি করতে। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল অবনীর সঙ্গে মা বা ছেলের রক্তের গ্রুপ মিলছে না। ডাক্তার আবার এলেন। এসে রাগত গলায় বললেন, 'তোমরা লোকটাকে প্রায় মেরে ফেলেছ। এক বছর এই রোগে চিকিৎসা ছাড়া থাকা মানে মরে যাওয়া। তোমরা আপাতত রক্ত দাও, আমি অন্য ডোনারের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করিয়ে দিচ্ছি। দেখি কী হয়!'

রক্ত দেওয়া হয়ে গেলে বসে ছিল ওরা ডাক্তারবাবুর প্রতীক্ষায়। নবনী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বাবা মরে যাবে না তো?'

'কেউ যদি আহত্মহত্যা করে তা হলে আমরা কী করব বাবা!'

'বাবা আত্মহত্যা করেছে?'

সোহাগ জবাব দিল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল! হঠাৎ নবনী উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'মা, সতীশকাকু!'

চমকে মুখ তুলল সোহাগ। হন্তদন্ত সতীশ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'অবনী কোথায়? কেমন আছে এখন?'

নবনী জবাব দিল, 'ডাক্তারবাবু বাবাকে স্ট্রেচারে করে ওপরে নিয়ে গেছে। আমরা রক্ত দিয়েছি কিন্তু রক্তের গ্রুপ মেলেনি।'

'সে কী! ঠিক আছে, তোমরা বোসো। আমি যাচ্ছি, অবনীর আর আমার রক্তের গ্রুপ এক। কোনও চিন্তা করতে হবে না।'

ব্লাড ব্যাঙ্কের দিকে চলে গেল সতীশ প্রায় দৌড়ে।

নবনীর হাত আঁকড়ে বসে ছিল সোহাগ। এবার ফিসফিস করে সে নবনীকে বলল, 'শোন!'

নবনী বলল, 'কী?'

সোহাগ আরও স্বর নামাল, 'আমি যে অত টাকা সঙ্গে এনেছি কাউকে বলার দরকার নেই। কেউ যেন না জানে।'

সুখ

শিবেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'বুঝলাম না।'

'না বোঝার তো কিছু নেই। তুমি নাকি দু'জনকে স্কুলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছ! আমি কিন্তু চাকরি করে তোমাদের সংসারে টাকা ঢালতে পারব না।'

নতুন বউয়ের নাম বেলা। মুহূর্তে মাথায় রক্ত উঠে গেলেও শিবেন্দু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'এই বাড়িতে দাদা বউ এনেছেন, টাকা রোজগার করার মেশিন আনেননি।'

বেলা মাথা নেড়েছিল, 'তা হলে আমার বলার কিছু নেই।'

গরম হয়ে যাওয়া মাথা সে-রাতে ঠাণ্ডা হচ্ছিল না। শিবেন্দু দেখেন তার নতুন বউ দিব্যি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোবার আগে বাবু হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করল। তারপর দু'টো হাত কপালে ঠেকিয়ে বালিশে মাথা রাখল।

বিয়ে করার বাসনা ছিল না শিবেন্দুর। তার রোগা শরীরটায় বয়স বাড়ছিল কিন্তু সে তার গ্রামের স্কুল নিয়ে এত ব্যস্ত যে শরীরের কোনও চাহিদা যেমন অনুভব করেনি তেমনই একাকিত্ব বোধ করেনি। প্রাথমিক স্কুলটাকে মাধ্যমিকে রূপান্তরিত করতে তিরিশের কোটা ছাড়িয়েছে বয়স। কিন্তু দাদা-বউদি দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর কৃষ্ণনগরের এই মেয়েটিকে তার কাঁধে চাপাতে পেরেছে। ফুলশয্যার রাতটা তাই এল আর গেল।

দু'দিনের বেশি কামাই করা কোনওমতে চলবে না বলে নতুন বউ বেলাকে দাদা-বউদির কাছে রেখে কর্মস্থলে চলে গেল শিবেন্দু। পশ্চিমবাংলার প্রায় অজ পাড়াগাঁয়ের নদীর পাশে স্কুল। সেখানেই তার দুই ঘরের বাড়ি। মাস্টারমশাইদের মিষ্টি খাওয়াতে হল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল নতুন বউকে?'

জবাবে হেসেছিল শিবেন্দু, উত্তর দেয়নি।

দশদিনের মাথায় দাদা এলেন বেলাকে অষ্টমঙ্গলা করিয়ে। বললেন 'তুই একা থাকতে পারিস, বউমা বিয়ের পর একা থাকবে কেন?' দাদা ফিরে গেলেন। দু'টো ঘর আর নদী দেখল বেলা, তারপর লিস্ট বানাতে বসল। তোমার বাড়িতে এটা নেই, ওটা নেই, এভাবে কি থাকা যায়? ম্যাগো! লিস্ট দেখল শিবেন্দু। তাতে সংসারের নানান কিছুর সঙ্গে রয়েছে, একটা বড় মজবুত ঠাকুরের আসন।

শিবেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী হবে?' 'আমার গোপাল থাকবে। ওর জন্যে দরকার।'

'গোপাল? তাকে কোথায় পাবে?'

গর্বিত হাসি হাসল বেলা, 'আমি সঙ্গে এনেছি। এখন ঘুমোচ্ছে।'

আবার মাথা গরম হয়ে উঠল। কিন্তু লিস্ট নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল শিবেন্দু। লোক পাঠিয়ে গঞ্জ থেকে যা যা চেয়েছিল বেলা, আনিয়ে দিল। সেই রাত্রে খেতে বসে শিবেন্দুর মনে হল মানুষের সব কিছু একদম খারাপ হয় না, একটু ভালও থাকে। বেলার একমাত্র প্লাস পয়েন্ট, রান্নার হাত বেশ ভাল।

গোপালের আসন থেকে যখন উঠে এসে বিছানায় বেলা দেহ রাখল, তখন রাত সাড়ে এগারোটা। পাড়াগাঁয়ে এটা অনেক রাত। তবু চেষ্টা করে জেগে ছিল শিবেন্দু। বউ পাশে শোয়ার পর তার মন ভাল হল কিন্তু কেমন কাহিল লাগছিল শরীরটা। সে পাশ ফিরে কাঁধে হাত রাখতেই বেলা চিত হল, 'জানো, এখানে এসে গোপাল খুব খুশি হয়েছে। খোলা মাঠে খুব খেলে বেড়াতে পারবে।'

'গোপাল, মানে, ওই মাটির পুতুল খেলে বেড়াবে?'

'এম্মা? ছিঃ। আমি যা বলি তা ও শোনে। বাপের বাড়িতে আমার আর একটা নাম ছিল। বলো তো কী?' বলেই হাসল বেলা, 'গোপালের মা।'

শিবেন্দু নিজেকে বলল, 'শান্ত থাকো, নো মোর রাগ।' তারপর বেলার শরীরটাকে কাছে টানতে চাইল—

বেলা বলল, 'এ কী! তুমি ওইসব করবে না কি?'

'কী সব?' হাসল শিবেন্দু।

'আমি জানি। বান্ধবীরা বলেছে। আমি তোমাকে ওইরকম লোক ভাবতেই পারি না যারা অচেনা মেয়ের জামাকাপড় খুলে আনন্দ পায়। তাছাড়া এখানে যদি তোমার দাদা বা দাদার ছেলে থাকত তা হলে কি তুমি এরকম করতে? বলো।' বেলা বলল।

'এখানে তো কেউ নেই।'

'বাঃ। ওই দ্যাখো, গোপাল বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।' ছেলের সামনে মা-কে লজ্জায় ফেলবে তুমি? ছিঃ।' বেলা দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'তা হলে পাশের ঘরে চলো!'

'পাগল না কি! গোপালের চোখ সব জায়গায়।' হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠল বেলা, 'আমাকে বিরক্ত কোনো না তো! আমাকে ঘুমোতে দাও।'

কয়েকদিন গুম হয়ে ছিল শিবেন্দু। তারপর জরুরি কাজে কলকাতায় যেতে হল। তার সঙ্গী শিক্ষকটি বটতলার চটি বই কিনে দেখালেন তাকে। বললেন, 'জাপানি তেলের চেয়ে বেশি কাজ দেয়। অথচ দাম খুব কম।' তার একটা পড়েই গা ঘিনঘিন করে উঠল। বমি পেল। সে বলল, 'এইসব বই গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'আপনার কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি?'

'না।'

'তা হলে জাপানি তেল কিনুন।'

নিজের সম্পর্কে একটা সন্দেহ দানা পাকাচ্ছিল, বেলার পাশে শুয়েও তার শরীর অস্থির হয় না অথচ মন চায়। লুকিয়ে তেলটা কিনে গাঁয়ে ফিরল সে। ঠিক করল আজ যতই আপত্তি করুক, সে কোনও কথা শুনবে না। রাত্রে শোওয়ার আগে তেলটা ব্যবহার করে যখন বিছানায় এল, তখন বেলা ঘুমোচ্ছে। ওর শরীরে হাত দিতেই শিবেন্দু বুঝল তেল কেনার টাকাটা জলে গিয়েছে। কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। ঘুমিয়ে ছিল বেলা, হঠাৎ পাশ ফিরল। তারপর উঠে বসে শিবেন্দুকে অপলক দেখতে লাগল। শেষে আঙুল বোলাল ওর চিবুকে, গালে। শিবেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'আমার কী ভাগ্য গো!' বেলা বলল, 'এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম। গোপাল আমাকে বলছে, আমি তোমার কাছে জীবন্ত থাকতে চাই। বলে তোমার শরীরে ঢুকে গেল গোপাল।'

'আমার শরীরে?'

'হ্যাঁগো। উঃ, কী আনন্দ হচ্ছে আমার। তুমি শোও, আমার কোলে মাথা রেখে শোও।' প্রায় জোর করে শিবেন্দুর মাথা টেনে নিল বেলা। তারপর ঝুঁকে পড়ে আদর করতে করতে বলল, 'আমার গোপাল সোনা, ঘুমোও, ঘুম পাড়িয়ে দিই তোমাকে। হাতের মৃদু আদর এখন শিবেন্দুর কাঁধ, মাথায়। চোখ বন্ধ করে শিবেন্দু পড়ে থাকল, তার শরীরে এখন বেলার বুকের চাপ, নরম অনুভূতি। বিয়ের পর এই প্রথম। গোপাল হয়ে থাকলে তাকে আর কোনও পরীক্ষা দিতে হবে না অথচ এই সুখটা নিয়মিত পাবে। শিবেন্দু সেই সুখ উপভোগ করছিল।

দিবা স্বপ্ন এবং হরিপদ

হাসপাতালের গেট দিয়ে ট্যাক্সি ঢুকতেই হরিপদ বাবু ব্যস্ত গলায় বললেন, 'এনক্যুয়ারি চলুন।'

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, তাই যাচ্ছি দাদা।

এনক্যুয়ারির সামনে ট্যাক্সি থামতেই দুজন উর্দিপরা লোক ছুটে এসে দরজা খুলে বলল, 'আপনি আগে নেমে আসুন, আমরা দিদিকে নামাচ্ছি।'

ট্যাক্সি থেকে নেমে হরিপদ বাবু দেখলেন ওরা খুব যত্নের সঙ্গে ওঁর স্ত্রীকে

নামিয়ে স্ট্রেচারে শুইয়ে ভেত.র নিয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী তখনও ওমা, মাগো বলে কাতরে যাচ্ছেন।

তিনি ট্যাক্সিওয়ালার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই লোকটি হাসল, 'আপনি আগে ওঁকে ভর্তি করিয়ে দিন তারপর এসে ভাড়া দেবেন। আমি ওয়েটিং-এর জন্যে এক্সট্রা নেব না। মিটার দেখে যান।'

এরকম ট্যাক্সিওয়ালা যে কলকাতায় আছে হরিপদবাবুর তা জানা ছিল না। চট করে মনে পড়ল কিছুদিন আগে কাগজে পড়েছিলেন একজন ট্যাক্সিওয়ালা প্যাসেঞ্জারের ফেলে যাওয়া আশি হাজার টাকা থানায় জমা দিয়েছিলেন। তাহলে এই লোকটাও ওই রকম! তিনি ভেতরে দৌড়ে গেলেন। যে-ঘরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখলেন দুজন ডাক্তার ওঁকে পরীক্ষা করছেন। নার্স জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে?'

হরিপদবাবু বললেন, 'আজ্ঞে, ওঁর স্বামী।'

একজন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কি অসুবিধে হচ্ছে জানেন?'

'আজ ঘুম থেকে উঠে বলেছিল পেটে ব্যথা হচ্ছে। বেলা বাড়তে ব্যথাও বাড়ল। পাড়ায় ডাক্তারকে ডেকে আনলাম, তাঁর ওষুধে কাজ হল না। তাই এখানে নিয়ে এলাম।'

নার্স বললেন, 'নাম ঠিকানা বলুন।'

হরিপদবাবু জানালেন।

একমাত্র ভোট দিতে যাওয়ার সময় ছাড়া স্ত্রীর নামের প্রয়োজন হয় না। যে ডাক্তার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন্ন তিনি ততক্ষণে চলে গিয়েছেন একটা কম্প্যুটারের সামনে, 'এদিকে আসুন। আপনার নাম।'

'আজ্ঞে হরিপদ দত্ত।'

ডাক্তার বোতাম টিপলেন কয়েকটা, 'এদিকে তাকান। পেট সংক্রান্ত সমস্ত পেশেন্ট এই ওয়ার্ডে থাকেন। দেখতে পাচ্ছেন?'

কম্প্যুটারে ছবি ভেসে উঠল। সুদৃশ্য বিছানায় পেশেন্টরা শুয়ে আছেন। নার্স তাঁদের দেখাশোনা করছেন।

ডাক্তার বললেন, 'আপাতত এই তিনটি বেড খালি আছে।' মাউস টিপে ছবির তিনটে খালি বেড চিহ্নিত করলেন তিনি, 'কোনটা নেবেন?'

'আজ্ঞে চার্জ কি রকম?'

'জেনারেল বেডে কোন চার্জ লাগে না। এগুলো জেনারেল বেড।'

'ওই বাঁদিকের শেষ বেডটা।'

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার টাইপ করতেই পর্দায় ফুটে উঠল, 'বেড নাম্বার সেভেনটিন'।

তৎক্ষণাৎ দুজন লোক একটা চাকা লাগানো ট্রলিতে হরিপদবাবুর স্ত্রীকে শুইয়ে দৌড়াল।

ডাক্তার বললেন, 'এই কাগজটা নিয়ে ওদের সঙ্গে যান।'

বিশাল লিফটে ট্রলি তুলে তিনতলায় উঠে লোকদুটো সেই ঘরে ঢুকতেই হরিপদবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাজনা শুনতে পেলেন। একজন নার্স এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিসেস দত্ত?'

হরিপদবাবু কাগজটা এগিয়ে দিলেন। নার্স বললেন, 'বেড নাম্বার সতের।' ট্রলি চলল সেদিকে। এত পরিষ্কার ঘর হরিপদবাবু কখনও দ্যাখেননি। স্ত্রীকে বিছানায় শোওয়ানোমাত্র একজন ডাক্তার ওঁর পাশে চলে গেলেন, 'বেডে শোওয়ালেন কেন? একটা আলট্রা সোনোগ্রাফি করাতে হবে। এখনই কাজটা সেরে ফেলতে চাই। নিয়ে চলুন।'

হরিপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন বিল্ডিং-এ নিয়ে যেতে হবে?'

'কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। পেট সংক্রান্ত পেশেন্টরা এখানে থাকেন বলে পাশের ঘরেই ওই ব্যবস্থা করা হয়েছে।' নার্স হেসে বললেন।

মিনিট কুড়ি বাদে নার্স হরিপদবাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন একটা ঘরে যেখানে দুজন ডাক্তার তাঁর স্ত্রীর রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখছেন।

একজন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্ত্রী আগে কখনও বলেননি যে পেটে ব্যথা হচ্ছে?'

'আজ্ঞে না।'

'কোন অস্বস্তির কথাও বলেননি?'

'না।'

দ্বিতীয় ডাক্তার বললেন, 'বাঙালি মেয়েরা ভাবেন, বললে স্বামীকে সমস্যায় ফেলবেন। এটা ঠিক নয়। শুনুন, ওঁর গলব্লাডারে পাথর হয়েছে। একটা দুটো বড় পাথর হলে আমরা মাইক্রোসার্জারি করতাম। কিন্তু অনেকগুলো ছোট রয়েছে বলে পেট ওপেন করা দরকার। আমরা দেরি করতে চাই না। কিন্তু তার আগে কয়েকটা রুটিন পরীক্ষা করে নিতে হবে। সেই রিপোর্টও আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাব। অপারেশনের ব্যাপারে আপনার সম্মতি আছে তো?'

'যাতে ভাল হয় তাই করুন।' হরিপদবাবু বললেন।

'ঠিক আছে। আপনি ওপাশের ঘরে গিয়ে আপনার স্ত্রীর নাম বলুন। ওরা একটা ফর্ম দেবে, সেটা ভর্তি করে সই করে দেবেন।'

'কিন্তু আমি তো তৈরি হয়ে আসিনি।' হরিপদবাবু মিনমিনে গলায় বললেন।

'কিসের তৈরি?'

'আজ্ঞে, অপারেশনের জন্যে তো টাকা জমা দিতে হবে!'

'আপনি কি করেন?'

'ব্যবসা। ছোটখাটো।'

'প্যান কার্ড আছে?'

'আছে। প্রতি বছর ট্যাক্স জমা দিই।'

'তাহলে আবার অপারেশনের খরচ দেবেন কেন? যাঁরা ট্যাক্স দেন, প্যান কার্ড আছে, তাঁদের কোন চার্জ করা হয় না। এসব কথা আগে শোনেননি?'

'না তো!'

'খুব অন্যায় কথা। কাগজে সরকারি বিজ্ঞাপন দ্যাখেন না?'

'সরকারি বিজ্ঞাপনে সাজানো কথা থাকে বলে পড়ি না।'

'যান, পাশের ঘরে যান।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফর্ম ভর্তি করে দিলেন হরিপদবাবু। ভাগ্যিস প্যান কার্ডের নম্বর মনে ছিল। এখন হাতে কোন কাজ নেই। হরিপদবাবুর খেয়াল হল। দ্রুত নেমে এসে ট্যাক্সিওয়ালার সামনে দাঁড়ালেন। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'ভর্তি হয়ে গেছেন।'

'হ্যাঁ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' যা ভাড়া উঠেছিল তার থেকে তিরিশ টাকা বেশি দিলেন হরিপদবাবু।

টাকাটা গুণে লোকটা তিরিশ টাকা ফেরত দিয়ে বলল, 'এটা কেন দিচ্ছেন! ন্যায্য ভাড়া তো পেয়ে গেছি।' ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। হরিপদবাবু হতভম্ব!

অপারেশনের আগে সতের নম্বর বেডের কাছে এসে হরিপদবাবু দেখলেন একজন নতুন নার্স তাঁর স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কোন ভয় নেই। ব্লাডপ্রেশার সামান্য বেশি। তাতো হবেই। যা ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সুগার নর্মাল, এইটে সবচেয়ে ভাল খবর। আধঘণ্টার মধ্যে অপারেশন হয়ে যাবে। আজ রাত্রে বিশ্রাম। কাল সকালে আপনাকে হাঁটাবো। চাইলে পরশু বাড়ি যেতে পারেন।'

'সত্যি?' হরিপদবাবুর স্ত্রীর মুখে আলো ফুটল।

'হ্যাঁ। তবে বলি কি, বাড়ি গেলে তো কাজ না করে থাকতে পারবেন না, দুদিন আপনি বিশ্রাম নিয়ে যান, ভাল হবে।' বলতে বলতে নার্স হরিপদবাবুকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'নিন, আপনারা কথা বলুন, আর বেশী সময় নেই।'

নার্স চলে গেলে হরিপদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভয় লাগছে না তো?'

'না। কিন্তু তুমি কি খাবে? রান্না তো করতে পারিনি।'

'আঃ। আমার কথা ছাড়ো। যাহোক ম্যানেজ করে নেব।'

সন্ধের আগে ডাক্তার হরিপদবাবুকে ডেকে একটা ট্রে দেখালেন, 'এই দেখুন এত পাথর আপনার স্ত্রীর পেটে ছিল। ওই যে বলে না, পেটে পেটে এত!' হাসলেন ডাক্তার।

'কেমন আছে ও?'

'ভাল। এখন ঘুমের ওষুধে আছে। কাল এসে কথা বলবেন।'

'আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

'সে কি? কেন? আমরা আমাদের কাজ করেছি। এই কাজের জন্যে মাইনে পাই। সেই মাইনে আসে আপনাদের দেওয়া ট্যাক্স থেকে। তাই না?'

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হরিপদবাবু বললেন, 'ওঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসগুলো নিয়ে এসে কার কাছে দেব?'

'কি সেগুলো? চিরুনি, পাউডার তোয়ালে? বা জামাকাপড়? এখানে যতদিন থাকবেন হাসপাতালের পোশাকে থাকবেন, যাওয়ার সময় নিজের শাড়ি জামা পরে যাবেন। বাকিগুলো এখান থেকেই দেওয়া হবে। যান, বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিন।' ডাক্তার বলে গেলেন।

নিচে নেমে এলেন হরিপদবাবু। কোথাও কেউ অলস হয়ে বসে নেই। তিনি চারপাশে তাকালেন। আজ যা ঘটল তা কি স্বপ্ন? বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে। জানাশোনা নেই। কাউকে ধরাধরি করে আসেননি, তা সত্ত্বেও সব বিনা পয়সায় ঠিকঠাক হয়ে গেল? এইসময় লোকটাকে দেখতে পেলেন তিনি। রেলিং-এ হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। শীর্ণ চেহারা। মুখটা বেশ করুণ। কাছে যেতে লোকটা তাকাল, 'হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল হয়ে যাবে।'

'আপনি কি অসুস্থ?'

'অ্যাঁ? সুস্থ তো নেই। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি, সুস্থ থাকব কি করে?'

'সে কি? খাননি কেন?'

'রোজগার নেই। তাই খাবার পয়সা নেই।'

'চাকরি চলে গেছে? কারখানায় লকআউট?'

'না। আগে হাসপাতালে চাকরি করতাম। পেশেন্ট পার্টিকে টুপি পরিয়ে মোটা রোজগার করতাম। এখন তো সেসব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমিও বেকার হয়ে গেছি। তবু এখানে আসি। অনেকদিনের অভ্যাস তো, না এসে পারি না।' লোকটি কাশল।

কিরকম মায়া জাগল মনে। এরাই তো রাজত্ব করত এখানে। আজ কি অবস্থা, লোকটার হাতে দশটাকা গুঁজে দিয়ে হরিপদবাবু বললেন, 'কিছু খেয়ে নিন ভাই।'

দু'জনে বড় সুখে আছে

বড় সুখে ছিল দু'জনে। সকালে কাজের লোক এসে বেল বাজালে অবিনাশ চোখ খুলতেই আরতির মুখ দেখতে পেত। ভাঁজ জমছে আরতির কপালে, নাকটা একবার কুঁচকে গেল, চোখ বন্ধ রেখেই প্রশ্ন করত, 'আটটা?'

অবিনাশ হ্যাঁ বলার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার বেল বেজে উঠত, চোখ খুলে উঠে বসে আরতি বলত, 'কেন যে এত তাড়াতাড়ি আটটা বেজে যায়?'

তাকে খাট থেকে নামতে দেখে অবিনাশ বলত, 'তুমি বাথরুমে যাও আমি...'

আরতি জানত এই সংলাপ শুনবে, তাই দিক পরিবর্তন না করে সোজা টয়লেটে ঢুকে যেত। ঘুমঘুম ভঙ্গিতে অবিনাশ দরজা খুলতেই কানে আসত, 'বাব্বা!'

ঝড়ের মতো যে ভেতরে ঢুকে যেত, কাজ করছে সে বছর দশেক। টুকটাক মন্তব্য করার অধিকার আদায় করে নিয়েছে সে।

মিনিট পনেরো বাদে মুখোমুখি চা খাওয়া। খাবারের কাগজ তখনও পাট-বন্দি। কুড়ি, কুড়ি বছর পার হয়ে গেলেও আরতি জিজ্ঞাসা করত, 'অ্যাই কী দেখছ, ওভাবে তাকালে লজ্জা লাগে না?'

'লজ্জা যখন লাগে, তখন তোমাকে আরও মিষ্টি দেখায়।'

'ধ্যাৎ, দিনকে দিন যা মুটোচ্ছি।'

'ভাগ্যিস।'

'তার মানে?'

'বাঙালি মেয়েদের শরীর এখন পাঁকাটির মতো হয়ে যাচ্ছে। তাদের দিকে তাকালে চোখে কাঁটা ফোটে। আর তোমাকে দেখলে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়।'

'কী রকম।'

'আমার মামার বাড়ির পেছনে একটা বিশাল বিল ছিল, জল, জল, আদিগন্ত শুধু জল, গহিন গাঙ। তোমাকে দেখলে সেই বিলের কথা মনে পড়ে।' হাসত অবিনাশ। 'তুই সেই গহিন গাঙ, আমি ডুবে মরি।'

'ছিঃ মরার কথা বোলো না।'

মাথা নাড়ত অবিনাশ, 'এ মরণ তো মরণ নয়, এর অন্য নাম জীবন।'

দু'জনে বড় সুখে ছিল। ঠিক পৌনে এগারোটায় খাওয়া শেষ করে দোকানে যাওয়ার সময় অবিনাশ আরতিকে চুমু খেয়ে যেত। কুড়ি বছরে ক'টা চুমু খাওয়াখাওয়ি হয়েছে? অবিনাশ অঙ্কে কাঁচা। আরতি হিসেব করে বলেছিল, 'বারো হাজার দুশো এগারোবার।'

অবিনাশ অবাক, 'অ্যাতো?'

'হিসেব করে দেখো।' আরতি হাসত।

সারাদিন দোকানে কেটে যেত। স্যানিটারি ইকুইপমেন্টের দোকান। কিন্তু ওই সময়ে অন্তত চারবার ফোন আসত। অবশ্যই সেই ফোনগুলোতে প্রয়োজন বা সমস্যার কথা বলা হত না। অথচ অন্তত চারবার আরতি ফোন না করলে মনে হত, কী যেন পাইনি। মাঝনদীর ঢেউগুলো যেমন অকারণেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বাজায়।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে টিভি দেখা, নয়তো নতুন নতুন চিনে রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করে সেখানে যাওয়া। চিনে খাবার আরতির খুব প্রিয়। তারপর অনেক আদরের ঘুম।

দু'জনে বড় সুখে ছিল। কিন্তু গত আঠারো বছরে ছত্রিশবার ডাক্তার পরীক্ষা করেছে ওদের। একাধিক ডাক্তার। প্রত্যেকেই এক কথা বলেছেন, অনুসন্ধানে কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি। দু'জনেই ত্রুটিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনও দুর্বোধ্য কারণে আরতির শরীরে ভ্রূণ জন্মাচ্ছে না। প্রত্যেক ডাক্তার বলেছেন, হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। যেকোনও দিন আগমনী বার্তা পেয়ে যাবে ওরা। বাড়ি ফিরে এসে অবিনাশ বলেছিল মস্করা করে, 'চেষ্টার কোনও বিকল্প নেই। ফলের আশা না করে কাজ করে যাও। কোন মহাপুরুষ যেন এই কথাগুলো বলেছিল?'

আরতি গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'ওঁদের নিয়ে ইয়ার্কি করতে নেই।'

কিন্তু সংসারে তৃতীয় জন আসেনি বলে ওরা খুব একটা দুঃখে বাস করছে না। বরং একটি শিশু মাতৃগর্ভে আসার পর থেকে যেসব সমস্যা তৈরি হয়, তা বন্ধুদের কাছ থেকে শোনার পর মনে হচ্ছিল, এই বেশ আছি, ভালো আছি।

কিন্তু কয়েকদিন পরে অবিনাশের বাঁ হাঁটুতে একটা ব্যথা জানান দিল। সিঁড়ি ভাঙতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। আরতি জোর করে ডাক্তারের সামনে পেশ করল স্বামীকে।

ডাক্তার নানান পরীক্ষার পর এক্স-রে করালেন। সেই রিপোর্ট দেখে বললেন,

'আপনাকে পেইন কিলার দিতে পারি। কিছুটা সময়ের জন্য ব্যথা কমবে, পেইন কিলার বেশি খেলে পেটে আলসার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

'তাহলে?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল অবিনাশ।

'আপনার শরীরের ওজন হাঁটু বহন করতে পারছে না।' ডাক্তার বললেন।

অবিনাশ চমকে উঠল, 'সেকী! ডান হাঁটু পারছে আর বাঁ হাঁটু পারছে না?'

'এখনও পারছে, ক'দিন বাদে আর পারবে না।'

'সর্বনাশ! একটা কিছু উপায় বলুন।'

'দুটো পথ আছে। আপাতত ওষুধ খাওয়াতে পারি, কিন্তু কাজ হবে বলে মনে হয় না। হাঁটু পাল্টে ফেলতেই হবে।'

'হাঁটু পাল্টে ফেলবেন?' অবিনাশ হতভম্ব।

'অনেকেই ফেলছেন। পাল্টালে দুটোই পাল্টান।'

'সেকী! একটায় ব্যথা হচ্ছে—'

'দাঁড়ান, গাড়ির দুটো চাকা খারাপ হলে সেই দুটোর জায়গায় নতুন চাকা লাগালে কতকটা কাজ হয়। চারটি চাকা একসঙ্গে পাল্টালে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।' ডাক্তার মোলায়েম গলায় বললেন, 'আপনার বাঁ হাঁটুর ভেতরটা শুকিয়ে যাওয়ায় হাড়ে হাড়ে লেগে ব্যথা হচ্ছে। ডান হাঁটুতে হল বলে। অপারেশন করে এগুলো ঠিকঠাক করে দেওয়া যায়। নব্বই কেজি ওজন ওদের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।'

'বললেন দুটো পথ আছে। সেকেন্ডটা কি?'

'ওজন কমাতে হবে। যত ওজন কমাবেন, ব্যথা তত কমবে। মেডিসিন উইদাউট প্রেসক্রিপশন হল ওয়াকিং। হাঁটুন। সকাল বিকেল মাইলের পর মাইল হাঁটুন। জিমে ভর্তি হন, যোগা করুন। কী খাবেন তার একটা লিস্ট তৈরি করে দিচ্ছি। বাধ্য ছাত্রের মতো এটা মেনে চলে তিন মাস পরে আমার কাছে আসুন।'

'ওজন কত হলে ব্যথা থাকবে না?'

'আপনার উচ্চতা কত?'

'পাঁচ দশ।'

'সত্তর কেজি। অন্তত কুড়ি কেজি কমাতে হবে।'

'কিছু মনে করবেন না, ও, মানে আমার স্ত্রী, বেশ স্বাস্থ্যবতী, ওর পায়ে তো ব্যথা হচ্ছে না, কোনও অসুবিধে নেই। ও কি আমার সঙ্গে হাঁটতে পারে?'

'আলবত পারে। ম্যাডাম, আপনি আপনার স্বামীর রুটিন ফলো করুন। দেখবেন, একেবারে ঝরঝরে লাগছে। বয়স কমে যাবে অনেক।' ডাক্তার বলেছিলেন।

আরতির উৎসাহ অবিনাশকে উৎসাহিত করল। ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়েই হাঁটার জুতো কিনে ফেলল। অবিনাশের জন্যে বারমুডা আর নিজের জন্যে থ্রি

কোয়ার্টার প্যান্ট পছন্দ করে নিয়ে বলল, 'আজ তাড়াতাড়ি ঘুমোব আমরা। কাল সূর্য ওঠার আগেই উঠতে হবে।'

অথচ আজও ঘুম ভাঙল কাজের লোকের বেল বাজানোর আওয়াজে। ঘুম ঘুম গলায় আরতি বলল, 'ওমা! আটটা বেজে গেল।'

'সর্বনাশ! সূর্য তো অনেক আগে উঠে গেছে।' অবিনাশ বিছানা ছেড়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। কাজের লোক ঢুকতেই সে বলল, 'শোনো, তুমি একবার বলেছিলে আরও ভোরে এসে কাজ করে গেলে তোমার সুবিধে হয়। তাই না?'

'বলেছিলাম। কিন্তু দু'বাড়ির কাজ এসে গেছে এই সময়ে। আপনাদেরটা আমার থার্ড বাড়ি।' কাজের লোক ভেতরে চলে গেল।

চা খেতে খেতে অবিনাশ আরতিকে বলল, 'ভুলটা আমারই হয়েছে। আমার উচিত ছিল ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখা। টেলিফোনেও বলে রাখা উচিত ছিল।'

আরতি বলল, 'হ্যাঁগো, ডাক্তারকে একবার ফোন করে দেখো না!'

'কেন?'

'শুধু ভোরেই হাঁটতে হবে? অন্য সময় হাঁটলে কি উপকার হবে না?'

অবিনাশের মনে হল আরতির কথায় যুক্তি আছে। হাঁটার সময় শরীরের ব্যায়াম হবে, ক্যালরি কমবে, তার সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক কী? সে ডাক্তারকে ফোন করে শুনল, 'আপনি যেকোনও সময় হাঁটতে পারেন। বিদেশে সারাদিন সময় পায় না বলে কিছু মানুষ মধ্যরাতে মাইল তিনেক হেঁটে নেয়। তবে সারারাত ঘুমোনোর পর সকালে হাঁটলে মনটাও ভালো থাকবে।'

অতএব অ্যালার্ম বাজিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে পোশাক পরে দরজায় তালা দিয়ে ওরা বাড়ি থেকে যখন বের হল তখনও আলতো আঁধার পৃথিবীতে থেকে গেছে। বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিট দূরে দেশবন্ধু পার্ক। ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগিয়ে অবিনাশ বলল, 'বেশ লাগছে। কত এইরকম ভোরকে আমরা এর আগে দেখিনি, বলো।'

হাঁটতে হাঁটতে আরতি বলল, 'সাত হাজার দুশো।'

অবাক হয়ে যায় অবিনাশ, 'উঃ! তোমার কত্ত এলেম।'

'এই হাঁটার সময় কথা বলতে নেই।' আরতি এগিয়ে যাচ্ছিল। যাবেই তো। ওর যে হাঁটুতে কোনও ব্যথা নেই। পার্কে ঢুকে অবিনাশ দেখল কয়েকজন মানুষ পাগলের মতো হেঁটে চলেছে। মেয়েদের সংখ্যা বোধহয় বেশি। একটু পরেই সে দেখল ওই ভিড়ে আরতি মিশে গেল।

এইটুকু হাঁটতেই হাঁটু জানান দিতে শুরু করেছিল। মিছিমিছি ব্যথা বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। অবিনাশ ধীরে ধীরে হেঁটে মাঠের মাঝখানে চলে এল। বিশাল মাঠের চারপাশ দিয়ে হাঁটার পথ একটা রিং তৈরি করেছে। লোকে সেই পথ ধরেই

হাঁটছে। মাঠের মাঝখানে কিছু ছেলে ক্রিকেট খেলছে। খানিকটা পায়চারির পর একটা খালি বেঞ্চি দেখে অবিনাশ এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ে বলল, 'আহ!'

আরতি কোথায়? ওই চলন্ত ভিড়ে ওকে দেখা যাচ্ছে না। এখন না দেখতে পাওয়াই ভালো। তার বসে থাকাটাই ও সমর্থন করবে না।

'এই এদিকে আয়। এই বেঞ্চিটা খালি আছে।' মহিলা কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারিত হল। অবিনাশ মুখ ফিরিয়ে দেখল অতিরিক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে এক মহিলা, যার পরনে শার্ট এবং প্যান্ট, তার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পিছনে একটি অল্পবয়সি মেয়ে যার কাঁধে তিনটে ফ্লাস্ক ঝুলছে। প্রতি পদক্ষেপে মহিলার শরীর বিদ্রোহ করছে প্যান্টের বিরুদ্ধে।

সশব্দে বেঞ্চির অন্য প্রান্তে তিনি বসামাত্র অবিনাশ উঠে দাঁড়াল।

'একী!' মহিলা চেঁচালেন, 'আমাকে অপমান করছেন কেন?'

'অপমান? আমি? কেন করব?' ঘাবড়ে গেল অবিনাশ।

'আলবত করেছেন। আমি এই বেঞ্চিতে বসামাত্র আপনি উঠে দাঁড়াননি?'

'না না, আমি ভাবলাম আপনারা দু'জন আছেন।'

'থাক! ও বাচ্চা মেয়ে। এই বয়সেই তো দাঁড়িয়ে থাকবে। বসুন।'

অবিনাশ সন্তর্পণে বসল।

'নতুন মনে হচ্ছে। আগে তো এখানে দেখিনি!'

ভিড়ের মধ্যে আরতিকে খুঁজে না পেয়ে অবিনাশ বলল, 'আজই প্রথম এখানে।'

'চা না কফি?'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল অবিনাশ।

'দুটোই আছে। তবে আমি সাজেস্ট করব চা। তিনটে ফ্লাস্ক। একটায় রেগুলার চা, দ্বিতীয়টা চিনি দুধ ছাড়া চা, তৃতীয়টায় কফি। রিমকি, লিকার ঢাল।'

কাজের লোকের হাত থেকে কাগজের গ্লাসে চা নিয়ে অবিনাশকে দিয়ে মহিলা বললেন, 'আমি সন্ধ্যাতারা। আপনি?'

'অবিনাশ।'

'ম্যারেড?'

হাসল অবিনাশ, 'হ্যাঁ।'

'গুড। বয়স্ক অবিবাহিতদের আমি টলারেট করতে পারি না। ম্যারেডরা অনেক সফট হন, দাবিটাবি থাকে না। চা খান।'

'আপনি হাঁটবেন না?' অবিনাশ কথা বলার জন্যে কথা বলল।

'না। ওই জগা পাগলাদের দলে আমি নেই।'

'জগা পাগলা?'

'ওই যারা জগিং করার ভান করে হাঁটেন তাঁদের কথা বলছি। আপনার আইকিউ খুব কম? স্ত্রীর সব কথা আপনি বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

হাসলেন সন্ধ্যাতারা, 'তিনি কি মুখরা?'

'একদম উল্টো, ওর ব্যবহার, কথা বলার ধরন খুব মিষ্টি।'

'আশ্চর্য! আপনি তাই বুঝেছেন?'

'বুঝব না?'

'এই যে বুঝব না বললেন, এটাই আপনার সমস্যা। রিমকি ওঁর চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কাপটা নে।'

কাজের মেয়েটি কাপ ফেরত নিতেই অবিনাশ বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?'

'এই যে চা খাওয়ালেন!'

'এত অল্পেই আপনি সন্তুষ্ট!' হেসে বললেন সন্ধ্যাতারা। হঠাৎ মনে প্রশ্নটা এল, না জিজ্ঞাসা করে পারল না অবিনাশ। 'আপনি ম্যারেড?'

এবার হেসে গড়িয়ে পড়লেন সন্ধ্যাতারা, 'ইস! আপনিও?'

'মানে?'

'যেসব বিবাহিত পুরুষকে আমি এই সময় চা খাইয়েছি তাদের সবাই একসময় জিজ্ঞাসা করে, আপনি ম্যারেড? আমি ম্যারেড হলে ওদের সুবিধে হয়। আসুন আপনি।' সন্ধ্যাতারা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

হাঁটতে হাঁটতে অবিনাশের মন খারাপ হয়ে গেল। এইরকম মহিলা সে জীবনে দেখেনি। সকালে হাঁটতে এখানে এলে দেখা হবেই। একা দেখা হলে ঠিক আছে। আরতি সঙ্গে থাকলে ইনি কী বলবেন তা অনুমান করা যাচ্ছে না। আরতি ভেবে নেবে তার অনেকদিনের চেনা?

তখন সূর্য উঠছিল। হাঁটিয়েদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এইসময় দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারল আরতি হাঁটছে। বেশ জোরে পা ফেলছে। কিন্তু ওর পাশের লোকটা কে? একই তালে হাঁটছে লোকটা। হাঁটতে হাঁটতে কথাও বলছে। তাই শুনে আরতি মিষ্টি হাসি হাসল। অন্য সময় হাসলে যত মিষ্টি দেখায় এখন তার চেয়ে অনেক বেশি লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল। পাশে সেই নীল ট্র্যাকস্যুট পরা লোকটা।

আরতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য সে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। একদম অপরিচিত লোকের সঙ্গে ওইরকম হাসাহাসির কী দরকার? ভাবতেই পেটের ভেতরে একটা মোচড় টের পেল অবিনাশ। ওই গরম লিকার চা জানান দিচ্ছে।

বাড়িতে সে নর্মাল চা খায়। কখনোই লিকার নয়। কিন্তু চা খাওয়ার কথা বললে আরতি কীভাবে নেবে?

আবার আরতিকে দেখতে পেল সে। এবার ওর পাশে সবুজ ট্র্যাকস্যুট। নীলটা কোথায় গেল! ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল আরতি। পাশের সবুজ ট্র্যাকস্যুটকে বলল, 'আমার হাজবেন্ড। ইনি এখানকার মর্নিং ওয়াকার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি।'

'নমস্কার। নমস্কার।'

সবুজ ট্র্যাকস্যুট যাওয়ার সময় বলে গেলেন, 'কাল থেকে রোজ আসবেন, কামাই করবেন না। আপনাকে আমাদের চাই!'

'তোমাকে চাই মানে?' রেগে গেল অবিনাশ।

'আসোসিয়েশনের সভ্য হতে বলেছেন। চলো বাড়ি যাই।'

'এত তাড়াতাড়ি?'

'না গো, দেরি হয়ে যাবে তোমার ব্রেকফাস্ট করতে। তারপর বেরুবে। এই জানো, তোমাকে তখন দেখলাম, খুব স্মার্ট লাগছিল।'

'কখন দেখলে?'

'ওই যে একটা মুটকির পাশে বসে চা খাচ্ছিলে। আমি কিন্তু তোমাকে ডিস্টার্ব করিনি।' আরতি স্বামীর হাত ধরল।

ওরা দু'জনে বেশ সুখেই থাকল।

কেমন আছিস

তিরিশ তিরিশটা বছর আমি চা-বাগানের পুজো দেখিনি। কখন কেমন করে সেই দেখার ইচ্ছেটা উধাও হয়ে গিয়েছিল জানি না। বুবু আর জয়দীপ খোঁচাল।

আমি চা-বাগানের যে কোয়ার্টার্সে জন্মেছিলাম, আমার বাবার অবসর নেওয়ার পর যে বাড়িটার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, সেই বাড়িতেই চাকরিসূত্রে থাকে জয়দীপ সস্ত্রীক। বেশ কয়েক বছর আগে ওরা আমাকে ফোন করে বলেছিল, 'আমরা আপনার বাড়িতে থাকি।'

হেসে বলেছিলাম, 'না। ওটা এখন তোমাদের বাড়ি।'

'একদমই নয়। আপনার সময়কার সব গাছ এখনও এ বাড়িতে দিব্যি আছে। উঠোনটাও। লোকে এসে জিজ্ঞাসা করে এই বাড়িটায় উত্তরাধিকার-এর অনি থাকত কি না।'

মাঝে-মাঝেই কথা হত ফোনে। ওরা বলত, আসুন না। আমার যাওয়া হয়নি।

পুজোর সময় চারদিন ধরে আমাদের বন্ধুদের অসামাজিক জীবন চুটিয়ে চলে। সকাল এগারোটা থেকে দুটো বিয়ার সহযোগে তাস, সন্ধ্যায় হুইস্কি দিয়ে গান। আমার এক খ্রিস্টান বন্ধু জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, 'আচ্ছা, হিন্দুদের ধর্মাচরণ করতে হয় না কেন? যখন মন্দিরে বা প্যান্ডেলে যাওয়ার কথা তখন তোমরা বেড়াতে যাও অথবা ঘরে বসে ওইসব করো?' মনে মনে বলেছিলাম, যদ্দিন ঠাকুর্দা বাবা পিসিমা বেঁচেছিলেন তদ্দিন ওইসব করিনি হে। সাহসেই কুলোয়নি।

তা এই সময় আবার ফোন এল, 'সমরেশদা, আমি বলছি।'

'আমিটা কে?'

'ভুলে গেলেন? এখানে শিউলি শিউলির মতো ঝরে।' হাসল বুবু।

'ও তুমি। কী খবর বলো? পুজো হচ্ছে তো?'

'অবশ্যই। এখন আর মাঠের মাঝখানে স্বর্ণচাঁপা গাছটার নীচে প্যান্ডেল বাঁধা হয় না। ঠাকুরবাড়ি তৈরি হয়েছে। আপনার বাড়ি থেকে কয়েক পা দূরে। রং দেওয়া হয়ে গিয়েছে। চুল আর চোখ বাকি। আর হ্যাঁ, আপনার সেই শিউলি গাছটা, এখন থেকেই প্রতি ভোরে ঘাসের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে। তাই তো বললাম, এখানে শিউলি শিউলির মতো ঝরে। দেখতে ইচ্ছে হয় না?'

বললাম, 'দেখি।'

দু'দিন বাদে, কাল রাত্রে, মা এসে বললেন, 'যা না। দেখে আয়।'

পাশে দাঁড়ানো বড়পিসিমা বললেন, 'রাতের বেলায় ওখানে কি এখনও বাতাবিফুল ফোটে?' ঘুম ভেঙে গেল। কথাগুলো আঁচড়াতে লাগল আমাকে। ওঁরা চলে গেছেন কতকাল। তবু ঘুমের মধ্যে আমার কাছে এলেন, যেতে বললেন।

ট্রেনে কোনও জায়গা নেই। প্লেনের টিকিট শেষ মুহূর্তে হাতে পেয়ে বাগডোগরায় নামলাম দুপুর একটায়। যাদের গাড়ি নেই তারা ওই এয়ারপোর্টে নেমে ড্রাইভারদের খপ্পরে পড়ে। আমিও বাদ গেলাম না। অনেক দরাদরির পর ট্যাক্সিটা রাজি হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি করেন?'

'খাই দাই আর ঘুমাই।'

'এই কথাটা পাঁচ-পাবলিক বলতে পারবে না স্যার।'

শিলিগুড়ি শহরকে পাশ কাটিয়ে ট্যাক্সি ছুটছে। মাঝে মাঝে ঢাকের আওয়াজ পাচ্ছি। জলপাইগুড়ি শহরে না-ঢুকে তিস্তা ব্রিজে উঠে এলাম, দেখলাম, বালির চরে বাতাস সাদা ঢেউ তুলছে। আচ্ছা, কতকাল পরে কাশফুল দেখলাম? দোমহনী-র একটা একচালা মণ্ডপে কয়েকটা হাফপ্যান্ট পরা বালকের সামনে মা দুর্গা দাঁড়িয়ে। আজ পঞ্চমী, এখনও ঢাকি জোগাড় করতে পারেনি এরা।

ধূপগুড়ি পেরিয়ে গেল। দু'পাশে জঙ্গল। ডুডুয়া নদীর ওপর দিয়ে চলে এলাম আংরাভাসা নদীর ব্রিজের কাছে। ড্রাইভারকে বললাম, 'একটু দাঁড়াবেন ভাই।'

ডানদিকে সেই বটগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তখনই আমরা ওকে বুড়োবট বলতাম। আমরা তিন-চারজন সাইকেলে চেপে ওই গাছের পেছনে এসে বসতাম সিগারেট খাওয়ার জন্যে। একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে প্রত্যেকে এক-একটা করে টান। এই গাছটা আমাদের আড়াল দিত। গাছটাকে ছুঁতে ইচ্ছে করছিল খুব। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এই নদীর নাম জানেন?'

ঘাড় নাড়লাম। আংরাভাসা—যে আমার কাছে অলকানন্দার চেয়েও প্রিয়। তা বলে কী লাভ!

চা-বাগান শুরু হল। দূর থেকে অদক্ষ হাতে বাজানো ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে হাইওয়ে থেকে নেমে এলাম মাঠের মাঝখানে। ওপাশে পরপর গাছগাছালি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোয়ার্টার্সগুলো। মাঠের মাঝখানে স্বর্ণচাঁপা গাছ। এখানেই প্যান্ডেল বাঁধা হত। এই মাঠ আমার শৈশব এবং বালকবেলা দেখেছে। আমাদের কোয়ার্টার্সের কোনটায় কে থাকতেন আমি এখনও বলতে পারি। খানিকটা দূরে নতুন ঠাকুরবাড়ি। এখনও সেখানে ভিড় জমেনি। তার খানিকটা পেছনে আমাদের বাড়ির বারান্দা। যে বারান্দায় বড় পিসিমা আর মা মোড়া পেতে বসে থাকতেন বিকেলের ছায়ার সামনে।

হাতে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি চারপাশ। এত নীল কি করে গড়াল আকাশে? হঠাৎ দেখলাম ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে একজন ছুটে আসছে আমার দিকে। ফ্রকের নীচে সাদা পায়ের শেষ, কালো জুতো। বছর পাঁচেকের সেই মেয়ে, এটুকু দৌড়তেই যার নাকে মুক্তো টলটল, জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে গো? কার কাছে এসেছ?'

'আমি? আমি এখানেই জন্মেছিলাম। তোমার মতো ছিলাম একদিন। আজ তোমার কাছে এসেছি।'

'আমি? আমি এখানেই জন্মেছিলাম। তোমার মতো ছিলাম একদিন। আজ তোমার কাছে এসেছি।'

'সত্যি?' বলে আমার আঙুল ধরল সে, 'চলো, তোমাকে মা দুগ্গা দেখাই।'

সে আমায় টেনে নিয়ে গেল ঠাকুরবাড়িতে। ততক্ষণে আরও কয়েকজন নতুন জামাকাপড় পরা বালক-বালিকা সেখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। আঙুল ছেড়ে দিয়ে সে ধমকে উঠল, 'এ কী! তুমি প্রণাম করছ না কেন? প্রণাম করো।'

হেসে ফেললাম। কত বছর পরে জানি না, হাতজোড় করে দাঁড়ালাম দেবীর সামনে। দেবীর এখন মাথায় চুল পরানো হয়নি, চোখ আঁকা হয়নি।

'কিছু মনে করবেন না, আপনি কে?'

পেছন থেকে মহিলাকণ্ঠ ভেসে আসতেই ফিরে তাকালাম। একজন বিবাহিতা মহিলা, আটপৌরে পোশাকে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

হেসে বললাম, 'পুজো দেখতে এসেছি।'

মেয়েটি বলল, 'আমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছি মা।'

'কিন্তু তুমি আমাকে তোমার নাম বলোনি এখনও', বললাম।

'আমি অঞ্জনা।'

'বাঃ! কী সুন্দর নাম।' ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'আপনার মেয়েটি খুব ভাল। ও হ্যাঁ, এখানে আমি বোধহয় একটাই পরিচয় দিতে পারি। এখন যেটা বুবু আর জয়দীপের বাড়ি সেটা একসময় আমাদের ছিল।' আমি হেসে বলতেই ভদ্রমহিলার চোখ বড় হয়ে গেল। তিনি দৌড়ে গেলেন যে-বাড়ির দিকে সেখানেই আমি জন্মেছিলাম।

দিকে দিকে রটে গেল, আমি এসেছি। সন্ধের মুখে যখন ঠাকুরবাড়ির সামনে আমাকে নিয়ে বেশ ভিড় জমেছে, তখন হাতজোড় করে বললাম, 'দেখুন, আপনারা যেমন এখানকার মানুষ আমিও তেমনি। বহুকাল দুর্গাপুজো দেখিনি। আমি আমার মতো করে এই পুজো দেখতে এসেছি। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, সেই সুযোগটা আমাকে দিন।'

বুবু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, 'কথা দিচ্ছি, আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।'

বুবু আর জয়দীপ স্বচ্ছন্দে থাকবে বলে বাড়ির ভেতরটাতে অদলবদল করেছে। চট করে আমার ছেলেবেলার ঘরগুলোকে চেনা মুশকিল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রান্নাঘর, উঠোন, গাছগুলো একইরকম রয়ে গিয়েছে। ওরাও যেন আমায় চিনতে পেরে গেল। নইলে একটু হাওয়া বইতেই তালগাছটা ঈষৎ ঝুঁকে মাথা নেড়ে কেন বলবে, 'কেমন আছিস?' বুবু হেসে বলল, 'আপনারা লেখকরা কত কী শুনতে পান। অবশ্য পান বলেই আমরা জানতে পারি।'

পঞ্চমীর রাতেই দেবী কেশবতী হবেন, মধ্যরাত্রে চক্ষুষ্মতী। তৃতীয় নয়ন সমেত।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই বেরিয়ে এলাম বাইরে। আহা, মধুর দৃশ্য! সেই ছেলেবেলায় এই ভোর-ভোর সময়ে আমরা, ছোট ছেলেমেয়েদের দল, বেরিয়ে পড়তাম ফুল তুলতে। সেই শিউলি গাছটা এখনও ফুল ঝরাচ্ছে। বুবু ঠিকই বলেছে। ওই গাছ আমার থেকে বয়সে বড়। তার তলায় যারা ফুল কুড়োচ্ছিল তারা আমাকে দেখে সংকোচে পড়ল। বললাম, 'আমিও একসময় ফুল কুড়িয়েছি।

তোলো তোমরা।' গাছটার দিকে তাকালাম। যেন ফিসফিস করে কেউ বলল, 'কেমন আছিস?'

আরও একটু বেলা হলে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে চলে এলাম। জয়দীপ বলেছিল, বাজারে এখন একাধিক পুজো হয়। তবে প্রধান পুজো হল ক্লাবের মাঠে, যেখানে একসময় পাঠশালা ছিল। ভবানী মাস্টারের পাঠশালা। ষষ্ঠীর সকালে সেখানে তেমন ভিড় নেই। সেই একই চেহারার দেবীমূর্তি। উদ্যোক্তারা ব্যস্ত। হঠাৎ তাঁদের একজন এগিয়ে এল, 'খুব ভুল যদি না করি, বাবলু না?'

'হ্যাঁ। খোকন তো?'

সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল খোকন। এখন তার চেহারা ভারী। গালে না-কামানো সাদা দাড়ি। বলল, 'তুমি তো আমাদের ভুলেই গেছ।'

বললাম, 'কী যে বলিস। এসব কি ভোলা যায়?'

দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে তুই-তে নেমে এল। জানলাম, এতদিন সে এখানে ট্যাক্সি চালিয়েছে। ট্যাক্সি কিনে ভাড়া খাটিয়েছে। নিজের বাড়ি তৈরি করেছে। জানতাম, তপন মারা গিয়েছে। শিবুও তো অনেকদিন চলে গিয়েছে, দীপু কোথায় তা খোকন জানে না।

'থাকবি ক'দিন?'

'হ্যাঁ।'

'চল, আজ সন্ধেবেলায় তোতে-আমাতে আশপাশের ঠাকুর দেখে আসি। সেই কলেজে পড়ার সময় যেমন যেতাম।' খোকন বলল।

জায়গাটা স্বাভাবিকভাবেই বড় হয়েছে। সেলুন ছিল না আমাদের ছেলেবেলায়, বাড়িতে হাজাম আসত। এখন সেলুন হয়েছে। নানান দোকান। তবে রেস্তোরাঁ চোখে পড়ল না।

চা-বাগানের দুর্গাপুজোয় মাইক বাজছে না। আজ ষষ্ঠী। খুব একটা তফাত চোখে পড়ছে না। আমাদের ছেলেবেলায় যাঁরা এই চা-বাগানে কাজ করতেন তাঁদের কেউ আর এখন নেই। যেমন বাতাবি গাছটাও নেই। বুবু বলল এক ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল গাছটা। কেটে ফেলতে হয়েছে।

বিকেলে খোকন এল গাড়ি নিয়ে। মনে পড়ছিল, কলেজে পড়ার সময়ও আমরা বাগান থেকে ঠাকুর দেখতে যেতাম লরিতে চেপে। মা-বাবা-ভাইবোনরা একসঙ্গে, কয়েকটা পরিবার দিব্যি একই লরিতে চেপে চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে যত চা-বাগান ছিল তাদের পুজো দেখতে যেতাম।

খোকন গাড়ি চালাচ্ছিল। বলল, 'ক'টা ঠাকুর দেখবি?'

হেসে ফেললাম। বললাম, 'গত তিরিশ বছরে আমি একবারও ঠাকুর দেখতে বের হইনি। আজ কোনও বাধা নিষেধ নেই।'

'চল, বিনাগুড়ি দিয়ে শুরু করি।' খোকন বলল, একটা পুজো থেকে অন্য পুজোয় যেতে হলে জঙ্গল পেরোতে হবে, চা-বাগানও। আধঘণ্টা পরে পরে ঢাকের শব্দ অথবা মাইকের গান কানে আসছিল। লক্ষ করলাম, কলকাতার সাজসজ্জা, থিম অথবা আলোর মায়া এখানে এখনও সক্রিয় হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'বানারহাটে এখনও মেলা বসে?'

'বিশাল মেলা। সবশেষে যাব।' খোকন বলল, 'তার আগে এথেলবাড়িতে যাব।'

'এথেলবাড়ি?'

'মনে আছে তোর?' হাসল খোকন।

আলাদা কিছু মনে এল না। খোকন বলল, 'একবার ঠাকুর দেখতে এসে তোর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওখানে গিয়ে। পেটে ব্যথা হয়েছিল।'

মনে পড়ল, বিকেলে এথেলবাড়ির ঠাকুর দেখতে এসে প্রসাদ দিয়েছিল যে-মেয়েটি সে সত্যি রূপসী ছিল কি না মনে নেই, তবে বহুদিন তার কথা ভুলতে পারিনি। কিন্তু সেই প্রসাদ খাওয়ার পরে আমার পেটে এমন যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল যে ওরা চা-বাগানের ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল। আমাকে শোওয়ানো হয়েছিল মেয়েটির বাড়িতে। তার বাবা-মা খুব যত্ন করেছিলেন। ব্যথা কমে গেলে খোকন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পরের বছর ঠাকুর দেখার নাম করে গিয়ে মেয়েটির দেখা পাইনি। ওর মা বলেছিলেন, 'খুকি তো দিল্লিতে আমার ভাইয়ের কাছে থাকে। এবার ওর স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা, তাই আসেনি।' ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছে তার মুখ।

এথেলবাড়ির পুজো প্রায় একই চেহারায় আছে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় জমিয়ে ঢাক বাজছে। অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে পাক খাচ্ছে। আমাদের গাড়ি দেখে বয়স্করা তাকালেন। তাঁদের কেউ কেউ খোকনের চেনা। ওর মারফত আমার পরিচয় পেতে দেরি হল না। এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আমাকে আপনার চেনার কথা নয়। আমার বাবা এই বাগানে কাজ করতেন। এখানে এসে আপনার যখন পেটে খুব ব্যথা হয়েছিল তখন আমি খুব ছোট। আপনাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'আচ্ছা!' আমি হাসলাম।

'আমার বাবা-মা-কে মনে আছে আপনার?'

'নিশ্চয়ই। ওঁরা খুব যত্ন করেছিলেন।'

'ওঁরা আজ নেই। কিন্তু, ভদ্রলোক পেছন দিকে ফিরে কোয়ার্টারগুলোর দিকে তাকালেন, 'আমার দিদি এসেছেন। দিদিকে মনে আছে?'

'খুব অল্প।'

ভদ্রলোক হাত নেড়ে ডাকতে একটি যুবতী এগিয়ে এল, 'কী মামা?'

'দিদি কোথায়?'

'ড্রেস করছে।'

ভদ্রলোক আমার নাম বলতেই যুবতী চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি? বাব্বা! আপনার কথা সবার মুখে কত শুনেছি। আপনার যে কোনও বই বের হতেই মা কিনে ফেলে। ওই তো, মা আসছে। মা, এদিকে এসো।'

ভারী চেহারার এক প্রৌঢ়া, সামনের চুল হালকা হয়ে এসেছে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়াতেই মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। প্রৌঢ়া তাকে ইশারায় থামিয়ে বললেন, 'জানি।' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?'

কেমন আছেন? কেমন আছিস? তিরিশ বছর পরে এসে নিয়ত একই প্রশ্ন শুনে যাচ্ছি। আমি জানি, আমি বদলে গিয়েছি। বদলে যাওয়া মানুষ কতখানি ভাল থাকে? কিন্তু এখানকার গাছগাছালি, এখানকার মানুষ জানতে চায়, কেমন আছ?

কারণ এখানে শিউলিরা শিউলির মতো ঝরে। এখনও।

প্রতিক্রিয়া

মনের কথা তো চেঁচিয়ে দশজনের সাথে বলা যায় না। এই হয়েছে মুশকিল। কল্পনা বেঁচে গেল পাশের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে আসায়।

স্বামী-স্ত্রী। রবিবারের বিকেলে নিজেই এসে আলাপ করল। তখন সুবীর বেরিয়ে গিয়েছে ছুটির দিনের তাসের আড্ডায়। বেল বাজলে দরজা খুলেছিল কল্পনা। খুলে মুগ্ধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল হিন্দি ছবির একজন নায়িকা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

'নমস্কার। আমি তৃষা। আপনার পাশের ফ্ল্যাটে এসেছি।'

'ওহো! আসুন আসুন। আমি কল্পনা।'

বসার ঘরে বসার পরেও কল্পনার মুগ্ধতা যাচ্ছিল না। কি ফিগার তৃষার! এক ফোঁটা মেদ নেই শরীরে, শাড়িটা যেন শরীরে জড়িয়ে থেকে ধন্য হয়েছে। মুখ এমন কিছু আহামরি নয় কিন্তু চটক আছে। চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা।

'পাশেই তো থাকব তাই আলাপ করতে এলাম।' তৃষা বলল।

'খুব ভাল লাগল। আপনারা আগে কোথায় ছিলেন?'

'দিল্লিতে। ওকে অনেকদিন কোম্পানি কলকাতায় পাঠাতে চাইছিল, আমিই আপত্তি করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমিও কলকাতায় ট্রান্সফার নিয়ে নিলাম। তাবলে ভাববেন না আমরা একই অফিসে কাজ করি।' হাসল তৃষা, 'তোমরা?'

'আমার হাজব্যান্ড কাস্টমস্ অফিসার।'

'ও বাবা! সাবধানে থাকবেন।'

'কেন?'

'এখন তো অন্না হাজারে লোকপাল বিল পাশ করাতে মরীয়া। তাহলে এখন নজর পড়বে কাস্টমস্, ইনকামট্যাক্স, সেন্ট্রাল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ওপর।

'আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না।' কল্পনা বলল।

'তুমি কি হোমমেকার?'

এই শব্দটি কয়েকদিন আগে টিভিতে শুনেছিল কল্পনা। এখন হাউজওয়াইফ শব্দটা বাতিল হয়ে গিয়েছে। তার বদলে হয়েছে হোমমেকার। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'তিনি কোথায়?'

'তাস খেলতে গেছেন।'

'সেকি তাস? নিশ্চয়ই মোটা গ্যামব্লিং করেন। কাস্টমস্ অফিসার তো!'

'আমাকে কিছু বলে না।' কল্পনা বলল, 'কি খাবেন? চা না কফি?'

'আজ কিস্যু না। কিন্তু কল্পনা', হাসল তৃষা, 'কলকাতা শহরে আমার বেশি বান্ধবী নেই। তোমাকে বান্ধবী ভেবে নিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'থ্যাঙ্কু। তাহলে এরপর থেকে আর আপনি নয়। ঠিক তো?'

'আচ্ছা।' হেসে ফেলল কল্পনা।

রাত্রে যখন সুবীর ফিরল তখন ওকে বিছানা ডাকছে। রোজই ড্রিঙ্ক করে ফেরে, আজ আকণ্ঠ খেয়ে এসেছে। ডিনার করবে না বলে শুয়ে পড়ল। পড়ামাত্র নাক ডাকতে লাগল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে কল্পনা ঠিক করল, তৃষার কথা ওকে বলবে না। এখন পর্যন্ত কোনদিন কোন কথা না বলে থাকেনি সে, সেই বলার জন্যে অনেকসময় অশান্তি হয়েছে। কিন্তু এখন মড়ার মত পড়ে থাকা লোকটার সাথে দূরত্ব তৈরি করতে চাইল সে।

এই সময় সুবীরের মোবাইলটা টেবিলের ওপর গোঙানি শুরু করে কাঁপতে লাগল। সাইলেন্ট মোডে ভাইব্রেশনে রেখেছিল নিশ্চয়ই। এই বাড়ির নিয়ম কেউ

কারো চিঠি খুলে পড়বে না, একজন অন্যজনের মোবাইল অন করবে না। এগিয়ে গিয়ে মোবাইলটা তুলতেই কল্পনা দেখতে পেল স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে এস. জি! এর স্তিমিত আওয়াজ ঘুমন্ত সুবীরের কানে যাচ্ছে না। বাজতে বাজতে থেমে গেল যন্ত্রটা।

কে এই এস. জি? কিছুদিন আগে সুবীর যখন স্নানে গিয়েছিল তখন তার মোবাইল বেজে উঠতেই কল্পনা স্ক্রীনে দেখতে পেয়েছিল ডি. গুপ্তা। কেন পুরো নাম বা নামের প্রথম শব্দ মোবাইলে স্টোর করে না সুবীর বুঝতে পারে না কল্পনা। তখন সন্দেহ হয়। এসব কোন মহিলার ফোন নয় তো!

দশবছর বিয়ে হয়েছে, একবার কনসিভ করেছিল কিন্তু সেটা পৃথিবীতে আসেনি। যমে মানুষে টানাটানি হয়েছিল তখন। তারপর আর ও পথে হাঁটেনি সুবীর। বলেছিল, 'একগাদা টাকা ফালতু খরচ হয়ে গেল।'

এখন তৃষার সাথে ভাব হয়ে গেল কল্পনার। একদিন তৃষা বলল, 'তুমি এত সুন্দর দেখতে কিন্তু শরীরসচেতন নও কেন?'

হেসে ফেলল কল্পনা, 'কেন? কি করব? আমি খুব কম খাই।'

'দুর! তাতে কি হবে? তোমাকে জিমে যেতে হবে। এই যে কোমরে যে ফ্যাট জমেছে গায়ে গলায় যা বেড়েছে তা কমে গেলে তোমাকে দারুণ দেখাবে।' তৃষা বলল।

'দেখিয়ে কি লাভ হবে?'

'তোমার লাভ হবে। আয়নার সামনে যখন দাঁড়াবে মন ভাল হয়ে যাবে।' হাসল তৃষা।

'তাছাড়া সুন্দরী এবং ভাল ফিগারের মেয়েদের দেখার জন্যে সমস্ত পুরুষ জাতটাই হাঁ করে বসে থাকে।'

'ধ্যেৎ।' লজ্জা পেল কল্পনা।

পরের দিন সকালে সুবীরকে কথাটা বলল কল্পনা। শুনে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুবীর বলল, 'তুমি জিমে যাবে?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়েছিল কল্পনা।

'হঠাৎ আজকাল টিভিতে এসব দেখাচ্ছে বুঝি। গিয়ে কি হবে?'

'অন্য মানুষের যা হয় তাই হবে।'

'হুঁ।' আর কথা বাড়ায় না সুবীর।

শব্দটা সম্মতির ভাবলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। তৃষা কাছাকাছি যে জিমের ঠিকানা ফোন নাম্বার দিল তাদের কাছে জানল আট হাজার টাকা জমা দিতে হবে। এর পরে মাসের চাঁদা। সুবীরের ওই প্রতিক্রিয়ার পর টাকার জন্যে হাত পাতার কোন বাসনা হল না কল্পনার। বিয়ের আগে বাবা একটা অ্যাকাউন্ট

করে দিয়েছিলেন। সেই টাকা থেকে খুব সামান্য এতগুলো বছরে সে তুলেছিল। প্রতিবছরে দুবার। অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে হলে সেটা করা প্রয়োজন। কল্পনা পরের দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে দশ হাজার টাকা তুলে নিল। সে দেখল যে টাকা এত বছরে তুলেছিল তার সমান সুদ তাকে দেওয়া হয়েছে।

পরের শনিবারে তৃষাই তাকে নিয়ে গেল জিমে। ভর্তি হয়ে গেল কল্পনা। তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটার সময়টা সে চেয়ে নিল। বাকি টাকায় সে ব্যায়ামের পোশাক কিনে ফেলল জিমের নিয়ম অনুযায়ী।

প্রথম সপ্তাহে শরীরে তীব্র ব্যথা। জিমের দেওয়া খাদ্যতালিকা অনুকরণ করতে গিয়ে সারাক্ষণ ক্ষিদে ক্ষিদে ভাব। কিন্তু মন শক্ত করল কল্পনা। তাকে ছিপছিপে হতেই হবে।

রবিবার বাজারে যাওয়া সুবীরের নেশার মত। সকালে বাজার থেকে ফিরে সে বলল, 'তোমার সঙ্গে পাশের ফ্ল্যাটের নতুন বাসিন্দাদের ভাল আলাপ হয়ে গেছে বলনি তো?'

'কখন বলব?'

'মানে?'

'রাত্রে যখন বাড়িতে ফেরো তখন কথা শোনার অবস্থা কি তোমার থাকে?'

'অ।'

'কিন্তু তোমাকে কে বলল?'

'ওরাই। বাজারে যাওয়ার সময় নিচে দেখা হল। ভদ্রমহিলাই হেসে আলাপ করলেন। দিল্লির মেয়ে তো, হেভি স্মার্ট! এই বয়সেও ফিগার দেখেছ? ফিল্মস্টারদেরকেও হার মানাবে। তোমার খুব প্রশংসা করল।' সুবীর বলল।

হতেই পারে। দেখা হলে কথা হতেই পারে। কিন্তু প্রশংসা করার কি দরকার ছিল। কল্পনার মনে হল তার উচিত ছিল তৃষাকে সতর্ক করে দেওয়া।

সুবীর বলল, 'ভাল ভেটকির ফিলেট এনেছি। বেসন দিয়ে ভেজে রেখো তো। আজ বিকেলে ওদের চায়ে ডেকেছি।'

বিকেলে ওরা এল। তৃষার স্বামীকে আজ প্রথম দেখল কল্পনা। তার খেয়াল হল, আজ পর্যন্ত একবারও তৃষা তাকে বাড়িতে যেতে বলেনি। ভদ্রলোকের মাথায় একটিও চুল নেই। ফর্সা, মুখে হাসি সেঁটে আছে।

ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে কিচেনের কাজ সারতে হচ্ছিল কল্পনাকে। মাছ খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক। তবে যাই বলুন, এ জিনিস চায়ের সঙ্গে বেমানান।'

তৃষা ধমকালো, 'থাক। চায়ের সঙ্গেই খাও।'

সুবীর বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। আজই প্রথম আলাপ। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল, যদি আপত্তি না থাকে—!'

কল্পনা বাধা দিল, 'তুমি মায়ের কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?'

'ওঃ! তা বটে।' সুবীর হতাশ হল।

ভদ্রলোক কৌতূহলী, 'ব্যাপারটা জানতে পারি?'

'আর বলবেন না। মা মদের গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। বলেছিলেন—খেতে হয় বাইরে গিয়ে খা, এই বাড়িতে কখনও খাবি না। প্রতিজ্ঞা কর।'

কাঁধ ঝাঁকালো সুবীর, 'মা নেই, তবু—।'

তৃষার স্বামী বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা অনুরোধ করছি। আজকের সন্ধেটা আমাদের ফ্ল্যাটেই আড্ডা মারুন।'

'না না। আপনাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

'বিন্দুমাত্র বিরক্ত হব না। বরং খুশি হব।'

সেই সন্ধেতে তৃষার ফ্ল্যাটে যেতে হয়েছিল সুবীরের সাথে। দামী স্কচের বোতল খুলেছিলেন ভদ্রলোক। সুবীরকে ওখানে রেখে কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসেছিল কল্পনা। ওকে দরজা অবদি এগিয়ে দিয়ে তৃষা নিচু গলায় বলেছিল, 'তুমি কিছু মনে করনি তো? ও যে ফট করে নেমন্তন্নই করে বসবে আমি বুঝতে পারিনি।'

কল্পনা মাথা নেড়েছিল, 'না না।'

ছ'মাসের মধ্যে পাঁচ কেজি ওজন কমে গেল কল্পনার। এখন জিমের সবার সঙ্গে তার ভাল পরিচয় হয়ে গিয়েছে। যে মহিলা ইনস্ট্রাক্টর কল্পনাকে গাইড করেন তিনি বললেন, 'আপনি দারুণ ইমপ্রুভ করছেন। গুড। এর সঙ্গে একটু ক্যারাটে শিখে নিন। এখানেই ক্যারাটের ক্লাস শুরু হচ্ছে।'

'ওসব শিখে কি হবে?'

'আপনার শরীর এখন আগের থেকে ঝরঝরে। এখানে যারা আসে তাদের অনেকেই খাওয়ার লোভটা কমাতে পারে না। আপনি পেরেছেন। এবার ক্যারাটে শিখলে আপনি যে কোন বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

বারংবার শোনার পর রাজি হয়ে গেল কল্পনা।

রাত্রে পান করে ফ্ল্যাটে ফিরে সুবীর নিজের মনে গজ গজ করছিল। এই সময় ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তবু কারণ না জিজ্ঞাসা করে পারল না কল্পনা।

আধাজড়ানো গলায় সুবীর বলল, 'পাশের ফ্ল্যাটে থাকে, মাঝে মাঝে স্কচ খাওয়ায় বলে এখন আমি লাস্টেজ নিতে চাইছে সম্পর্কটা এমন টাকা চাইতে অস্বস্তি হচ্ছে। আবার টাকা ছাড়া কাজটা করে দিলে কলিগরা ভাববে আমি একাই সব টাকা মেরে দিয়েছি। না টাকা চাইতেই হবে।'

'কি কাজ?'

'অ্যাঁ? ও। জাহাজে পাঁচশোটা ইতালিয়ান সু এসেছে। সব বাঁ পায়ের, ডান পায়ের কোন জুতো নেই। কেউ ছাড়াতে আসছে না। যার নামে এসেছে তার কোন অস্তিত্ব নেই। গোডাউনে পড়ে আছে ওগুলো। তোমার বান্ধবীর স্বামী চাইছেন ওগুলো আমরা নিলামে তুলি। এক পাটি জুতো কিনতে কেউ রাজি হবে না। উনি জলের দামে কিনবেন।'

'ওমা। কি করবেন শুধু বাঁ পায়ের জুতো কিনে?'

'জিজ্ঞাসা করলে হাসছেন, উত্তর দিচ্ছেন না। নিশ্চয়ই কোন বড় ধান্দা আছে। দুটো জুতো থাকলে হাজার দশেক দাম হত। দশ হাজার ইনটু পাঁচশো। ভাবো?'

দিন তিনেক বাদে আবার নেশার ঝোঁকে সুবীর বলল, 'শালা, পিঁপড়ের পেট টিপে মধু খাই আমি। যাবে কোথায়? নিলামে তুলে দিলাম পঞ্চাশ হাজার পেয়ে। একাই কিনে নিয়ে গেল লোকটা। মুখে বলল চামড়া কেটে দুজোড়া বানিয়ে নেবে। জলের দরে। পাঁচশ জুতোর চামড়া একশ টাকায় পেয়ে গেল।'

'তুমি ওদের কাছে টাকা নিয়েছ?'

'আলবৎ। কেন নেব না।'

'ছিঃ।'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সরে গেল সুবীর।

মাসখানেক বাদে আকণ্ঠ মদ খেয়ে ফিরে সুবীর চেঁচাবে। 'আমাকে ছি বলেছিলে এ্যাঁ? চেন্নাই পোর্টে পাঁচশো পাটি ডান পায়ের জুতো এনেছিল। সেম ব্যাপার। যার নামে এসেছিল তার অস্তিত্ব নেই। ওখানেও নিলাম হয়েছে। পার পিস একশো টাকায় কিনে নিয়ে গেছে একজন। আমাকে পঞ্চাশ দিয়েছিল ওখানে এক লাখ দিয়েছে। একই পার্টি। দুটো জুতো জুড়লেই দশ হাজারে বিক্রি করবে। শালা চীট। খুব দরদ দেখাও। আমাকে ছিঃ বলা হয়েছিল?' বলতে বলতে কল্পনার ডান হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল সুবীর। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল কল্পনা। নিজের অজান্তে সদ্য শেখা ক্যারাটে প্রয়োগ করল সে। সাথে সাথে ছিটকে দূরে পড়ে গিয়ে অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বিড় বিড় করল সুবীর, 'মেরো না, প্লিজ, মেরো না।'

ঘরে ফেরা দরকার

ছোট ভাই আলতাফ এসে বলল, 'আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একবার কালিগঞ্জে যাওয়া দরকার।'

ভাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো কিন্তু বন্ধুর মতো নয়। সামনে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না সে। মতিন এতে অভ্যস্ত। আজ সরাসরি যাওয়া দরকার বলায় সে একটু অবাক হল। প্রশ্ন করল, 'যাওয়া দরকার মানে?'

'আপনি অনেকদিন ওখানে যাননি।'

'হঠাৎ একথা?'

'হঠাৎ কেন হবে? ঢাকাতে ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না। প্রচুর ব্যাঙ্কলোন হয়ে আছে। তার সুদও ঠিকঠাক আমরা দিতে পারছি না। আপনাকে তো বলেছিলাম এবার গ্রামের দিকে তাকানো দরকার। আব্বা কিংবা আপনি গ্রাম থেকে শহরে এসেছিলেন ব্যবসা করতে। আমাদের ভাগ্যে তেমন কিছু হয়নি। তাই এখন গ্রাম নিয়ে ব্যবসা করলে সব ঠিক রক্ষা পেতে পারে।'

মতিনের মনে পড়ল। গত তিন চার মাস আলতাফ প্রায়ই কালিগঞ্জে যাচ্ছে। সেখানে পুকুর সংস্কার করে অথবা খুঁড়িয়ে মাছের চাষ করতে চায় তাতে নাকি প্রচুর লাভ।

দাদাকে চুপ করে থাকতে দেখে আলতাফ আবার বলল, 'ওখানে আমাদের প্রচুর জমিজমা আছে। কত আছে তার রেকর্ড আমার জানা নেই। সেসব উদ্ধার করে যদি ফিশারি, ডেয়ারি আর পোলট্রি করতে পারি তাহলে ব্যাঙ্কলোন শোধ করতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

মতিন বলল, 'মাছ অথবা ছাগলের ব্যবসা আমরা আগে করিনি।'

'গারমেন্টের বিজনেস কি আমরা কখনও করেছি?'

'ঠিক আছে। তুমি যাচ্ছ, তুমিই যাও।'

'না দাদা। আপনি না গেলে কিছু হবে না। আপনাকে ওখানে থাকতে হবে না, মাঝে মাঝে যাবেন। যা করার আমিই করব।'

'আমাকে যেতে হবে কেন?'

'ওখানকার লোকগুলো আপনার কথা নরম গলায় বলে। ওদের হাতে রাখা দরকার।'

'হুম!' মতিন মনে করার চেষ্টা করল। অনেককাল গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আব্বার ইন্তেকাল হওয়ার পর শেষবার গিয়েছিল। ছিল দু'দিন। তাও

অনেককাল হয়ে গেল। কারও মুখ স্পষ্ট মনে পড়ে না। কালিগঞ্জের বাড়ির পেছনে একটা বিশাল বিল আছে। দিগন্ত দেখা যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'বিলটা পড়ে আছে। ওখানে কিছু করতে পারো না? ওটা তো আমাদেরই বিল!'

আলতাফ হাসল, 'বিল এখন নামেই, এক ফোঁটা পানি নেই।'

'সেকি?' চমকে উঠল মতিন।

'হ্যাঁ, অনেকদিন কালিগঞ্জে যাওয়া হয়নি তাহলে। ঢাকা শহরে একবার বাস করতে আরম্ভ করলে বড্ড বেশি শেকড় গজিয়ে যায়। এখন কালিগঞ্জে নিকট সম্পর্কের কেউ নেই। বাড়িঘর, জমি পুকুর সব পড়ে আছে আশ্রিতদের তত্ত্বাবধানে।'

মতিন জন্মেছিল কালিগঞ্জেই। শৈশবও সেখানে কেটেছিল। পড়াশুনার সুবিধের জন্য আব্বা ঢাকায় বাসা নিয়েছিলেন। তারপর কাকরাইলে জমি কিনে বাড়ি তৈরি হল। মতিন ক্রমশ ঢাকার লোক হয়ে গেল। আব্বা জীবিত থাকাকালীন কালিগঞ্জের সব খবর পাওয়া যেত। তখন যাওয়ার সুবিধে ছিল না। প্রথমে ট্রেন পরে নৌকা। এখন সরাসরি গাড়িতে যাওয়া যায়। ব্রিজ হয়ে গেছে শীতলক্ষার ওপরে।

মতিনের স্ত্রী আধুনিকা। কালিগঞ্জের আবহাওয়া তার পছন্দ নয়। মায়ের পছন্দ পেয়েছে ছেলেমেয়েরা। কিন্তু আজ আলতাফের কথা শোনার পর থেকে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল মতিনের। বিলটা শুকিয়ে গিয়েছে এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল। আদিগন্ত বিস্তৃত বিল ছিল বাড়ির পেছনে। একবার আব্বার সঙ্গে বোনের শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল সে বিল পেরিয়ে। সেখানে দেরি হয়ে যাওয়ায় ফেরার সময় সন্ধে নামে। দুর্গাদাস নৌকো বাইছিল। সেই সময় ঝড় উঠল। বিলের ঢেউ সমুদ্রের চেহারা নিল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কোন কুলে তাদের বাড়ি বুঝতে না পেরে আব্বাকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল সে। হঠাৎ দুর্গাদাস চিৎকার করে অন্ধকারের আকাশ দেখ। বহুদূরে একটা আলো দুলছে। আব্বা বলেছিলেন বাড়ির কেউ শিমুল গাছে উঠে বাতি ধরেছে যাতে দুর্গাদাস দিক ভুল না করে। সেই বিল শুকিয়ে গেল এ কি রকম কথা!

আলতাফ গাড়ি চালাচ্ছিল। রিকন্ডিশন্ড জাপানি গাড়ি। তিন বছর বয়স হলেও ভালো ছোটে। মতিন বসে ছিল পাশে। তার অফিসে একটা বড় আড্ডা জমে। ঢাকার অনেক শিল্পী সাহিত্যিক সেই আড্ডায় হাজির থাকেন। ব্যবসাটা দেখে আলতাফই। অতএব ওর অনুরোধে একটা দিন আড্ডা কামাই করতে হল।

রাস্তা তো বেশ ভালো। রিক্সার উপদ্রব কম। ওই রিক্সার জন্য মতিন ঢাকাতে গাড়ি চালাতে চায় না। আজ ইচ্ছে হলেও ভাইকে স্টিয়ারিং ছাড়তে বলতে পারল না। বাল্যকালে ঢাকা থেকেও নৌকো চেপে গ্রামে যাওয়া যেত। তারপর ট্রেন এবং নৌকো। এখন নদীর ওপর ব্রিজ হয়েছে পথটাও ছোট হয়ে গেছে অনেক। ঠিক

আটান্ন মিনিট লাগল কালিগঞ্জে ঢুকতে। বাঁ দিকে তাঁতিপাড়া। শৈশবে ঘুম ভেঙে গেলে মাঝরাতেও তাঁতিপাড়া থেকে শখ ভেসে আসত। এখন মেশিনের আওয়াজ কানে এল। আলতাফ বলল, 'এরা এখন রকমারি তোয়ালে বানায়। ঢাকা থেকে এক্সপোর্ট হয়।'

'কামালচাচা এখনও বেঁচে আছে?'

'আছে। আগের বার দেখেছিলাম।'

'ডাক না একবার।'

গাড়ি থামাল আলতাফ। মাটির রাস্তা, পাশে বাঁশঝাড়, এঁদো পুকুর। বাঁ দিকে তাঁতিপাড়া। গাড়ি থেকে নেমে একটি বাচ্চাকে আলতাফ বলল কামালচাচাকে ডেকে দিতে।

গাড়িতে বসে মতিন দেখছিল বাড়িগুলো। একই রকম রয়েছে, শুধু আওয়াজটা আধুনিক হয়েছে। ওই কামালচাচা তাদের গামছা বুনে দিত, ছেলেটা ফিরে এসে বলল, 'তিনি নাই। গাজীপুরে আছেন।'

আলতাফ আবার গাড়ি চালু করল। একটু এগিয়ে বলল, 'বাঁ দিকের জমিগুলো নাকি আমাদের। এর আগের বার ইদ্রিশচাচা বলেছিল।'

'রেকর্ড নেই?'

'আমার কাছে নেই। আব্বা যদি রেখে গিয়ে থাকেন!'

'আমাকে কিছু দিয়ে যাননি।'

'এই বাড়িতে একটা আলমারি আছে তালা মারা। দুর্গাদাস বলে ওটা নাকি আব্বার আলমারি। আপনি কোনও দিন খুলে দেখেছেন?'

'না।'

সামনে বাজারমতো এলাকা। দশ বারো ঘর দোকান। ডানদিকে মসজিদ। এই মসজিদটার একটা ইতিহাস আছে। আগে এখানে বিশাল মাটির ঢিপি ছিল। বাচ্চারা খেলত। মতিনের ঠাকুরদা এই ঢিপি খুঁড়ে একটা বাড়ি আবিষ্কার করেন। পরে সেটাকে সংস্কার করে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। জমিটাও তাদের। মসজিদের পাশে বিশাল পুকুর। পুকুরের গায়ে ওদের পারিবারিক কারখানা। মতিন বলল, 'গাড়িটাকে এখানে একটু রাখ। গ্রামে ঢোকার আগে ঘুরে যাই।'

মসজিদের সামনে কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ বসে ছিলেন। প্রত্যেকের মাথায় টুপি এবং গালে দাড়ি। আলতাফকে দেখে সবাই অভিবাদন জানাতে লাগল। হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'আমাগো মতিন না?'

মতিন একটু লজ্জা পেল। বৃদ্ধকে সে চিনতে পারছে না। নিশ্চয়ই বাল্যকালে সুসম্পর্ক ছিল। সে বলল, 'এত ঝামেলায় থাকি যে সময় পাই না।'

'এসবই তো তোমাগো জমি জায়গা, এই দীঘি, কবরখানা, মসজিদ, সবই

তোমার আব্বায় করছিলেন। তিনি এখন নাই, এখনও এই কথাটা ভাবতে পারি না।' বৃদ্ধ এগিয়ে এসে মতিনের হাত ধরলেন। মতিনের এবার অস্বস্তি হচ্ছিল। বৃদ্ধের পরিচয় সে আলতাফকে আলাদা পেলে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারত। ও দেখল আলতাফ জুতো মোজা খুলছে। একজন ঘটি করে জল দিয়ে গেলে আলতাফ ওজু করে নিল। তারপর সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়াল আব্বার কবরস্থল।

মৌলবী সাহেব প্রার্থনা শুরু করলেন।

মতিন ভিড়ের মধ্যে হাত জোড় করে দাঁড়াল। সে মুসলমান, এই মুহূর্তে আলতাফ এবং অন্যান্যদের দুই হাত চিত করে আঁজলার মতো যেভাবে ধরে আছে তাই তার করা উচিত। কিন্তু আব্বার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সে বুকের ওপর নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত রাখাই সঙ্গত মনে করল।

হজ করে আসার পর আব্বাকে সে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'প্রার্থনার সময় ঠিক কোনভাবে হাত রাখা উচিত?'

আব্বা বলেছিলেন, 'যেভাবে তোমার মনে হবে আল্লাকে বেশি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে সেইভাবে।'

মতিনের কানে এল এক মৌলবী বলছেন, 'আমরা জানি না তিনি এখন কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন। শুধু জানি তুমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছ। তোমার পবিত্র স্নেহের ছায়ায় তিনি দিবারাত্র স্নান করছেন। দেশ থেকে কেউ যদি বিদেশে গমন করে তাহলে আমরা তার খবর টেলিফোনে, টেলিগ্রামে, চিঠিতে জানতে পারি। কিন্তু তিনি এমন স্থানে গমন করেছেন যে সেখানে এসব যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। অতএব তোমার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই। এই স্থানে মাটির নিচে তিনি এবং তাঁর মতো যাঁরা শায়িত তাঁদের প্রত্যেকেই তোমার অপার করুণা থেকে যেন বঞ্চিত না হয় আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা।'

মতিন প্রার্থনারতভাবে আলতাফকে দেখল। মৌলবীর শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁটও নড়ছে। আলতাফ অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। সে দিনে অন্তত তিনবার নামাজ পড়ে, প্রত্যেক বছর কঠোরভাবে রোজা পালন করে। এখন ওর চোখ বন্ধ। স্পষ্টতই তাদের আব্বার জন্য ও আল্লার কাছে যে প্রার্থনা করছে তাতে কোনও খাদ নেই। অনেকেই বলে আলতাফ নাকি খুব রাগী। কিন্তু তার সামনে কখনও আলতাফকে ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি।

প্রার্থনার পর মতিন আলতাফের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল, 'আব্বা এখানে একটা হাসপাতাল করেছিলেন না? ওটা ঠিকঠাক চলছে তো?'

'হাসপাতালটা আছে এই পর্যন্ত। এখন তো ওটা সরকার নিয়ে নিয়েছে।' আলতাফ জানাল।

'চল দেখে আসি।' মতিন এগোল।

সবাই তাদের দেখছিল। ছোট্ট হাসপাতাল বাড়িটা কাছেই। ওপরে সিমেন্টে লেখা, 'কালিগঞ্জের অসুস্থ মানুষদিগের সেবার জন্য হাজি খালেদ মোহম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।'

আলতাফ আগে হাসপাতালের বারান্দায় উঠে পড়েছিল। মতিন দেখল জনা-চারেক মানুষ আউটডোর লেখা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। প্যান্টশার্ট পরা যে লোকটি বেরিয়ে এলেন তাঁকে আলতাফ নিচু গলায় কিছু বলতেই তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম্।'

মতিন মাথা নেড়ে বলল, 'ওয়ালাইকুম্ আসসালাম্! আপনার হাসপাতাল কিরকম চলছে?'

'এই আর কি! আমি ডক্টর শফিকুল আহমেদ।'

'আমি মতিন। এই হাসপাতাল আমাদের আব্বা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন কি পেশেন্ট কম হয়? চারপাশে প্রচুর ধুলো দেখতে পাচ্ছি।' মতিন বলল।

'ঝাড়ুদারের শরীর খারাপ। পেশেন্ট মন্দ হয় না। সামনেই রোজা বলে বেশি ভর্তি করছি না।'

'আপনি কি এখানকার লোক?'

'না, না। সরকারি চাকরি করি, বদলি হয়ে এসেছি। এখন রাস্তাঘাট ভালো হয়ে গেছে। একটু ক্ষমতা থাকলে লোকে পেশেন্ট নিয়ে হয় গাজিপুর নয় ঢাকায় চলে যায়। লোকাল ডাক্তারের ওপর বাঙালি বেশি ভরসা করতে চায় না।' ডক্টর শফিকুল হাসলেন।

'হাসপাতালের যা হাল তাতে ভরসা করা মুশকিল।' মতিন বেরিয়ে গেল।

আব্বা চেয়েছিলেন মানুষের উপকার হোক। নৌকো, রেলে করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার আগে অনেক পেশেন্ট মারা যেত। গাজিপুরেও তখন হাসপাতাল তৈরি হয়নি। সেইসময় এই বাড়ি তৈরি করে ঢাকা থেকে স্বদেশি ডাক্তার আনিয়ে হাসপাতাল খুলেছিলেন তিনি। এক ফোঁটা ময়লা পড়ে থাকত না তখন। কিছু ওষুধ সরকারি অনুদানে পাওয়া যেত, বাকিটা আব্বা জোগাতেন। বিছানা দেখে ছেলেবেলায় মতিনের নিজেরই লোভ হত সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকতে।

আলতাফ গাড়ি আনতে চেয়েছিল। বাড়ি এখনও মিনিট পাঁচেকের পথ। হাজি সাহেব সেই যে রাস্তা করে গিয়েছিলেন তা এখনও অটুট আছে। আলতাফকে নিষেধ করল মতিন। হেঁটে গেলে ভালো লাগবে তার। অতএব আলতাফ গাড়ি নিয়ে চলে গেল আগে।

মোড়ে এসে দোকানপাট দেখল মতিন। একই রকম আছে। এখানে এখনও লাল নীল লজেঞ্চুস বয়ামে বিক্রির জন্য রাখা হয়। শৈশবে এগুলো স্বপ্নের বস্তু

ছিল। এর স্বাদ কিরকম ভুলেই গিয়েছে সে। সামনের দোকানটায় একটা বাচ্চা খালি গায়ে বসে। মতিন তার কাছে গিয়ে বলল, 'গোটা চারেক লজেঞ্চুস চাই। কত দিতে হবে?'

'এক টাকা।'

মতিনের মনে পড়ল তখন এক আনায় আটটা পাওয়া যেত। পকেটে একটা টাকা নেই। তাই দশটাকার নোটটা বাড়িয়ে দিলে ছেলেটা দুবার মাথা নাড়ল, 'খুচরা নাই।'

'রেখে দাও। যাওয়ার সময় নিয়ে যাব।' কাগজে মোড়া চারটে লজেঞ্চুস নিয়ে হাঁটা শুরু করল মতিন। একটা মুখে দিলে কিরকম হয়? স্বাদ বিলকুল ভুলে গিয়েছে সে। চোরের মতো একটা মুখে পুরে বাকিগুলো পকেটে ঢোকাল মতিন। ডান দিকে বাঁশঝাড় আর বাঁ দিকে খালের মতো জলাশয়। দূরে একটা বাড়ির মাথায় টিভির অ্যান্টেনা। অর্থাৎ এখানে ঢাকা টিভির অনুষ্ঠান আসে। অবশ্য এটা খবর নয়। কালিগঞ্জের মানুষ টিভি কেনার সামর্থ্য রাখে এখন। মনে আছে প্রথম যখন তার বাড়িতে রেডিও আসে তখন এই গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। দিনরাত লোক লেগেই থাকত শব্দ শোনার জন্য। যে বাড়িতে টিভি এসেছে তার অবস্থাটা কি!

জিভে বিশ্রী স্বাদ, ক্যাটকেটে চিনিতে শরীর গুলিয়ে উঠল মতিনের। এ শালা লজেন্স নয় লবেঞ্চুস। বাল্যকালে কি আনন্দ পেত এতে? মুখ থেকে বস্তুটা ফেলে দিল সে। ধুলোয় পড়ে অন্য আকৃতি নিয়ে নিল সেটা। শরীর গোলাচ্ছে মতিনের।

এখন সবে সকালের মেজাজটা কেটেছে। দূর থেকে ওদের বাড়িটাকে দেখতে পেল সে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে খুব ভুল হয়েছে। ইতিমধ্যেই জুতোর রং সাদাটে হয়ে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ এইসব আবেগ যে কেন আসে? বাড়ির মুখে ছোট্ট মসজিদের ওপর মাইক বসানো দেখল মতিন। তাদের বাল্যকালে ওই মাইকটি ছিল না। ডান দিকের মাঠে চৈত্র মাসে জাম্বুরা নিয়ে ফুটবল খেলত ওরা। ওর সঙ্গে কারা? হরিপদ, অবনী, রাজু, কাউসার। কোথায় গিয়েছে ওরা তা তার জানা নেই। চল্লিশ বছর হয়ে গেল। একসময় ওই বয়সের মানুষকে বৃদ্ধ বলে মনে হত কিন্তু পঞ্চাশে পা দিয়েও মতিনের নিজেকে বৃদ্ধ বলে কিছুতেই মনে হয় না। বন্ধুবান্ধবেরা সেরকম কথাও বলে না।

বাড়ির সামনে গাড়িটাকে রেখেছে আলতাফ। ভিড়টা তার গায়ে। জনা দশেক মানুষ অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এদের অনেককেই মতিন চিনতে পারছে। আব্বার কাজের সময় পুরনো পরিচয় ঝালাতে হয়েছিল, যদিও এখন তার ওপর আবার ধুলো পড়ে গিয়েছে।

ভিড়ের সামনে পৌঁছে মতিন হাসল, 'কেমন আছেন সবাই?'

সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সাল দেওয়া নাটকের অভিনেতাদের মতো একটা আওয়াজ একই সঙ্গে বেরিয়ে এল সবার মুখ থেকে। পৃথক করে শুনলে যার অর্থ হবে, আছি। একজন শুধু বলল, 'আসসালাম আলাইকুম।' মতিন বলল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

তারপর ওরা আর কথা বলল না। পঞ্চাশ থেকে আশির মধ্যে বয়স নিয়ে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে মতিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এদের অধিকাংশের ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত, পায়ে চটি নেই। প্রত্যেকের শরীরে একটি মিল, কারও মেদ নেই। চামড়া এবং হাড়ের দোস্তি বড্ড চোখে পড়ছে। এইসব মানুষেরা মতিনের পরলোকগত পিতৃদেব হাজি খালেদ মোহম্মদের আশ্রিত, এই পাকা বাড়ির আশেপাশে যত মাটির ঘর সেখানেই এরা থাকে। যারা মুসলমান তারা ফজর থেকে মাগরিব নমাজ পড়ে। যাদের আরও ধর্মভাব তারা এশাকেও বাদ দেয় না। এখানকার গাছপালা, আকাশ, বাতাস, পানির ওপর এদের অবাধ অধিকার। শুধু অন্ন পর্যাপ্ত নেই। নেই যে সেটা এদের চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

এইসময় পেছন থেকে আলতাফের গলা ভেসে এল, 'আরে! এরা যে সব পুতুল হয়ে গেল। একটা চেয়ার এনে দিন। অদ্ভুত লোক সব।' সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা প্রাণ ফিরে পেল যেন। ছুটাছুটি করে একের বদলে তিন তিনটে চেয়ার এনে বসাল আমতলায়। আলতাফ কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছন দিকটায়। তার কথাবার্তা এবং হাঁটাচলা এখন অন্যরকম। মানুষ কর্তৃত্বে থাকলে এরকম রুখো হতে পারে।

'আমারে চিনতে পারতেছেন ছায়েব?'

চেয়ারে বসে মতিন লোকটির দিকে তাকাল। না, সে চিনতে পারছে না। কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা কে জানে! সে বলল, 'হ্যাঁ, তবে...

'আমি কবির, দুলাভাই, মানে আপনার আব্বা আমারে জায়গা দিছিলেন।'

'ও। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি মাকে আপা বলতেন।'

'ঠিক। তিনি ছিলেন একেবারে দেবীর মতো। আঃ কি সব দিন ছিল তখন।'

দেবী শব্দটা এখনও এখানে ব্যবহৃত হয়? মতিনের মনে পড়ল ওর স্ত্রী রেগে গেলে কাজের লোককে লক্ষ্মীছাড়া বলে গালাগাল দেয়। এই কবিরকে সে চিনতে পারছে না এখনও। তবে আব্বাকে যে দুলাভাই বলত সে নিশ্চয়ই খুব দূরের নয়। তখন কি এর এই রকম দড়ির মতো চেহারা ছিল?

'আপনার শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে?'

'আর শরীর। আল্লার ইচ্ছা তাই এখনও বাইচ্যা আছি। কি খাইবেন কন? চা না ডাব?'

মতিন হাত নাড়ল, 'না না। আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না।'

কবির বলল, 'কন কি ছায়েব! আপনি হলেন গিয়া মেহমান। ডাবই আনি।' সে উঠল।

এই দুর্বল চেহারার বৃদ্ধ ডাব গাছে উঠবে নাকি! কিন্তু লোকটা ভিড়ের আড়ালে চলে গেল সট করে। এতক্ষণ কবির কথা বলছিল বলে অনেকেই মুখ খুলতে সুযোগ পাচ্ছিল না। দাড়িওয়ালা একজন এবার হাসল, 'আমারে চিনতে পারো?'

'করিমচাচা'—মতিনের মনে হল সে যেন ফুটবল ম্যাচে গোল দিয়ে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ পার্শ্ববর্তীদের উদ্দেশে মাথা নাড়ল, 'কী! আমি জানতাম ও আমারে চিনবে। এই করিমচাচার পিঠে পা রাইখ্যা আম গাছে উঠতা তুমি। এখন শুনি অনেক বড় হইছ। ঢাকায় নাম হইছে। আমি বলি তোমরা মতিসাহেব বল আর সার বল আমার কাছে সে মতিন।'

'নিশ্চয়ই।' মতিন হাসল। করিমচাচার অনেক কথা হুড়মুড়িয়ে আসছে মনে। আব্বার খুব প্রিয় ছিল এই করিমচাচা। আর মা দু'চক্ষে দেখতে পারত না। আব্বাকে লুকিয়ে লুকিয়ে আফিং এনে দিত লোকটা। মাঝে মধ্যে আফিং খাওয়ার শখ ছিল আব্বার। মায়ের অপছন্দ সেই কারণে।

'তোমার সেই উটটার কথা মনে পড়ে করিমচাচা?'

'জীবনে একবার তো উটের মাংস খাইছি। ভুলব ক্যামনে? তবে তুমি খুব কাঁদছিলা।'

'সেটা আপনার মনে আছে?'

ব্যাপারটা এইরকম। আব্বা একটা উট আনিয়েছিলেন। ঈদের সময় কুরবানি করবেন বলে তাকে ভাল খাওয়াবার দায়িত্ব ছিল করিমচাচার ওপর। মতিন তখন সাত বছরের বালক। করিমচাচার সঙ্গে ঘোরে আর উট দ্যাখে। অমন বদখত দেখতে প্রাণীটাও ধীরে ধীরে চোখ সওয়া হয়ে যাওয়ার পর ভাল হয়ে উঠল। আসলে মতিনের কথা শুনত উটটা। মতিন হাঁটতে বললে হাঁটত, মুখ নিচু করতে বললে সেটা করত। তারপর রোজার সময় এল। গ্রামসুদ্ধ মানুষ সেহরীর পর আর পানিস্পর্শ করে না। সারাদিন অভুক্ত থেকে মাগরিবের নমাজ পড়ে ইফতার করে। যদিও শিশু, অসুস্থ মানুষ, গর্ভবতী অথবা সদ্যপ্রসূতা এবং মুসাফিরদের রোজা করা বাধ্যতামূলক নয় তবু সাত বছর বয়সে মতিন প্রায়ই রোজায় থাকত। তার মাথায় হঠাৎ ঢুকল উটটা রোজা করছে না আর করিমভাই তাকে সেটা বোঝানো দূরের কথা প্রচুর খাওয়াচ্ছে। একদিন ফজরের পর মতিন এমনভাবে উটটার সঙ্গে লেগে রইল যাতে ও কিছু খেতে না পারে। করিমভাই তাকে যত বোঝায় আল্লা প্রাণীদের রোজা করতে নির্দেশ দেননি সে কানে নেয় না। তখন রেগেমেগে করিমভাই বলে

উটটাকে খাইয়ে মোটা না করলে ঈদের সময় ওর শরীরে মাংস জমবে না। এই নিয়ে খুব কান্নাকাটি শুরু করার পর আব্বা তাকে নিয়ে গিয়েছিল মাঠে। হাত তুলে গরু দেখিয়েছিল, তারা ঘাস খাচ্ছে। পাখিরা ফল ঠুকরাচ্ছে। যারা মানুষ নয় তাদের কাজকর্ম অন্য দিনের মত স্বাভাবিক। উটটাকে ওর মত থাকতে দেওয়া উচিত।

আজ এতদিন পরে ওই সব সরল কথা মনে আসতেই কি রকম বিষণ্ণ হয়ে গেল মতিন। সে নিজে কালেভদ্রে নমাজ পড়ে। বছরে ঈদের নমাজটা যা পড়া হয়। রোজার সময় রাস্তায় সিগারেট খায় না। কিন্তু নিজের অফিসঘরে বসে সিগারেট চা ঘনঘন ওড়ায়। এখন ঢাকায় অনেকেই রোজা রাখেন না এবং এটাকে অন্যায় বলে মনেও করেন না। মতিন নিজেকে অধার্মিক বলে কখনই মনে করে না।

'করিমচাচা! এখন আপনার অবস্থা কি রকম?'

'আছি এই পর্যন্ত। আল্লা যত দিন রাখবেন থাকব।'

'আপনার ছেলে মেয়ে?'

করিমচাচা আকাশের দিকে তাকাল। তারপর চোখের জল মোছার চেষ্টা করল।

প্রশ্ন করতে গিয়েও সামলে নিল মতিন। যেচে কারও দুঃখের কথা শুনে বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ কি! এইসময় কবির ডাব নিয়ে এল। কচি ডাব! এইসব শুকনো মুখগুলির সামনে বসে ডাবের জল খেতে তেমন ভাল লাগল না।

এইসময় তৃতীয় বৃদ্ধ খোলা গলায় বলল, 'বড়ো সাহেবের সঙ্গে কত মিল।'

সবাই মাথা নাড়তে লাগল কথাটায় সায় দিয়ে।

বৃদ্ধ আবার বলল, 'আমারে তুমি চিনতে পারো নাই।'

চুপসে যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে মতিনের স্মৃতি কোনও কাজ করল না।

'আমি যতীন। যতীন কৈবর্ত। মনে পড়ে?'

'আশ্চর্য! তুমি যতীনদাদা? কি চেহারা করে ফেলেছ?'

'আমি কি করছি। ভগবানের মার সাহেব, ভগবানের মার।'

'কি কর তুমি এখন?'

'কিছু না। বইস্যা বইস্যা খাই। আমার ছোট ছেলে গাজীপুরের দোকানে কাজ করে, মেয়েটা ঢাকার গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে যায়। ওরা টাকা দিলে পেটে ভাত পড়ে, না দিলে না।'

'এখন আর মাছ ধরো না?'

'মাছ কোথায় যে ধরব। বিল তো এখন বালুর চর। বাড়ির পুকুরগুলোয় হাত দেওয়া তিন মাস হইল নিষেধ। মাছও তেমন নাই।'

'নিষেধ কেন?'

এ ওর মুখের পানে চাইতে লাগল। কিন্তু কথা বলে না কেউ। মতিন বুঝল সত্যি কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছে এরা। যৌবনে যতীন মাছ ধরত বলে বলে। কয় সের মাছ চাই সাহেব? দশ? জাল নিয়ে নেমে যেত পুকুরে। তারপরই দেখা যেত প্রায় সেই ওজনের মাছ ওর জালে। লড়াই করে খেলিয়ে তুলতে হিমসিম খেলেও জয় হত শেষ পর্যন্ত ওরই।

'আপনারা আমাকে নির্ভয়ে বলুন।'

এবার করিমচাচা কথা বলল, 'বড়সাহেব আমাদের জমি ঘর দিয়ে বলছিলেন নেমকহারামি করিস না কখনও। আমরা আজ পর্যন্ত সেটা করি নাই। তোমরা কেউ আসো না তবু এই বাড়িতে ধুলো জমতে দিই নাই আমরা। মাঠে লাঙল দিয়া যা উঠত তাই সবাই খাইত। পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরলে সেটা ভাগ হইত। আমরা সবাই জানি বড়সাহেবের জিনিস এগুলো আর আমরা হলাম পাহারাদার। কিন্তু—।'

'কিন্তু কি?'

'না, সাহেব। এটা বলা ঠিক না।'

হঠাৎ কবির বলে ফেলল, 'আলতাফ ছায়েবকে সবাই এখানে ভয় পায়।'

মতিন অবাক, 'আলতাফকে ভয় পায়। কি কাণ্ড? সে কি করল?'

কবির বলল, 'তিনি নিষেধ করেছেন পুকুরের পানিতে হাত দিতে। সামনের চাষের মরশুমের আগে তিনি স্থির করবেন চাষ হবে কিনা। কখনও তো কেউ আসতো না, হঠাৎ তিনি আসা যাওয়া শুরু করেছেন।'

'আপনারা ওর কাছে মাছ ধরার অনুমতি চাননি?'

'সাহস হয় নাই। ছোটছায়েব খুব রাগী মানুষ। এখানকার ইউনিয়ন পরিষদের নুরুউদ্দিন ভাই পর্যন্ত ওনারে ভয় পায়। তারে তো একবার বন্দুক দিয়া খতম কইর‍্যা ফেলত। সবাই বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করে।'

আলতাফের মাথা অল্পে গরম হয়ে যায় এখবর মতিনের অজানা নয়। কিন্তু সে কখনও তার সামনে বেয়াদপি দেখায়নি। এখানে আসা যাওয়া শুরু করার পর আলতাফ যে এমন কাণ্ড করে রেখেছে তা কে জানত। ওইটুকুনি ছেলে বন্দুক নিয়ে এখানে আসে নাকি। বন্দুক অবশ্য আব্বারও ছিল। মাঝে মধ্যে পাখি মারার কাজ ছাড়া সেটাকে ব্যবহৃত হতে দেখেছে বলে মতিনের মনে পড়ে না। একাত্তর সালের পর আব্বা সেটাকে থানায় জমা করে দিয়েছিলেন।

মতিন উঠে দাঁড়ালো। এইসব মানুজন আজ কোনও মতে বেঁচে আছে। অভাব এদের নিত্য সঙ্গী। অথচ এরা তার আব্বার আশ্রিত ছিল। আব্বার সঙ্গে যারা কখনও নিমকহারামি করেনি তাদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করার সাহস আলতাফ পায় কি করে?

এবার করিমচাচা এগিয়ে এল সামনে, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বলুন।'

করিমচাচা আশেপাশের মুখং লোর দিকে তাকাল, 'ঠিক আছে, যাওয়ার আগে বলব।'

মতিন মাথা নাড়ল। সে দেখতে পেল আলতাফ কয়েকজনকে কিছু বোঝাতে বোঝাতে এদিকে আসছে। এখন ওকে দেখতে অন্যরকম লাগছে। খুব বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের চেহারা যেরকম হয়। যতদূর মনে হয় আজও সঙ্গে বন্দুক আনেনি। বন্দুক গাড়িতে থাকলে মতিন দেখতে পেত। তাহলে কি ওর সঙ্গে রিভলভার আছে। আলতাফ রিভলভার নিয়ে এখানে আসে? এটা তো এক কালে স্বৈরাচারী জমিদারেরা করত।

আলতাফ সামনে এসে দাঁড়াল, 'আপনি এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন? চলুন, একটু বিশ্রাম করে সব ঘুরে দেখবেন।' জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে আলতাফ পাশের পাকাবাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল। মতিনের মনে হল আলতাফ ঢাকায় তার সঙ্গে এভাবে কথা বলে না। এখন ওর ইচ্ছেটা অনায়াসে তার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। প্রতিবাদের ইচ্ছে হলেও এত মানুষের সামনে সেটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না ভেবেই তিনি মতিন বাড়িটাতে ঢুকল।

সদ্য রং করা হয়েছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। একটা সুন্দর বিছানা, টেবিল চেয়ার এবং সোফা। বাথরুম লাগোয়া। আলতাফ বলল, 'আব্বা এ ঘরে থাকতেন। আপনি এখানে এলে যাতে অসুবিধে না হয় তাই ঠিকঠাক করিয়ে রেখেছি।'

'ভাল, খুব ভাল।' মতিন চেয়ারে বসল।

'এরা কি বলল আপনাকে?'

'সাধারণ কথাবার্তা। পুরনো দিনের পরিচয় নিয়ে আলাপ সালাপ।'

'শয়তানের দল সব। মিষ্টি কথা বললে পেয়ে বসে। আমি ঢাকায় জন্মেছি, ওখানে বড় হয়েছি বলে আমার সঙ্গে সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার করতে পারে না কিন্তু আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চেষ্টা করবে।'

'শয়তান বলছ কেন?'

'বলব না? আমাদের জমিতে চাষ করছে সারা জীবন, ফসল ভোগ করছে নিজেরাই। পুকুরগুলো শুষে মাছ তুলে নিয়েছে। যখন আসতাম তখন ওসব করত, আমাদেরও দোষ ছিল এসে দেখিনি কিছু। কিন্তু আমি আসাযাওয়া শুরু করার পরও একই কাণ্ড? ওই যে জানলা দিয়ে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে তিনশো রুই-এর বাচ্চা ছেড়েছিলাম। বলে গেলাম কেউ যেন জাল বা ছিপ না ফেলে। দুমাস পরে পরীক্ষা করে দেখলাম মাত্র কুড়িটা মাছ পুকুরে আছে। ভাল গলায় জিজ্ঞাসা করতে এমন ভান করল যেন কেউ কিছুই জানে না। তখন রাগ দেখালাম। গরমের মুখে পড়ে বলে ইউনিয়ন পরিষদের নুরুউদ্দিন সব জানে। সে

নাকি জাল দিয়েছিল। নুরুউদ্দিনকে ডেকে শাসাতে সে স্বীকার করল এদের দিয়েই কাজটা করিয়েছে। আর দেখুন কথায় কথায় আব্বার সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিল, আব্বা কত ভালবাসত সেই কাহিনী বলে সিমপ্যাথি কাড়তে চায়।'

আলতাফের গলা চড়ছিল। এই গলায় সে মতিনের সঙ্গে কখনই কথা বলে না। তার কথাগুলোকে অস্বীকারও করা যাচ্ছে না। এতদিন ধারণা ছিল মানুষগুলো গরিব কিন্তু অসৎ নয়। এখন সেই হিসেব মিলছে না।

মতিন সিগারেট ধরাল, 'আসলে আব্বার সম্পত্তি ভোগ করে করে ওদের একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছিল।'

'আব্বার সময় কি হয়েছিল তা আর ভাবার দরকার নেই। ঢাকায় আমাদের ব্যবসা ভাল যাচ্ছে না। ব্যাঙ্কঋণ শোধ করতে পারছি না বলে সুদ বেড়ে চলেছে। অথচ আমরা তো টাকা রোজগারের জন্যেই শহরে গিয়েছিলাম। শহরের দেনা মেটাতে এখন গ্রামকে ব্যবহার করব।' আলতাফ বলল।

মতিনের মনে হল এর অনেকটাই তার উদ্দেশে বলা। ব্যবসা সে করে কিন্তু যাকে বলে প্রকৃত ব্যবসায়ী তা সে নয়। হলে ব্যাঙ্কের ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারত। সেকথাটার প্রতিবাদ না করে বলল, 'এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?'

'হ্যাঁ'। পকেট থেকে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করল আলতাফ, 'দেখুন এই হল আমাদের বাড়ি আর মসজিদ। এই ঘরটায় আমরা আছি। বাড়ির পাশে এটা হল এক নম্বর পুকুর। পিছনে দুটো বড় পুকুর পাশাপাশি। পুকুরের পর নিচু বিলের জমি। বিল তো শুকনো। বিলের তিনটে দিকে বাঁধ দিলেই এক একটা পুকুর তৈরি হয়ে যাবে। ওখানে ইতিমধ্যে আমি দুটো পুকুরের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তার মানে এখন আমাদের বাড়ির গায়েই পাঁচ খানা পুকুর। এই পুকুরে যদি আমি সিঙ্গাপুরী মাগুর, তেলাপিয়া, রুই ছাড়ি তাহলে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে দশ থেকে কুড়ি গুণ টাকার মাছ তৈরি হয়ে যাবে। ধরুন পাঁচ পুকুরে কুড়ি হাজার টাকার মাছ অ্যাভারেজে পাঁচ মাসে প্রায় তিন লাখ টাকা রিটার্ন দেবে। বছরে দুবার এটা করব। ছয় লাখ ঘরে আসবে। পুকুর তো পড়ে আছে। এটা করতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই?'

মতিন বলল, 'তুই যেভাবে অঙ্কটা বলছিস সেটা শেষ পর্যন্ত মিলবে?'

'আমি আপনাকে কম করে বললাম।' আলতাফ অনেকক্ষণ পরে হাসল।

'কিন্তু তুই তো বললি চুরি হয়ে গিয়েছে।'

'আর হবে না। এরা সবাই বুঝে গিয়েছে আমি যা বলি তাই করি। কেউ অন্যায় করলে তাকে দয়া, মায়া, মমতা দেখাই না। এখন এরা আমাকে ভয় পাচ্ছে। চুরি করতে সাহস পাবে না।'

'কিন্তু [illegible] দেখিয়ে কতদিন কাজ হয়?'

'এদের এখানে হবে। সপ্তাহে দু'দিন আসব আমি। আপনি মাসে আসুন।'

'হুম।'

'তারপর, এই দেখুন, মোটামুটি যে চাষের খবর আমি পেয়েছি তাতে ঠিকঠাক লাঙল দিলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। তবু সব জমি কোথায় কিভাবে আছে তা আমার জানা নেই। আব্বা আপনাকে কিছু বলতেন না?'

'না, সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না।'

'ওই তো মুশকিল। আমি তখন ছোট ছিলাম। আপনাকে বলে গেলে আজ এত প্রব্লেম হত না। ওই যে, ওইটে হল আব্বার আলমারি। কি আছে ওর ভেতর আমি জানি না। আজ আপনি একটু খুলে দেখুন।' আলতাফ ঘরের এককোণে জোড়া বড় কাঠের আলমারিটাকে দেখাল।

আব্বার এই আলমারিটা মতিনের চেনা। ওখানে কারো হাত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আলমারির গায়ে একটা বড় তালা ঝুলছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'তালাটা খুলব কি করে?'

'চাবি যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন ভেঙে দেখতে হবে।'

'এখানে তালা খোলার লোক পাওয়া যাবে না?'

আলতাফ হাসল, 'ঢাকার রাস্তায় যারা চাবির তোড়া নিয়ে ঘোরে তারা এখানে নেই। যে খুলতে পারত সে ছয় মাস হল জেলে। আমি খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে। চল, বাড়িটাকে ঘুরে দেখি আগে।' মতিন দরজার দিকে এগোল।

ঘাস কম, লালমাটি এখন শক্ত। বাড়ি তৈরি হয় এই মাটিতেই। সিমেন্টের চেয়ে শক্ত হয়ে বসে। ডানদিকের পুকুরে এখনই অনেক ছায়া। পাশে দাঁড়িয়ে আলতাফ বলল, 'সব মাছ তুলে নিয়েছে ওরা।'

'নিষেধ যখন করেছিস তখন আর করবে না।'

'আমার বিশ্বাস নেই।'

মতিন আর একটু এগোতেই চমকে উঠল। বিল কোথায়? ধু ধু করছে একটা মরা মাঠ। নিচু সেই মাঠে আগাছার মত কিছু জন্মেছে। দূর, বহুদূরে দু-একটা গাছের আভাস। সে বলে উঠল, 'আমাদের বিলের এখন এই অবস্থা?'

'হ্যাঁ।'

'নদীতে পানি কমে যাওয়ায় বিলে পানি জমে না?'

মতিনের প্রশ্ন শুনে আলতাফ খানিকটা দূরে দাঁড়ানো জনতার দিকে তাকাল। এরা তাদের অনুসরণ করে আসছে। আলতাফ হাত নাড়ল, 'অ্যাই ভোলা! এদিকে আয়।'

যে লোকটি এগিয়ে এল তার চেহারা এদের সঙ্গে মেলে না। চওড়া কাঁধ, মুখে কাটা দাগ, শরীরের গঠনটিও মজবুত। পরনে টেরিলিনের পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি।

'বলেন সার।' ভোলা সামনে এসে দাঁড়াল।

'বর্ষাকালে বিলে পানি হয়?'

'হয় তবে নৌকা ভাসানো যায় না।'

'কেন?'

'হাঁটু তক ওঠে না।'

'সর্বনাশ।' মতিন বলল, 'এককালে সমুদ্র বলে মনে হত। দুর্গাদাসদা ছাড়া কারও হিম্মত ছিল না বর্ষায় ওপারে যাওয়ার। এখন দেখলে সেটা অবাস্তব বলে মনে হবে।'

'এই ভোলাকে চিনতে পারছেন?'

মতিন আবার লোকটার দিকে তাকাল। এখানকার মানুষগুলোর সঙ্গে চেহারায় কোনও মিল নেই। বোঝাই যায় বেশ শাঁসে জলে আছে। সে মাথা নেড়ে না বলল।

'আমার বাপের নাম দুর্গাদাস।' ভোলা হাসল।

'তাই নাকি? আরে, কি কাণ্ড।' মতিন আরও অবাক।

আলতাফ বলল, 'ওর হিস্ট্রি চমৎকার। ডাকাতি করত। এদিকে ওর ভয়ে সবাই কাঁপত। অ্যাই, তুই বল না নিজের মুখে। আমি একটু ঘুরে আসছি।'

আলতাফ যেদিকে গেল সেদিক থেকে শীর্ণ চেহারার একজন আসছিল। আলতাফ তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

'তুমি ডাকাতি করতে?' মতিন ভোলার দিকে তাকাল।

'ওসব অনেকদিন আগের কথা সার। অল্প বয়সে খারাপ পাল্লায় পড়েছিলাম।'

ভোলা লজ্জা পেল যেন।

'কদ্দিন করেছ ওসব?'

'আট দশ বছর। তখন এই বিল ভরা থাকত।'

'এই বিলেই ডাকাতি করতে?'

'ডাকাতির জন্যে এর চেয়ে আর ভালো জায়গা কোথায় স্যার। বাপের কাছে নৌকা চালানো শিখেছিলাম ভালো। তখন বলছিলেন না বর্ষায় বাপ ছাড়া কেউ ওপারে যেতে পারত না। আপনি তো আমাকে দ্যাখেননি। একা দু-দুটো নৌকা নিয়ে পার হয়েছি।'

'একা দু-দুটো নৌকা মানে?'

'এই ডাকাতির পর মানুষদের জলে ফেলে দিলে নৌকাটাকে আমাকেই নিয়ে যেতে হত।'

'তোমার বাবা এসব জানত?'

'হুম। বুড়ো সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা বলে না।'

'দুর্গাদাস কেমন আছে?'

'আছে। ওই হিন্দুপাড়ায় থাকে।' ডানদিকে কিছুটা দূরে গাছগাছালির মধ্যে মাটির ঘরগুলোকে দেখাল ভোলা, 'বড় সাহেবকে যেদিন কবর দেওয়ার জন্য আপনারা এখানে আনলেন সেদিন একটা ষাঁড় ওকে এমন গোঁতায় যে তিন দিন হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে ছিল। জ্ঞান হবার পর তার একটাই আফসোস, কবরে যাওয়ার সময় বড় সাহেবের মুখ দেখতে পায়নি।'

'তুমি কি এখনও ডাকাতি কর?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ভোলা। 'না-স্যার। ওসব অনেককাল ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি কালিগঞ্জে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য।'

'কি করে হল ব্যাপারটা?'

'আমার স্টোরি কেউ যদি লিখত তা হলে সেটা বায়োস্কোপ হয়ে যেত।'

'তুমি বায়োস্কোপ শব্দটা দেখছি জান।'

'ছেলেবেলায় শুনতাম। সিনেমা বললে ফুড়ুত করে শেষ হয়ে যায়। বায়োস্কোপ অনেক ভারী।' ভোলা হাসল। মতিন দেখল দু'টো লোক বাড়ির দিক থেকে দু'খানা চেয়ার মাথায় নিয়ে এদিকে আসছে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে বিলের বাঁধের ধারে গাছের ছায়ায়। লোক দু'টো সেখানে চেয়ার পেতে দিতেই ভোলা বলল, 'বসুন স্যার। বিলে পানি নেই, কিন্তু হাওয়া আছে, আরাম হবে।'

এরকম খোলা আকাশের নিচে গাছের ছায়ায় ভর দুপুরে চেয়ার পেতে বসলে যে কি আরাম তা ভাল করে অনুভব করতে পারছিল না মতিন ভোলা সামনে দাঁড়িয়ে থাকায়।

সে চেয়ারে বসে বলল, 'দুর্গাদাস বিলের ডাকাতদের যম ছিল। কত ডাকাত যে সে ধরেছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার দারোগাবাবু তাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। তার ছেলে হয়ে তুমি এই বিলে ডাকাতি করে বেড়াতে এ আমি ভাবতে পারছি না।'

'সার। অতীতে অন্যায় করেছি বলেই এখন মানুষের ভাল করার চেষ্টা করি। বাপের তো নৌকা ছাড়া কিছু ছিল না। বড় সাহেবের দয়ায় সংসার চলত। আমার বুনের বিয়ার ঠিক হল মুন্সিগঞ্জের কালু কৈবর্তের ছেলের সঙ্গে। বিয়ের দিন এসে তারা দু হাজার টাকা নগদ চাইল। বাবা অনেক অনুরোধ করেছিল, পা ধরেছিল তবু দেড় হাজারের নিচে নামল না কালু। তখন বড় সাহেব ঢাকায়। হাত পাতার মত কেউ নেই। কালু বিয়েবাড়ি থেকে ছেলে তুলে নিয়ে মুন্সিগঞ্জে ধাওয়া হতেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল। বাপের নৌকো নিয়ে পেছনে রওনা করলাম। তিন নৌকোয় লোক এসেছিল। তখন সন্ধ্যারাত পার হয়ে গিয়েছিল। কালুর নৌকোয় লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়লাম মাঝ বিলে। ওরা ভাবল ডাকাত। বাকি দুটো পালাল

যে যেদিকে পারে। কালুকে জলে ডোবালাম, ছেলেটাকেও। ঠিক তখনই আর একটা নৌকো আমাদের ওপর চড়াও হল। কালুর নৌকোর মালপত্র তুলে নিয়ে আমাকেও বেঁধে ফেলল তারা। আব্বাস ডাকাতের তখন খুব নাম। সে ভেবেছিল আমি তার এলাকায় ডাকাতি করছি। কিন্তু সব শুনে সে বলল, 'যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে কিন্তু তোমাকে বাবা এখন থেকে নৌকায় থাকতে হবে। এই হরেন মৃধা, এর শালা ডাকাতিতে মন নাই, এরে গ্রামে নিয়ে যাও। বুনের সঙ্গে বিয়া দাও আজই। ছেলেটা ভাল। এরে ত্যাগ করতেছি, তোমারে চাই।' ভোলা হাসল. 'ব্যস! ওই শুরু হয়ে গেল। আমার বুন লগ্নভ্রষ্টা হল না বলে বাবা খুশি হয়েছিল। হরেন তাকে নিয়ে গিয়েছে নিজের বাড়িতে। কিন্তু পরে যখন বাপ জানতে পারে ও একসময় আব্বাসের দলে ছিল তখন থেকে আর মুখ দেখে না। বুনও আর বাপের কাছে আসতে পারে না। না পারুক, কিন্তু ওরা সুখে আছে। আমার ওপর তার কোনও রাগ নেই। হরেন এখন মুদির দোকান চালায়।'

'তোমাকে কখনও পুলিশ ধরেনি?'

'তিনবার। দু'বার তারা ধরেছিল। ছয় মাস আর দেড় বছর জেল হয়। থার্ড টাইম আমি নিজে ধরা দিই। আড়াই বছর জেলে ছিলাম। সেই শেষ।'

'নিজে ধরা দিয়েছিলে কেন?'

'তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। খানসেনারা নেই। শেখ সাহেব অল্পদিন হয় ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু দেশে শান্তি হয়নি। যে যেভাবে পারে কামাই করে নিচ্ছে। সেই সময় আতাউর হোসেন সাহেব খুন হন। কে খুন করে কেউ দ্যাখে নি। আতাউর হোসেন সাহেবকে মানুষ খুব শ্রদ্ধা করত। ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন তিনি। আওয়ামি লিগ করতেন। যুদ্ধের সময় আমাদের বলেছিলেন, তোরা ডাকাতি করিস আর যাই করিস দিনে দুবার জয়বাংলা বলবি। বাংলা মা এখন বিপদে, খানসেনারা তার ওপর অত্যাচার করছে, ওদের সাহায্য করিস না। আমি কথাটা শুনেছিলাম।

সেই মানুষ স্বাধীনতার পর খুন হয়ে গেল কিন্তু পুলিশ কাউকে ধরতে পারল না। আমি খবর নিতে লাগলাম। পুলিশ যা পারে না তা আমরা অনেক সময় পারি। লোকটাকে খুঁজে বের করতে দেরি হল না। সে এমন চালাক যে কোনও প্রমাণ রাখেনি। কোনও মামলা টিকবে না। আমি নিজেই লোকটাকে খুন করলাম। পুলিশ আমাকেও ধরতে পারল না। রাজাকারটাকে খুন করে মনে হল ভাল কাজ করেছি, তাই নিজেই ধরা দিলাম। সাক্ষীর অভাবে আমার অল্পদিন জেল হল। জেল খেটে বেরিয়ে এসে সেই যে ডাকাতি ছাড়লাম আর ও পথে যাইনি। এখন মানুষের জন্যে কাজ করি।'

'তুমি নিজে কত খুন করেছ?'

'হিসেব করিনি। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় কত খানসেনা মেরেছি তার ইয়ত্তা নেই। তাদের কাটা মুণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলেছি।'

'সেকি?'

'চমকাচ্ছেন কেন। শালারা আমাদের দেশে যে অত্যাচার করেছে তার তুলনায় আমি তো কিছুই করিনি। রাত্রে নৌকো বাইতাম মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করব বলে। তারা যেসব গল্প বলত তা শুনে রক্ত গরম হয়ে যেত। দিনে একটা খানসেনা খুন না করলে আমি ঘুমোতে পারতাম না। ওই যে ছোট সারের সঙ্গে যিনি কথা বলছেন, মুজিব ভাই, উনি সব জানেন।' ভোলা বলল।

'উনি কে?'

'মুজিবভাই-এর নাম শোনেননি? ফ্রিডম ফাইটার।'

'এখন কি করেন?'

'কিছু না। ছাত্র পড়ান। দশ বিশ যা পান তাই দিয়ে চলে। অথচ উনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে সাংসদ নির্বাচিত হতে পারতেন। তামাম মানুষ ভোট দিত ওঁকে।'

ভোলা যখন একথা বলছিল তখন ওদিকে উত্তেজনা দেখা গেল। আলতাফই উত্তেজিত, তাকে চিৎকার করে বলতে শোনা গেল, 'আমার ব্যাপারে আপনি নাক গলাবেন না। আমার বাড়ি, আমার ব্যবসা, আমি যেমন ভাল বুঝি সেভাবেই বানাব।'

ভদ্রলোক নিচু গলায় কি বললেন তা এতদূর থেকে বোঝা গেল না।

মতিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আলতাফ।' তার গলা উঁচুতে উঠল।

ভোলা বলল, 'ছোট সারকে ঠাণ্ডা হতে বলুন সার।'

'এই মাত্র আপনার পরিচয় পেলাম। কোন বাড়ি আপনার?'

'এই বড় রাস্তার ওধারে। বাড়ি বলা উচিত নয়, মাথা গোঁজা যায় আর কি! আপনি ঢাকায় থাকেন তাই এতকাল যোগাযোগ হয়নি। আমিও একটু অলস।'

মুজিবর হাসলেন। শীর্ণ চেহারা হলেও প্রৌঢ় মানুষটির মুখে নম্র ছাপ আছে।

মতিন আলতাফকে জিজ্ঞাসা করল, 'চেঁচাচ্ছিলি কেন?'

'কি বলব? আমরা পয়সা খরচ করে ব্যবসা করছি। এখানে দান করতে তো আসিনি। আর ইনি সেই কথাটা বুঝতে পারছেন না।' আলতাফ বলল।

'ব্যাপারটা কি হয়েছে?'

মুজিবর বললেন, 'ব্যাপারটা খুব সাধারণ, আমি বলছি। আপনার আব্বা এখানে কিছু পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন যাদের এখন কিছু করে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। এতদিন তারা আপনাদের সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে কোনমতে

বেঁচে ছিল। আমরা বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। খান সেনাদের তাড়াতে পেরেছি কিন্তু অভাবকে পারিনি। উনি মাস তিনেক আগে এসে হুকুম করেছেন কেউ যেন জমি বা পুকুরে হাত না দেয়। এটা বলার অধিকার ওঁর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমি এই সঙ্গে মানবিক দিকটা ভেবে দেখার অনুরোধ করছিলাম।'

মতিন হাত তুলে মুজিবরকে থামিয়ে বলল, 'দেখুন, আব্বার সময়টার সঙ্গে এখন কোনও মিল নেই। তখন যা সম্ভব হত এখন সেটা অবাস্তব। ওঁরা তো অনেক দিন আমাদের সম্পত্তি ভোগ করেছেন আমরা কিছু বলার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু এখন আমাদেরই অর্থের প্রয়োজন। আমরা ব্যবসা করতে চাই এখানে। আর সেই প্রয়োজনেই পুকুরগুলো দরকার। আপনি নিশ্চয়ই সমস্যাটা বুঝতে পারছেন।'

'পারছি। কিন্তু এতকাল যারা আপনাদের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে এল তাদের প্রতি আপনাদের কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।'

'উচিত। আমার ক্ষমতা নেই এতগুলো পরিবারকে বসিয়ে খাওয়ানোর।'

'আমি সেকথা বলছি না। আপনারা ওদের ব্যবসার কাজে লাগান।'

'কিছু মানুষকে নিশ্চয়ই কাজ দেওয়া হবে।'

'কিন্তু আপনার ভাই বলছেন যে ওদের তিনি বিশ্বাস করেন না। দরকার হলে ঢাকা থেকে কর্মচারী নিয়ে আসবেন। আমার আপত্তি এখানেই।' মুজিবর বললেন।

'আপনি আপত্তি করার কে?' ফস করে জিজ্ঞাসা করে আলতাফ।

মুজিবর বললেন, 'আমি আপনাদের প্রতিবেশী। এই মানুষগুলোকে অনেকদিন থেকে চিনি। যেহেতু এদের ভাল হলে আমার ভাল লাগে তাই—।'

আলতাফ বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকাল। মুজিবরকে উপেক্ষা করে দূরে দাঁড়ানো একজনকে হুকুম করল, 'হাত জাল নিয়ে আয়। একটা রুই ধরতে হবে।' লোকটা দৌড়ে চলে যেতেই মুজিবরের দিকে ঘুরে বলল, 'ওই পুকুর ভর্তি মাছ ছিল। সেসব যখন চুরি হয়ে যায় তখন আপনি কোথায় ছিলেন? ব্যবসা করতে গিয়ে কখন কাকে দিয়ে আমরা কাজ করাব সেটা আমরাই ঠিক করব।'

'একশোবার করবেন। আমি শুধু আমার আপত্তিটা জানিয়েছি। আর একটা কথা—।'

'বলে ফেলুন।' আলতাফ যেন কথা শেষ করতে চায়।

'আপনি তো এখানকারই ছেলে। সবাই আপনার আব্বাকে দেখেছে, আপনার আম্মাও এদের পরিচিত। তাই এদের কাছে আসার সময় রিভলভার নিয়ে আসার কোনও প্রয়োজন নেই। ওটা আপনি বহন করবেন না। মানুষকে অকারণে ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হয় না। ওদের সঙ্গে তো সেই সম্পর্কও আপনাদের নয়।' মুজিবর হাসলেন।

মতিন দেখল আলতাফ যেন হঠাৎই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। অন্তত মতিনের

সামনে এই প্রসঙ্গ উঠবে তা সে আশা করেনি। কিন্তু দ্রুত সেটা কাটিয়ে সে গলা তুলল, 'আশ্চর্য। আপনাকে এই খবর দিল কে? এই তো আজ আমি ঢাকা থেকে এসেছি, আমার সঙ্গে রিভলভার আছে? দেখুন, হাত দিয়ে দেখুন।' সে রাগী ভঙ্গিতে শার্ট ওপরে তুলে দেখাল। কোমরে কিছু গোঁজা নেই। সে যেভাবে পকেট চাপল তাতে বোঝা গেল পকেটেও ওটা থাকতে পারে না।

'অনেক ধন্যবাদ। গতবার আপনি এনেছিলেন। অনেকেই সেটা দেখেছে। আপনি হয়তো নিছকই ভয় দেখানোর জন্যে এনেছিলেন, তবু কখন যে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তা কে বলতে পারে। আপনি কি জানেন এরা সবাই আপনাকে খুব ভয় পায়?'

'ভয় না পাওয়ালে এদের দিয়ে কাজ তোলা যাবে না', আলতাফ এগিয়ে গেল। সেই লোকটি ততক্ষণে জাল নিয়ে ফিরে এসেছে। আলতাফ তাকে বলল, 'চল। ওই পুকুরে জাল ফেলে ঠিক একটা দেড়কেজি মাছ মারবি। তোর বাপের মত দশ কেজি চাই না।'

লোকটা ঘাড় নেড়ে এগোতে লাগল, পেছনে আলতাফ। মতিনের মনে হল যতীন কৈবর্তের সঙ্গে লোকটার চেহারার বেশ মিল আছে। অথচ যতীন বলছিল ওর ছোট মেয়ে টাকা পাঠালে তার খাবার জোটে। তাহলে এ কি করে?

এইসময় মুজিবর বললেন, 'আচ্ছা। আমি তাহলে যাই।'

'না,' মতিন মাথা নাড়ল, 'আপনার যদি খুব অসুবিধে না হয় আমার সঙ্গে একটু কথা বলুন। আসুন না ওই গাছের নীচে।'

মুজিবর হাসলেন, 'অসুবিধে কিসের। চলুন।'

ওরা গাছের নীচে ফিরে এলে মতিন মুজিবরকে বসার জন্যে ইঙ্গিত করল। ভোলা ওদের সঙ্গেই আছে। তার বসার যেন প্রয়োজন ছিল না। পাশাপাশি বসে মতিন বলল, 'আমার ভাইকে আপনি ভুল বুঝবেন না। ওর মাথা একটু গরম।'

'সেটা আমি বুঝেছি।'

'আমি ঢাকায় ওর এক চেহারা দেখি, এখানে অন্য রূপ দেখছি। আসলে ও খুব সিরিয়াসলি ব্যবসা করতে চাইছে। আমার আব্বার যারা আশ্রিত তারা এখন বেশ বয়স্ক মানুষ। ব্যবসার কাজে ওরা তেমন সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমি তো কাউকে চলে যেতে বলিনি।' মতিন বলল।

'সেটাই তো সমস্যা। আপনারা ব্যবসা করবেন অন্য লোকের সাহায্যে। তাদের মাইনে দেবেন। আর ওরা আপনাদের সামনে শুকিয়ে থাকবে। এটা কি ভাল দেখাবে?'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় কি? আপনি কি করতে বলেন?'

'যাদের শরীরে শক্তি আছে তাদের দিয়ে কাজ করান। বাকিদের বলুন মাছ

যাতে চুরি না যায়, ফলন যাতে ঠিক থাকে সেটা নজর রাখতে। তারপর যখন লাভ হবে, তখন লাভের একটা সামান্য অংশ ওদের দিয়ে দিন যাতে সারা বছর খেয়ে পরে বাঁচতে পারে।' মুজিবর বললেন।

মতিন মাথা নাড়ল, 'আপনার প্রস্তাব খুব ভাল। বসে বসে যদি সবাই খায় তো রাগ হবেই।'

মুজিবর বললেন, 'আচ্ছা, এখন আমি উঠি।'

মতিন বলল, 'ঠিক আছে। খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ।' মুজিবর চলে গেলেন।

মতিন শুকনো বিলের ওপর নজর লাগাল। এখন দিগন্তে গাছপালার রেখা দেখা যাচ্ছে। বোনের শ্বশুরবাড়ি ঠিক কোন জায়গায় ছিল সে ঠাওর করতে পারছিল না। অনেকদিন পরে এখানে এসে তার বেশ ভাল লাগছিল। শরীর মনে এক অন্যরকম আরাম অনুভব করছিল সে। ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, চুপচাপ।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার এখন চলে কি করে?'

'আমার? চলে যায়। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে রোজগার তো হয়ই।'

'সদস্য হিসেবে রোজগার হয়?'

'মিথ্যে বলব না। সবাই যখন রোজগার করছে আমি কেন চুপ করে থাকি।'

মতিন বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। সে দেখল একটা বাচ্চা ছেলে চায়ের কাপ প্লেট নিয়ে অতি সন্তর্পণে হেঁটে আসছে। অর্থাৎ তার জন্যে চা হচ্ছে। ছেলেটার পেছনে চার পাঁচজন বয়স্ক মহিলা ধীরে ধীরে আসছিল।

মতিন বিড়বিড় করল, 'আবার চা কেন?'

'খান সার। গ্রামের চা অবশ্য দুধের চা।' ভোলা বলল, 'আমি একটু ছোট সারের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

ভোলা চলে যাওয়ামাত্র ছেলেটি সামনে এসে নীরবে কাপ-ডিশ তুলে ধরল। ইতিমধ্যে অনেকখানি চা চলকে পড়েছে প্লেটে। মতিন ওটা নিয়ে প্লেটের চা মাটিতে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম তোমার?'

'লিটন।' বলেই ছেলেটা দৌড়ে যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে ফিরে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে মতিন বুঝল ভোলার কথাই ঠিক। ছেলেবেলায় মা অনেক বায়না ধরলে এইরকম চা মেশানো দুধ দিতেন। অমৃত মনে হত তখন। এখন গলা দিয়ে নামছে না। সে দেখল পাঁচজন মহিলা খানিকটা দূরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এগিয়ে গেল কাপ হাতে নিয়ে, 'আপনারা কি আমাকে কিছু বলবেন?'

প্রশ্নটা করা মাত্রই একজন শব্দ করে কেঁদে উঠে ময়লা আঁচল চোখে চাপা দিল। সেটা কানে যাওয়ায় কান্না ছড়াল দু-তিনজনের গলায়।

মতিন অপ্রস্তুত। সে লক্ষ করল এরা প্রত্যেকেই বিধবা। ওদের সামলে নিতে

কিছুটা সময় যেতে দিল সে। এই অবস্থায় চা খাওয়া যায় না। সে কাপ থেকে চা ফেলে দিল।

'চা ভাল হয় নাই, না?' পঞ্চমজন প্রশ্ন করল। তার গলায় কান্না আসেনি।

'না। ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।'

'আর এক কাপ বানাবো?' পঞ্চমজনকে এবার অনেক কমবয়সী বলে মনে হল।

'না। বলুন, আপনারা কি আমাকে কিছু বলবেন?'

এবার প্রথমজন মাটির দিকে তাকাল।

মতিন হাসল। পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্যে বলল, 'দোষ আমার। অনেকদিন এখানে না আসায় সবাইকে চিনতে পারছি না। আচ্ছা, আপনার পরিচয় দিন।'

প্রথমজন চোখ মুছল আবার। ধরা গলায় বলল, 'আমি তোমার ধাই মা।'

'ধাই মা?' চমকে উঠল মতিন।

পঞ্চমজন বলল, 'আমিনা খালা আপনার জন্মাবার সময় কাজ করছিলেন। তখন তো এ গ্রামে হাসপাতাল ছিল না। বাড়িতেই বাচ্চা হত।'

এসব তথ্য মতিন জানে। সে হয়েছিল মাঝরাত্রে, বৃষ্টির মধ্যে। গ্রামে তখন ডাক্তার নেই। একজন কবিরাজ ঘরের দাওয়ায় বসে ছিলেন। আমিনা নামের এক ধাই তার পৃথিবীতে আসার পথে সাহায্য করেছিল। মায়ের কাছে এই গল্প সে অনেকবার শুনেছে। এই বৃদ্ধা মহিলাই তাহলে সেই আমিনা। মতিন চঞ্চল হল। যিনি পেটে ধরেন, জন্ম দেন তিনি যদি গর্ভধারিণী মা হন যিনি পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেন তিনি ধাই মা হিসেবে পরিচিত হন। অর্থাৎ তিনিও এক ধরনের মা। বৃদ্ধাকে তার প্রণাম করা উচিত।

'ওই বয়সের কথা কারও মনে থাকে না।' প্রথমজন নিচু গলায় বলল।

'আপনি কি আমাদের বাড়িতেই থাকেন?'

'আর কোথায় যাব, বাবা? সারাজীবন তো এই বাড়িতেই আছি। কথাগুলো ভারী নিশ্বাস-জড়ানো।

বৃদ্ধা কথা শেষ করামাত্র দ্বিতীয়জন বলে উঠল, 'ছোট সাহেব এখন আসতেছেন কিন্তু তার যা রাগ, কোনও কথা বলতে সাহস হয় না। আপনি আসছেন, আপায় কইল, বড় সাহেবের লগে মিল আছে আপনার। তাই—।'

'আপনার পরিচয়?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'পরিচয় আর কি দিমু সাহেব। কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই বইল্যা পইড়া আছি এখানে।' এই বৃদ্ধার গলায় ঝাঁঝ আছে। কথা বাড়ালে আরও অনেক কিছু শুনতে হতে পারে।

সে ছোটর দিকে তাকাল, 'আপনারা মনে হচ্ছে আমাকে কিছু বলবেন। বলুন, কি বলতে চান?'

ছোট বলল, 'ও আপা আপনি বলেন না।'

বড় বলল, 'শরম লাগে।'

দ্বিতীয়জন মুখ করল, 'শরম? তুমি ওর ধাই মা, জন্ম দেখছ, ওর কাছে শরম কইর‍্যা কি লাভ? ও তো তোমারই পোলা।'

'তুমি কি বাবা আজ এখানে থাকবা?' বড়জন প্রশ্ন করল।

'না। আজই ফিরে যেতে হবে।'

'অ।'

এইসময় কবিরকে দেখা গেল। দ্রুত পা ফেলে আসে। দূর থেকেই সে চিৎকার শুরু করে দিল, 'আরে করো কি তোমরা? ওনারে ছাইড়্যা দাও। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব আইছেন দেখা করবার জন্য, ছাইড়্যা দাও।'

ছোটোজন বলল, 'হইয়্যা গেল। মেয়ে মানুষের কপালই এই রকম। আপনার সঙ্গে যে আপার কথা ছিল। কখন শুনবেন?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, যাওয়ার আগে শুনব।'

ততক্ষণে কবির এসে গিয়েছে, 'আসেন। মেছবাহউদ্দিন সাহেব আইছেন।'

'কে তিনি?' মতিন মুখ ফেরাল।

'ওই যে কইলাম। কালীগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব। আপনি আইছেন গেরামে, মানুষটা ভালো তাই আইস্যা পড়ছেন।'

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না মতিনের। কিন্তু তার মনে পড়ল ইউনিয়ন পরিষদের কে এক নুরুউদ্দিনের সঙ্গে নাকি আলতাফের ঝামেলা হয়েছিল। বন্দুক নিয়ে মারতে গিয়েছিল সে। এখন মিটমাট হয়ে গেলেও মেছবাহউদ্দিন নিশ্চয়ই ব্যাপারটাকে পছন্দ করেননি। সে কবিরের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। বিধবারা দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। কলাগাছে সাদা কাপড় জড়ালে যেরকম লাগত ওদের সেরকমই দেখাচ্ছে। এরাও কিছু বলতে চায় তাকে।

এরা ঠিক নয়, তার ধাই মা, যিনি তাকে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। মতিনের মনে হল ঢাকায় বসে অনেক কিছু ব্যাপার নিয়ে রোমান্টিক ভাবনা ভাবতে ভালো লাগে কিন্তু বাস্তবে সেই ব্যাপারটা হয়তো সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে পুকুরের দিকে নজর গেল। আলতাফ মাছ তোলাচ্ছে। কিছু ছেলেবুড়ো পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। যতীন কৈবর্তের মতো দেখতে ছেলেটা জাল ফেলেছে। পুকুরের ধারে দাঁড়ানো আলতাফ চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক দেড় কেজি, তার বেশি যেন ওজন না হয়।' মতিন দাঁড়াল না।

মতিনকে দেখতে পেয়ে ভোলা এগিয়ে এল, 'আসুন সার। ইনি আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।'

ভোলার কথাবার্তার ধরন এখানকার সঙ্গে মেলে না। ব্যাপারটা পরে জানতে হবে। মতিন দেখল একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক মাথা নোয়াচ্ছেন, 'অসসালাম্ আলাইকুম।'

মতিন বলল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম।'

'আমি মেছবাহউদ্দিন আহমেদ। এখানকার মানুষ আমাকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বানিয়েছে। আপনি এসেছেন শুনে মনে হল একবার দেখা করা দরকার। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'বিন্দুমাত্র নয়। অনেকদিন পরে এসে ভালোই লাগছে। বসুন।' গাছের তলায় তখনও পড়ে থাকা চেয়ারগুলো দেখাল মতিন।

মেছবাহউদ্দিন বসলেন। তাঁর পাশে মতিন। ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল। মেছবাহউদ্দিন তাকে বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন? চেয়ারটা টেনে নাও।'

মতিন দেখল ভোলা যেন লজ্জা পেল, ওর মতো এক ভয়ঙ্কর প্রাক্তন ডাকাত লজ্জা পেলে অন্যরকম দেখতে লাগে। সে বলল, 'না, ঠিক আছে। আপনারা কথা বলুন।'

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'আপনার সামনে বসতে সঙ্কোচ পাচ্ছে বোধহয়। দিন তো পাল্টেছে ভোলা। এখন তুমি পরিষদের সদস্য। আর চেয়ারে বসলে তুমি কোনও অন্যায় করছ না।'

মতিন বলল, 'সঙ্কোচ করতে হবে না ভোলা। বোসো।'

এরপর ভোলা বসল। বসা না বলে শরীরটাকে চেয়ারে ঠেকাল বলা যেতে পারে।

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'আপনি অনেকদিন পরে এলেন।'

'হ্যাঁ। আসলে ইচ্ছে থাকলেও আসা হয়ে ওঠে না।'

'কিন্তু আপনাদের মতো মানুষের আসা উচিত। ঢাকা তো এখন বেশি দূরের পথ নয়। আপনার বাবা হাজীসাহেব কালীগঞ্জের জন্য যা করে গেছেন আমরা সেইসব কথা কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছি। হাসপাতাল, মসজিদ, রাস্তা—এ সবই তাঁর দান, বড় ভালো মানুষ ছিলেন। আপনারা শহরে থাকায় গ্রাম আপনাদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

মতিন স্নেহ শব্দটিকে খেয়াল করল। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কি তার কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে এসেছে? কিছুই বলা যায় না।

মতিন বলল, 'না, এখন থেকে আমরা মাঝে মাঝেই আসব। আমার ভাইয়ের ইচ্ছে এখানে মাছ আর মুরগির ব্যবসা চালু করার। চাষবাস নিয়েও ভাবতে হবে।'

'খুব ভালো কথা। আপনারা এসব করলে গ্রামের কিছু বেকার মানুষ চাকরি পাবে। কিন্তু একটা কথা, আপনি প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত আসবেন।'

মেছবাহউদ্দিন হাসলেন, 'আপনার ভাই মানুষ ভালো হতে পারেন কিন্তু বড্ড রগচটা। উনি সাহেবকে শাসন করতে পছন্দ করেন। আসলে দিন তো পাল্টে গিয়েছে। বাবা বাছা বলে কাজ করানোর সময় এখন। সবসময় চোখ রাঙানো কে সহ্য করবে?'

'আমি শুনেছি ও খুব রাগারাগি করে,' মতিন বলতে বাধ্য হল।

'রাগারাগি? আমাদের সদস্য নুরুউদ্দীনকে তো রিভলবার নিয়ে মারতে গিয়েছিল। আমাকে অনেকেই বলেছিল আলতাফের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করতে। আপনাদের পারিবারিক সম্মানের কথা ভেবে আমি সেটা করিনি।'

ভোলা বলল, 'এইসব আমি সারকে বলেছি।'

মতিন মাথা নাড়ল, 'আলতাফ অন্যায় করেছে।'

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'অল্প বয়স। ঢাকায় শুনেছি পনের ষোল বছরের ছেলেরা অস্ত্র নিয়ে ঘোরে। ব্যাপারটা যে ভাল নয় তা সবাই স্বীকার করছে কিন্তু কাজ হচ্ছে কোথায়? ওর ওই অস্ত্র আইনসম্মত কি না একবার দেখবেন?'

মতিন বলল, 'আমি জানি ওটা সম্পূর্ণ আইনসম্মত।'

'ও হ্যাঁ, আলতাফ দাবি করেছে যে বিলের জমি আপনাদের। ওপাশে কেদোপাড়ার জমিগুলিও নাকি এই পরিবারের। আমি তাকে বলেছি কাগজপত্র দাখিল করতে। যদি সেগুলি, লিখিত নথিতে থাকে তাহলে কোন অসুবিধে হবে না।' মেছবাহউদ্দিন গলা নিচু করলেন, 'দিন বদলে গিয়েছে। এখন যদি কেউ এসে বলে ও জমি আমার তাহলে তাকে ঠেকাতে কাগজপত্র দরকার হবে। আছে তো সব?'

মতিন বলল, 'আব্বা তো কোনও অন্যায় কাজ কখনও করেননি। ব্যাপারটা দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ দেখুন। মুশকিল হল, আজকাল এ ও এসে দাবি করে সে ফ্রিডম ফাইটার ছিল। যেন এ কথা বললেই তার অনেক কিছু পাওনা হয়ে যায়। আরে কে কত বড় ফাইটার ছিল তা আমি জানি না? তামাম দেশের মানুষ যদি একসঙ্গে ফাইট করত তা হলে রাজাকাররা কোথা থেকে এল? যে কোনওদিন খান সেনা দ্যাখেনি সেও এসে বলে ফ্রিডম ফাইটার। একাত্তরে আপনি কি ইন্ডিয়ায় ছিলেন?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'না। আমি সিঙ্গাপুরে ছিলাম।'

'ও। সিঙ্গাপুর তো অনেকদূর।'

'হ্যাঁ, সেখানে আমরা বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস খুলি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারের ব্যবস্থা করি। বাংলাদেশীদের কথা সবাইকে জানিয়ে জনমত সংগঠিত করেছিলাম। কিন্তু আমি কখনই নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলি না।' মতিন বলল।

'তা কেন? যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ে তার চেয়ে কম লড়াকু নয় যে তাকে অস্ত্র জোগান দেয়। আমি ছিলাম এখানে। ভোলার অতীত জীবন কি আপনি জানেন?'

ভোলা বলল, 'উনি সব শুনেছেন।'

'এই ভোলাকে আমিই পরিবর্তন করি। খানসেনাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই নয়, গোপনে তাদের সর্বনাশ করতে ভোলাকে বোঝাই। ও তো রোজ একটা করে খান মারত, কালীগঞ্জের অনেক মানুষই তখন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এমন একটা পরিবার নেই যাদের কোনও না কোনও ক্ষতি হয়েছে শুধু—! খারাপ লাগছে বলতে, আপনাদের কিছু হয়নি।'

কথাগুলো ভালো লাগছিল না মতিনের। লোকটা ইচ্ছে করেই তাকে ঠোকার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক মার্চ মাসের বক্তৃতার পর তারা কি কি করেছিল সে কথা এই লোকটাকে বোঝানোর কোনও মানে হয় না।

মতিন বলল, 'আপনারা কালীগঞ্জে কি কি করেছেন তা যেমন আপনারাই জানেন তেমনই ঢাকায় আমরা যা করেছি তা আমরাই জানি। এটুকু বলতে পারি স্বাধীন বাংলাদেশে নাগরিক হিসেবে আমি গর্বিত।

'ব্যাস, ব্যাস। এটাই তো আসল কথা। সত্যি তো, না জেনে মন্তব্য করা ঠিক নয়।' মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'আসার সময় দেখলাম আমাদের ফ্রিডম ফাইটার মুজিবর রহমান সাহেব ফিরে যাচ্ছেন। কি কথা হল?'

'উনি এসেছিলেন, আমাদের আশ্রিতদের ব্যাপারে কথা বলতে।'

হঠাৎ মেছবাহউদ্দিন উত্তপ্ত হলেন। ভোলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কিরকম কথা হল? কে রাইট দিয়েছেন ওকে কথা বলার? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। আমি তাকে এর আগেও নিষেধ করেছিলাম, আপনি আপনার মতো থাকুন কিন্তু লোকটা দেখছি কথা কানে নেওয়ার মানুষ নয়।'

'আপনি এভাবে বলছেন কিন্তু শুনলাম গ্রামের মানুষ ওঁকে শ্রদ্ধা করে।'

'হ্যাঁ, আর সেটা ভাঙিয়ে উনি বেঁচে আছেন। আওয়ামি লিগ বলল নির্বাচনে দাঁড়াতে, উনি বললেন, না। বি এন পি অফার দিল, জাতীয় পার্টি অনুরোধ করল কিন্তু সবাইকে উনি প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ কি? না, নির্বাচনে জিতলে দায়িত্ব নিতে হবে।'

ভোলা মৃদু প্রতিবাদ করল, 'কথাটা ঠিক না।'

'ঠিক না? তা হলে ঠিক কি?'

'উনি বলেন নির্বাচনে জিতলেও যখন সাধারণ মানুষের অবস্থা বদলাতে পারবেন না তখন দাঁড়ানোর কি দরকার?'

'পলায়ন মনোবৃত্তি, অতীত ভাঙিয়ে খাওয়া। একদম কান দেবেন না ওঁর

কথায়। কোন দল বা সংগঠন নেই ওর পেছনে। আমরা যা করি তাতে বাগড়া দেওয়াই ওঁর স্বভাব। স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক করেছেন, ভাই মারা গেছে, সংসার পুড়েছে কিন্তু তাই ভাঙিয়ে তিনি সারাজীবন ছড়ি ঘোরাতে পারেন না। আচ্ছা, আজ উঠি।' মেছবাহউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন, 'মতিন ভাই। আমি আছি। আমি থাকতে কোন প্রব্লেম হবে না। হ্যাঁ কত লোক চাই, কাজের জন্যে সেটা ঠিক করেছেন?'

'কোন কাজ?' মতিন বুঝতে পারল না।

মেছবাহউদ্দিন বললেন, 'এই যে বললেন ব্যবসা করবেন এখানে, তার জন্যে তো লোকের দরকার হবে।'

মতিন বলল, 'এখনও তো কিছুই ঠিক হয়নি।'

'বেশ, ঠিক হলে ভোলার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। এলাকার কিছু বেকার যুবককে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় আছি। আচ্ছা, খোদা হাফেজ।'

মতিন মাথা নাড়তেই ভদ্রলোক রওনা হয়ে গেলেন। ভোলা গেল তার সঙ্গে।

'সাহেব!'

পেছন থেকে নরম গলায় ডাক ভেসে এলে মতিনের সম্বিত ফিরল। সে ঘুরে দাঁড়াতে দেখতে পেল চারটে মেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তাদের পেছনে মাঝবয়সী মহিলারা কিছুটা দূরত্ব রেখে অনেকটা ঘোমটা টেনে অপেক্ষা করছে।

মতিন বলল, 'হ্যাঁ, বল।'

এদের বয়স কুড়ির অনেক নীচে। মুখের চেহারা, হাত-পায়ের গড়ন দেখলে অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় না। যে মেয়েটি ডেকেছিল সে আর একজনকে ঠেলল। যাকে ঠেলল তার লজ্জা আরও বেশি।

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি ওই বাড়িতেই থাকো?'

চারজনের দুজন মাথা নেড়ে না বলল, দুজন হ্যাঁ। মতিন চারপাশে তাকাল। পুরুষরা হয়তো এখনও মাছধরা দেখছে। চেয়ারম্যান কথা বলছে বলে এ দিকে আসাটা উচিত বলে মনে করেনি। মেয়েরা লক্ষ রেখেছিল তাই একা হতেই এগিয়ে এসেছে।

এইসময় পেছন থেকে একজন মহিলা এগিয়ে এসে মেয়েদের পাশে দাঁড়ালেন, 'আপনি তো আমাদের কাউকেই চিনবে না। আপনাদের কথা আমরা অনেক শুনেছি।'

'খুব ভাল কথা। তোমরা কি পড়াশুনা কর?'

চারজনই মাথা নাড়ল, 'না।'

ঠিক তখনই আলতাফের গলা শোনা গেল, 'আরে! করে কি এরা। আবার বড়ভাইরে ধরছ তোমরা? সাহস তো কম না।'

আলতাফের গলা শোনামাত্র চারজন দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। মহিলাও একে একে সরে গেলেন। মতিনের ব্যাপারটা খারাপ লাগল। 'তোকে দেখছি এখানে সবাই ভয় পায়।'

'ভয় না পাওয়ালে এরা মাথায় চড়ে বসবে। আপনি তো এদের চেনেন না, এক একটি রক্তচোষা ছারপোকা। গলায় পা না দিলে ঠিকঠাক কাজ করে না।' আলতাফ মাথা নাড়ল, 'ওই মেয়েগুলো কি বলেছে?'

'বলার সুযোগ পেল কোথায়?'

'আমি জানি কি বলবে। ওরা গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে চায়।'

'গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে?'

'হ্যাঁ। এখানেও খবর এসেছে ঢাকার গারমেন্ট ফ্যাক্টরিতে হাজার হাজার মেয়ে কাজ পেয়েছে। ওই কাজের জন্যে বেশি বিদ্যার দরকার হয় না। আমি এখানে যেদিন প্রথম এলাম সেদিন থেকেই ওই বায়না শুনছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! আমি বলেছি ফ্যাক্টরি ভালো চলছে না। যে মেয়ে আছে তাতেই বেশি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরা ভাবে মিথ্যে বলছি।'

'অন্য ফ্যাক্টরিতে যাক। মেয়েগুলো রোজগার করতে পারবে তাহলে। হাজার হাজার মেয়ে এখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে গারমেন্টের দৌলতে।'

'বাপ মা ছাড়বে না। ইজ্জত যাওয়ার ভয় আছে না? আমরা চেনা মানুষ আমাদের ওখানে কাজে গেলে নিরাপদ থাকবে। এই হল এদের ধারণা, আমি যত বলি ফ্যাক্টরি থেকে চলছে না বলেই আমরা এখানে আসছি ব্যবসা করার জন্যে, কিন্তু কে শোনে?' আলতাফের হঠাৎ খেয়াল হল, 'চেয়ারম্যান কি বলল?'

মতিন ভাইয়ের দিকে তাকাল। দূরে কাছে কিছু মানুষ ছিটিয়ে আছে। সে বলল, 'চল, ঘরে বসে কথা বলব।'

'আপনার কি খিদে পেয়েচে?'

ঘরের দিকে যেতে যেতে মতিন বলল, 'না।'

'ভাত হতে কিন্তু একটু দেরি হবে।'

'হোক। রাঁধবে কে?'

'এরাই রাঁধবে। একটা বড় মাছ পেলাম না, দুটো ছোট তুলতে হল।' আলতাফ পেছনে আসতে আসতে বলল, 'আমি সিওর, এরাই মাছ চুরি করেছে।'

ওরা ঘরে ঢুকতেই কবির এসে আলতাফকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বলতেই সে পকেট থেকে টাকা বের করে গুনে ওকে দিল। কবির চলে গেলে, চেয়ারে বসে বলল, 'বলুন।'

'তুই আগে বল এখানে ব্যবসার ব্যাপারটা কি ভেবেছিস?'

'আপনি তো জানেন। প্রথমে মাছ চাষ করে দেখব। আজকেই ময়মনসিংহ থেকে মাছের চারা নিয়ে লরি আসবে। আমরা নতুন দুটো পুকুরে মাছ ছেড়ে যাব।'

'কত টাকার মাছ?'

'দেখি, কত আনে।'

'তিন থেকে চারমাসে বিক্রি করা যাবে?'

'অবশ্যই।'

'কিভাবে বিক্রি করবি?'

'ঢাকায় চালান দিতে পারি। ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার। তা নাহলে পাইকারকে দিয়ে দিতে পারি। তাতে লাভ কম থাকবে।'

'এই কাজের জন্যে কত লোক দরকার?'

'কেন?' আলতাফের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'জিজ্ঞাসা করছি, উত্তর দে।'

'দুজন। বারো ঘণ্টা করে ডিউটি দেবে। মাছগুলোকে ঠিক সময়ে খাওয়াবে।'

'মাত্র দুজনে হয়ে যাবে?'

'হবে না কেন? পাহারা দেওয়া ছাড়া তো কোনও কাজ নেই। মাছেরা নিজেদের মতো পানির তলায় বড় হবে। আমি যখন আসব তখন দরকার হলে ওষুধ দিয়ে যাব।'

'মাছগুলো বড় হলে একজন পাহারাদার চোর বদমাসকে থামাতে পারবে?'

'আপনার মাথায় কি আছে বলুন তো!'

মতিন ভাইয়ের দিকে তাকাল। ঢাকায় যে সুবোধ হয়ে থাকে সে এখানে এখনও তার সামনে উদ্ধত হয়নি। সেটা হতে দেওয়া উচিত হবে না। মতিন বলল, 'লাভের যে হিসেব তুই আমাকে বলেছিস সেটা সত্যি হলে চারজন লোক রাখ।'

'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন।'

'এই চারজন কারা হবে?'

'ঢাকা থেকে আনব।'

'কেন?'

'আমি এদের বিশ্বাস করি না। সব শালা চোর। আব্বার প্রশ্রয় পেয়ে এখানে থেকে এখন আমাদের সর্বনাশ করতে চায়।'

'শোন। ব্যবসা করতে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এখানে এসে যা শুনেছি তাতে পরিষ্কার তুই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছিস না।'

'পারা যায় না।'

'পারতে হবে। ব্যবসা করতে হলে সেটা পারতেই হবে।'

'চেয়ারম্যান নালিশ করেছে?'

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে মতিন বলল, 'তুই এখানে রিভলভার নিয়ে আসিস কেন? নিজের গ্রামে রিভলভারের দরকার কি? এটা তো জঙ্গল নয়।'

'তার চেয়েও খারাপ। প্রথম প্রথম তো নিয়ে আসতাম না। এরা আমাকে নরম ভেবে চোখ দেখাল। ওই ভোলা আর নুরউদ্দিন আমার বিরুদ্ধে পাবলিক খ্যাপাতে লেগেছিল। বলে এতদিন যারা ভোগ করছে তারাই করবে আমরা বাইরের লোক। এসব কথা আপনাকে বলিনি চিন্তায় পড়বেন বলে। বুঝলাম নরম জমি ভেবে ওরা দাঁও মারবার চেষ্টা করছে কিন্তু যেই আমি রিভলভার বের করলাম, গালি দেওয়া শুরু করলাম তখনই ভোলা পাল্টি খেল। নুরুউদ্দিন বলেছিল হরতাল করাবে। তাকে যন্ত্রটা দেখাতে তবে ঠাণ্ডা হল।'

'হতে পারে। কিন্তু এখন আর এর প্রয়োজন নেই।'

'তা হলে আপনি ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবেন না।'

'কেন?'

'এরা আপনার খেয়েও বলবে খায়নি।'

'মানুষ সম্পর্কে এত খারাপ ভাবনা ভাবতে আমি রাজি নই। তা ছাড়া জোরজবরদস্তি করে পৃথিবীতে কেউ কখনই বেশিদিন ক্ষমতা দখল করে রাখতে পারেনি। তোর কাছে রিভলভার আছে জেনে কেউ বন্দুক বের করতে পারে। তখন আর কিছু করার থাকবে না। আমি তাই তোকে বলছি মাথা ঠাণ্ডা করে এখানে কাজ করতে হবে।'

আলতাফ মাথা নিচু করে রইল। বোঝা যাচ্ছে এই পরামর্শ তার একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু ভাইয়ের মুখের ওপর কিছু বলতে সে এখনও সাহস পাচ্ছিল না।

অপছন্দ হয়েছে শুনে আলতাফ খুশি হল, 'হ্যাঁ করে।'

'আনোয়ার ভাইকে ওর কথা বলব ঢাকায় ফিরে গিয়ে। আমি বা আমরা স্বাধীনতার সময় কি করেছি তাই নিয়ে কটাক্ষ করছিল।'

'বুঝুন।'

'বুঝেছি যা তাই ঢের। আর বুঝতে চাই না। কিন্তু এখানে ব্যবসা করতে গেলে এদের হাতে রাখতে হবে। মনে যাই থাক মুখে মিষ্টি কথা বলা দরকার।'

'আপনি আনোয়ার ভাইকে বললেই ব্যাটডা টাইট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ওকে শত্রু বানানো চলবে না।'

'ও কি আর কিছু বলছিল?'

'হ্যাঁ। এখানে নাকি প্রচুর বেকার ছেলে আছে। ব্যবসা করলে তাদের কাজ দিতে হবে।'

'ইনশাআল্লা। তা হলে তো ব্যবসা উঠে যাবে।'

'কেন?'

'ওরাই রাত্রে মাছ চুরি করবে অথচ আমরা কিছুই বলতে পারব না।'

'কিন্তু ঢাকা থেকে আমরা লোক আনব না। গ্রামের মানুষ তাদের মেনে নিতে পারবে না। তুই এক কাজ কর। এই গ্রামের বেকার ছেলেরা কি সবাইকেই পার্টি করে?'

'তা কেন হবে? অন্য পার্টিও করে আবার পার্টি করে না এমন ছেলেও আছে।'

'তাদের মধ্যে থেকে দু'জনকে বেছে নে। মেছবাহউদ্দিন বলেছে গ্রামের বেকার ছেলের কথা। আমি তাদের দু'জনকে নেব। তারা যদি ওর পার্টির লোক না হয় তাহলে তুই যে ভয় করছিস সেটা থাকবে না। বাকি দু'জনকে নেব আমার আশ্রিতদের মধ্যে থেকে।'

'আপনি—।'

'আপত্তি করিস না। এদের দু'জনকে নিলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমি একটু ঘুরে আসছি। তুই ইতিমধ্যে চারজনকে বাছাই করে রাখ।' মতিন উঠে পড়ল।

'মাছগুলো বড় হওয়ার আগে যদি দেখি এরা অবাধ্যতা করছে তাহলে কিন্তু ছাড়িয়ে দেব। বড় মাছ চুরি করার সুযোগ দেব না।' আলতাফ শেষ আপত্তিটা জানিয়ে রাখল।

বাইরে এসে মতিন সেই বাচ্চা ছেলেটাকে দেখল যার নাম লিটন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল, 'চল। আমাকে হিন্দুপাড়ায় নিয়ে যাবি তুই?'

'চলেন।' লিটন খুশি হল।

বিলের পাশের বাঁধ ধরে ওরা এগোতে লাগল। এখন পানির সময় নয়। তাই বাঁধ থেকে নেমে মাঠে পা রাখতে অসুবিধে হল না। হাঁটতে হাঁটতে লিটন জিজ্ঞাসা করল, 'ছার, ঢাকা কিরম জায়গা? খুব বড়?'

'হ্যাঁ। বড় শহর। তুই কখনও যাসনি?'

'নাঃ। আমার আব্বাও যায় নাই।'

'বড় হলে তুই যাস।'

'আপনার দেশ তো এই জায়গা, না?'

'হ্যাঁ। তোর চেয়ে অল্প বয়সে আমি ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম।'

'আপনি আসছে দেইখ্যা সবাই খুব খুশি।'

'কেন?'

'সবাই ভাবতেছে আল্লা ইবার দিবেন।'

'কি দেবেন?'

'আমি অত জানি না। আম্মা আব্বারে কইতেছিল, সব বুঝি নাই।'

মতিন নিশ্বাস ফেলল। কতটা পরিবর্তন হয়েছে গ্রাম বাংলার এক দরিদ্র বালকের জীবনযাত্রা? তার বাল্যকালে এরা যেমন ছিল তা থেকে কতটা সরে এসেছে।

'হিন্দুপাড়া।' লিটন বলল।

কলাগাছ আম আর কাঁঠালে ছাওয়া ছোট্ট গ্রামটা এখন চুপচাপ। কয়েকটা গরু এবং ছাগল ওদের দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। কুড়ি পঁচিশ ঘরের বেশি মানুষ এখানে নেই। ছেচল্লিশে নোয়াখালির দাঙ্গা, সাতচল্লিশে দেশ ভাগ, পঁয়ষট্টির যুদ্ধ অথবা একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝড় সত্ত্বেও কোনও হিন্দু নাকি কালীগঞ্জ ছেড়ে চলে যায়নি। হানাহানির আগুন নাকি স্পর্শ করেনি কালীগঞ্জের মাটি। কথাটা সত্যি। কিন্তু এই গ্রামে ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থরা কোনওদিন ছিল কি? মতিনের মনে পড়ে না।

গ্রামে ঢুকে কয়েক পা হাঁটতেই বিস্মিত মুখগুলোকে দেখতে পেল সে। নিজেদের বাড়ির দাওয়া অথবা উঠোনে কাজ করতে করতে শহুরে মানুষকে ওরা অবাক হয়ে দেখছে। একজন প্রৌঢ়কে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মতিন বলল, 'আদাব। দুর্গাদাসের বাড়ি কোথায়?'

'দুর্গাদাসদাদা? হুই কলাগাছ দেখতেছেন, ওই বাড়ি।'

মতিন হাঁটতে শুরু করল। সে লক্ষ করছিল এই গ্রামের বাড়িগুলো, উঠোন অনেক পরিষ্কার। অভাব থাকলেও সেটা প্রকট হয়ে নেই।

কলাগাছে ঘেরা উঠোনে পা দিয়ে মতিন দাঁড়াল। একজন বৃদ্ধা বারান্দায় বসে কুলোর ওপর ঝুঁকে কিছু বাছছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে ঘোমটা টানলেন।

মতিন কয়েক পা এগোল, 'দুর্গাদাসদাদা আছেন?'

ঘোমটার আড়ালে মুখ রেখে বৃদ্ধা গলা তুললেন, 'কে ডাকে!'

ঘরের ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ ভেসে এল, 'কে?'

'চিনি না।' বৃদ্ধা জবাব দিল।

'এই গ্রামের মানুষ হইলে চিনবা না তুমি?' বৃদ্ধের গলায় বিরক্তি।

'আসো না একবার।'

এবার দরজায় শব্দ হল। প্রথমে একটা লাঠি বেরিয়ে এল। তারপর শীর্ণদেহ একটি মানুষ। মুখে অনেকখানি পাকা দাড়ি। পরনে খাটো ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। মাথার চুল অর্ধেক উঠে গেছে, বাকিটা সাদা। শরীরের হাড়গুলোকে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে মতিন। কাঁপতে কাঁপতে লাঠিতে ভর রেখে বৃদ্ধ বারান্দার প্রান্তে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারে চান?'

'দুর্গাদাসদাদা।'

'আমিই সেই লোক।'

দুর্গাদাস। মতিন অবাক হয়ে দেখছে। বিলে নৌকো নিয়ে এই মানুষটা যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন মনে হত মেঘগুলো ভয় পেয়ে যাচ্ছে। দুর্গাদাসের নৌকোয় চড়লে কোন কিছুরই ভয় নেই। না ডাকাত না ঝড়।

'আপনারে চিনলাম না!'

এই সময় পেছন থেকে লিটন বলে উঠল, 'বড় ছার।'

'আপনি সরকারি লোক?'

'একদম না। আপনি আমাকে তুমি বলুন, কারণ একসময় তাই বলতেন।' মতিন হাসল, 'আমাকে একদম চেনা যাচ্ছে না? আমি মতিন।'

'মতিন?'

'ছেলেবেলায় আপনি আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন।'

হঠাৎ যেন ভূমিকম্প হল। বৃদ্ধের শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে দাওয়া থেকে উঠোনে নামতে লাগল। হাতের লাঠি ছিটকে পড়ল একপাশে। মতিন কিছু বলার আগে দুর্গাদাসের শরীরটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের ওপর, 'দাদারে, এতদিনে তুমি আইলা।' ডুকরে উঠল কান্না।

এমন প্রস্তুত জীবনে হয়নি মতিন। সে নিচু হয়েও ক্রন্দনরত বৃদ্ধকে তুলতে পারছিল না। সে যতই বলছে, এ আপনি কি করছেন, ততই বৃদ্ধের কান্না বাড়ছে।

শেষপর্যন্ত উবু হয়ে বসে পড়ে বৃদ্ধের কাঁধ দুটোকে সোজা করল সে, 'ছিঃ। আপনি আমার পায়ে পড়লেন? আপনি আমার কত বড় না?'

'কে বড়?' বৃদ্ধের গলায় তখনও কান্না, 'আমি? একদম না। আমি তোমাগো চাকর। বড় সাহেব আমার দেবতা ছিলেন। আমি এতবড় পাপী যে তাঁর মাটি নেবার সময় থাকতে পারলাম না। গরু গুঁতাইল এমন যে হাসপাতালে নিয়া গেল এরা। এখন সোজা খাড়াইতে পারি না। ওহো! মতিনভাই, তুমি আইছ এখানে। ভগবান আছেন। শুনছ, তুমি চিনতে পারতেছ না? আমাগো বড়সাহেবের পোলা, মতিন। এইটুকুনি দেখছি এরে।'

বৃদ্ধা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। একটা ছোট্ট টুল নিয়ে উঠোনে নেমে এসে মতিনের পাশে রাখতেই দুর্গাদাস বললেন, 'বসো, ওখানে বসো। কি ভাগ্যি আমার।'

মতিন টুলে বসল। ইতিমধ্যে উঠোনে বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। ফিসফিস কথা শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাদাস বললেন, 'কবে আইলা তুমি?'

'আজই।'

'কেউই বলে নাই। আমারে কেউ মানুষই মনে করে না।'

বৃদ্ধা বললেন, 'আমিও তো জানি না।'

মতিন বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'মরি নাই। এখনও ভগবান প্রাণটা নেয় নাই।' অভাব। বড় অভাব। বৃদ্ধ বয়স। কাজ কাম করতে পারি না। পয়সা নাই। এই তিনি তাঁতের কারখানায় এখনও কাম করেন বইল্যা একটু ভাত পাই। মতিন, দিন যখন যায় তখন সব নিয়া যায়।'

'কিন্তু আপনার ছেলে তো এখানকার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য!'

দুর্গাদাস মাথা নাড়ে, 'আমার কোন ছেলে নাই।'

'আপনার মনের দুঃখ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ভোলা তো এখন পাল্টে গিয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধের সময় থেকেই পাল্টেছে। এখন মানুষের উপকার করে সে। তাছাড়া সে কেন ডাকাতি করত তাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন দুর্গাদাসদাদা!' মতিন বোঝাবার চেষ্টা করল।

'এইসব কথা আমারে বুঝাইয়া কোন লাভ নাই। যারে অন্যায় বলি, পাপ বলছি সারাজীবন তাই তার জীবন হইয়া গেল। তোমার বাপ বড়সাহেব কইতেন, দুর্গা, তুই ঠিক করছস; আগে তুই মানুষ তারপর বাপ।' মাথা ঝাঁকালেন দুর্গাদাস, 'আরে তুমি তামাশা দ্যাখো নাকি! ঘরে কিছু নাই? মুড়ি বাতাসা তো ছিল?

বৃদ্ধা নড়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই মতিন আপত্তি করল, 'না, না। আমি এখন কিছু খাব না। আমার পেট ভর্তি, আপনারা ব্যস্ত হবেন না।'

দুর্গাদাসের কথাগুলো পছন্দ না হলেও মেনে নিলেন, 'বাসার খবর কি?'

মতিনের মজা লাগল। ঢাকার নিজস্ব বাড়িকে দুর্গাদাস বাসা বলছেন এখনও।

মাথা নাড়ল সে। তারপর বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে।'

'দরকার? আমার লগে দরকারি কথা?'

'হ্যাঁ। আমার ছোটভাই আলতাফকে আপনি দেখেছেন?'

'না। আমি তো এইখান থিকা কোথাও যাই না।'

'ও। ওর বয়স বছর আঠাশেক। খাটিয়ে ছেলে কিন্তু রাগী খুব।'

'আইছা। তোমার দাদাও রাগী ছিল শুনছি।'

ঠাকুর্দার কথা মতিনের মনে নেই অথচ দুর্গাদাস সহজে বলে দিল। সে হাসল, 'আমি এবং আলতাফ ঠিক করেছি এখন থেকে এখানে মাঝে মাঝে আসব। আলতাফই প্রতি সপ্তাহে আসবে। দুটো নতুন পুকুর খোঁড়ানো হয়েছে। পুরনোগুলো তো আছেই। ওইসব জায়গায় মাছের চাষ করা হবে। আমার নিজের কোনও ধারণা নেই কিন্তু আলতাফ বলছে ব্যবসা হিসেবে খুব ভাল ফল দেবে।'

'মাছের ব্যবসা?' দুর্গাদাস অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। আজ থেকেই মাছ ছাড়া হবে। পাঁচ মাস থেকে শহরে চালান যাবে। তা এই সব দেখাশোনা করার জন্যে চারটে ছেলেকে রাখা হবে। তারাই কাজ করবে, মাইনে পাবে। আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

'না। বড়সাহেবের বংশধর হইয়া মাছের ব্যবসা করব কেনে?'

মতিন হাসল, 'এখন কোন ব্যবসায় মান যায় যদি না সেটা বেআইনী হয়।'

'হুম। শহরের ব্যবসা ভাল চলতেছে না?'

'খুব ভাল না।'

'নিজের বাড়ি, পুকুর, মাটি নিয়া ব্যবসা করা ভালো?'

'আমরা ওসব কিছুই করছি না। শুধু পানিতে মাছ ছেড়ে একটু বড় করে তুলে নিচ্ছি। যা হোক, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

দুর্গাদাস অবাক হয়ে তাকালেন।

'আপনি রোজ সকালে বিকেলে ওখানে গিয়ে বসবেন। আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আপনি কি হেঁটে যেতে পারবেন?' মতিন জিজ্ঞাসা করল।

'কষ্ট হয়। বেশিদূর যাইতে পারি না লাঠি লইয়া। দুর্গাদাস মাথা নাড়লেন, 'যে জিনিস বগলে দিয়া হাঁটে সেটা পাইলে পারতাম।'

'ক্রাচ। ঠিক আছে আমি আপনাকে একজোড়া ভাল ক্রাচ পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু আমি ওখানে কেন যাব?'

'নজর রাখতে। আপনি দেখবেন ছেলে চারটে ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। আমরা থাকব না, আপনি আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে ওখানে যাবেন রোজ। কোন গোলমাল লক্ষ করলে সঙ্গে সঙ্গে শহরে আমাদের খবর পাঠাবেন। কাকে বললে আমরা খবর পাব তাও আপনাকে জানিয়ে দেব আমি।'

'তার মানে তুমি এখানে বিশ্বাসী লোক পাও নাই!'

'ঠিক বলেছেন।' মতিন মাথা নাড়ল, 'আপনি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আমাদের এই উপকারটা করুন।'

দুর্গাদাস হাসলেন, 'নতুন নতুন লাগে। আমি যে একটা মানুষ তাই কেউ বলে না। শুনছ? কি জবাব দিব বল?'

যাঁর উদ্দেশে প্রশ্ন তিনি বললেন, 'না বলব কেন? নিমকহারামি হবে।'

দুর্গাদাস বললেন, 'উত্তর শুনছ মতিন?'

মতিন হাসল, 'উত্তরটা আমার জানা ছিল বলেই তো আপনার কাছে এসেছিলাম। এখন বলুন কত টাকা দিলে আপনাদের খাওয়াপরার অসুবিধা থাকবে না।'

'এইডা তুমি ব্যবসায়ীর মত কথা বল্‌লা।' মাথা নাড়লেন দুর্গাদাস।

'ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমরাই ঠিক করে নেব। আমি বিকেল পর্যন্ত আছি। তার আগে যদি একবার আসেন খুব ভালো হয়। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে?'

'আজ করবা, রোজ তো পারবা না। আমি ঠিক যাব।'

মতিন উঠল। কাঁপতে কাঁপতে দুর্গাদাস দাঁড়াতে বৃদ্ধা একটা প্লেটে বাতাসা নিয়ে এসে সামনে ধরলেন। লাল বাতাসা। লবেঞ্চুসের স্বাদ মনে পড়ল মতিনের। তারপরেই খেয়াল হল অনেক বছর সে লাল বাতাসা খায়নি। হাত বাড়িয়ে একটা তুলে মুখে পুরতেই দাঁতের চাপে যে শব্দ হল সেটা তার খুব চেনা। ছেলেবেলায় বাতাসা খেলেই এই শব্দ হত। সে চোখ বন্ধ করল। বাঃ বেশ চমৎকার স্বাদ।

'বিলটার হাল দেখছ মতিন?'

দুর্গাদাসের কথায় চোখ খুলল মতিন, 'হ্যাঁ। কি করে এমন হল? আমি চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সমুদ্রের মত ঢেউ খেলত। কি ভয় লাগত নৌকায় উঠতে। আজ সব খাঁ খাঁ করছে। পানি ছাড়া বিলের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না।'

'তুমি আজ হঠাৎ দেখলা আর আমি? চোখের সামনে দেখলাম বিলটা ধীরে ধীরে মাঠ হইয়া গেল! এখন আর আমি ওই দিকে তাকাইতে পারি না।'

বৃদ্ধার দেওয়া পানি খেয়ে মতিন লিটনের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল অনেকে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব। একটা সূত্র পেলেই হয়। চোখ বুলিয়ে কোন মুখকেই চেনা মনে না হতে সে হাঁটা শুরু করল। কয়েক পা যেতে লিটন তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমার আব্বারে কাম দিবে না?'

'তোর আব্বা কি করে?'

'মানুষের বাড়িতে কাম করে। খেতির কাম। ডেইলি টাকা পায়। গত সাতদিন কোন কাম নাই। কাল শুধু মুড়ি খাইছি আমরা।' লিটন বলল।

'আমাকে তখন তুই চা এনে দিলি কোত্থেকে?'

'কবির চাচা দিছিল।'

'ঠিক আছে, তোর আব্বাকে দেখা করতে বলিস।'

'আব্বা ডর পায়।'

'কেন?'

'ছোটসাহেব যদি রাগ করে!'

'না, রাগ করবে কেন? তুই দেখা করতে বলিস।' মতিন পা চালাল।

মাঝেমাঝে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে দরজা অবধি। ঘরে ঢুকছে না কেউ।

জানলার ধারে ইজিচেয়ার নিয়ে বসে ছিল মতিন। মাথর ওপর ফ্যান ঘুরছে। বাথরুমের ড্রামে আজ জল ভরা হয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও ঘরটি মন্দ নয়। মতিন দরজার দিকে তাকাচ্ছিল না। এখনকার অধিকাংশ মানুষ তার কাছে সাহায্য চেয়ে হাত বাড়াবে এতে অবাক হচ্ছে না সে। অথচ আলতাফ নিজের যে ইমেজ ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে তাতে এইসব সমস্যা ওর কাছে পৌঁছাবে না। কোনটা ভাল তাই ঠিক বুঝতে পারছে না মতিন।

সে জানলার বাইরে তাকাল, পুকুর, দূরের শিমুলগাছকে রোদে পুড়তে দেখল। প্রখর রোদ সত্ত্বেও অল্প অল্প হাওয়া বইছে। এই সেই জায়গা যেখানে তার শৈশব এবং বাল্যকালের অনেকটা কেটেছিল। মাঝেমাঝেই বুকের ভেতরে একটা টনটনানি ব্যথা চলকে উঠেছে। এত শান্ত, শান্তির জায়গা ছেড়ে ঢাকা শহরের ইটকাঠ পাথরের সমস্যায় তাকে নিত্য বেঁচে থাকতে হয়। যদি সব ছেড়ে ছুড়ে চলে আসা যেত! হেসে ফেলল মতিন। যদি বিলটায় আবার পানি জমত, যদি ছিপ নিয়ে সে পুঁটি মাছ ধরার নেশাটাকে ফিরে পেত। পৃথিবীর যদিগুলো বড় গোলমেলে!

'আসব?'

নারীকণ্ঠের আওয়াজ কানে আসতেই মুখ ফেরাল মতিন। তার ধাই মা এবং একটি বছর তিরিশের যুবতী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'কি ব্যাপার?'

ধাই মা বলল, 'তখন কথাডা কইতে পারলাম না।'

'ও হ্যাঁ।' মতিন মাথা নাড়ল, 'বলুন।'

ধাই মা ইতস্তত করল। যুবতী দেখিয়ে, 'আমার মাইয়্যা। এরে তুমি বাঁচাও।'

'কি হয়েছে ওর?' মতিন সোজা হল।

বৃদ্ধা যা বলল তা মন দিয়ে শুনল মতিন। অনেক কষ্টে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বছর দশেক আগে। স্বামী খুব ভাল মানুষ ছিল। চাষবাস করত। কিন্তু স্বামীর বড় ভাই বিয়ে-থা করেনি, মাতাল, লম্পট। সে কু-নজর দেয় ভাইয়ের বউয়ের ওপর। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি স্বামীকে সব জানায়। স্বামী দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে। গ্রামে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়। কিন্তু তার কিছু দিনের মধ্যেই রাত্রে নদী থেকে আসবার সময় স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হয়। লোকে বলে এই মৃত্যুর পেছনে ভাসুরের হাত ছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর বেচারা একা হয়ে যায়। কিছুদিন পরে ভাসুর এমন ব্যবহার করতে থাকে যেন সে-ই মেয়েটির কর্তা। ওকে ভোগ করার জন্যে খেপে ওঠে লোকটা। তাই বাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে সে। যেহেতু ছেড়ে এসেছে তাই স্বামীর সম্পত্তির দখল ভাসুর দেবে না। এখানকার থানায় জানিয়েও কোন কাজ

হয়নি। বৃদ্ধার এখানে নিজেরই চলে না তার ওপর যুবতী মেয়ে ঘাড়ে চেপেছে। কি হবে সে ভেবে পাচ্ছে না। লোক বলছে মামলা করতে। কিন্তু সেটা করতে গেলেও টাকা লাগে। স্বামীর গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছিল, কোন কাজ হয়নি। এখন মতিন যদি কোন সুরাহা করে দেয়। সে শহরে থাকে। অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সে ইচ্ছে করলে ভাসুরকে জব্দ করতে নিশ্চয়ই পারবে।

মতিনের খারাপ লাগল। কিন্তু সে ভেবে পেল না এই সমস্যার সমাধান কি করে করবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন গ্রামে বিয়ে হয়েছিল?'

বৃদ্ধা জবাব দিল, 'রসিদপুর।'

মতিন বলল, 'দেখুন, ওখানে তো আমি কাউকে চিনি না। আমি কি করব?'

'তোমার নিজের বুন হইলে কি করতা?'

চমকে উঠল মতিন। 'সত্যি কথা খারাপ শোনায়। কিন্তু কথাডা ভিন্ন নয়।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

বৃদ্ধা মুখ নীচু করল। মনে হল কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল শেষ পর্যন্ত। তারপর মুখ তুলল, 'বড় আশা নিয়া আসছিলাম তোমার কাছে।'

এই গলার স্বরে নরম হয়ে গেল মতিন। পকেট থেকে কাগজ এবং কলম বের করে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওর নাম বলুন।'

'শামসুন্নেছা। ডাক নাম আনু।'

'ওর স্বামীর নাম?'

'মাহবুবুর রহমান।'

'ওর ভাসুরের নাম?'

'মিজানুর রহমান।'

'সিরাজগঞ্জের কোন পাড়ায় বাড়ি?'

'পশ্চিম পাড়া। স্কুলের পাশে বাড়ি।'

'ঠিক আছে। আমি কোনও কথা দিচ্ছি না কিন্তু ঢাকায় ফিরে চেষ্টা করব।'

'তুমি একবার সিরাজগঞ্জে যাইতে পারবা না?'

'আমি? সেখানে গেলে আমার কথা ওর ভাসুর শুনবে কেন? যারা বললে সে শুনতে বাধ্য হবে তাদের দিয়ে বলাব। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে। চল।'

মতিন দেখল ওরা দরজা থেকে বারান্দায় নেমে গেল। যুবতীটি এতক্ষণ চুপচাপ

দাঁড়িয়ে ছিল। একটি কথাও সে উচ্চারণ করেনি। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কারও কাছে হাত পাততে এসে সে বোধহয় একটু বেশি পরিমাণই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

আলতাফ হই চই করে রান্না শেষ করিয়ে ওই ঘরেই যখন পরিবেশনের ব্যবস্থা করল তখন বিকেল প্রায় চারটে। ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, মাছের ঝোল, মুরগির ঝোল এবং চাটনি। চেয়ারে বসে খাদ্যদ্রব্যগুলো দেখে খিদেটা বেড়ে গেল মতিনের। রং দেখে মনে হচ্ছিল যথেষ্ট উপাদেয় হয়েছে। কবির নিজে বয়ে এনেছে পাত্রগুলো। সাজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। যাওয়ার আগে বলে গেছে, 'শহরের মত রান্না হয় নাই।'

খেতে বসে মতিনের মনে হল অতীব সুস্বাদু। এত সুন্দর মাছের ঝোল আজকাল ঢাকার বাড়িতে হয় না। সেখানে প্রায় প্রতি বাড়িতেই মাছ এবং মাংসের রান্নায় যে আধুনিকীকরণ ঘটেছে তাতে আর স্বাদের হেরফের ঘটে না। তার মানে হল অনেকদিনের পরে এই দিশি গ্রাম্য রান্নায় ছেলেবেলার স্বাদ পাচ্ছে। শেষ পাতে ডাল খেতে খেতে বুঝতে পারল অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

আলতাফ বলল, 'আপনার খুব খিদে পেয়েছিল।'

'না রে। খিদের চেয়ে রান্নাটা জব্বর হয়েছে। কে রেঁধেছে?'

'কবিরের বৌ।'

'এত সব রান্না করল—।'

'মাছ তো আমি দিয়েছি। বাকি সব কেনার জন্যে টাকা দিয়েছিলাম।'

একটু স্বস্তি। তারপরই মতিনের মাথায় দুটো প্রশ্ন চলকে উঠল। আজ, এই বিকেলেও এই বাড়ি এবং বাড়িকে ঘিরে পাড়ায় যে সব পরিবার থাকে তাদের কেউ চমৎকার খাবারের স্বাদ পাচ্ছে? যে পরিমাণ মাছ এবং মাংস তাদের টেবিলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপর আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে ওদের জন্য? নিজেরা নুনভাত খেয়ে তাদের এই সব খাবার পরিবেশন করার সময় কি ওদের মনে লোভ ছোবল মারবে না?

বাড়িতে শখে পড়ে হঠাৎ রান্নাঘরে গিয়ে কোন পদ বানিয়ে স্ত্রী বলেন, খারাপ হলে কিছু বলব না। অভ্যেস নেই, খারাপ হতেই পারে। কবিরের স্ত্রী বছরের পর বছর যে সব রান্না করার কোন সুযোগই পায় না, কবে কখন কোন এককালে হয়তো দু-চারদিন করেছিল, সেই পদগুলো আজ এমন সাবলীল ভঙ্গিতে রান্না কবিরের স্ত্রীর হাত দিয়ে বেরুল কি করে? এ সব কথা আলতাফকে বলার কোন মানে হয় না।

মতিন বলল, 'বলে দিস রান্না খুব ভাল হয়েছে।'

আলতাফ বলল, 'আমরা খাব বলে অন্য বউরা কবিরের বউকে হেল্প করেছে।'

'ও।' দৃশ্যটা কল্পনা করল মতিন।

'হাতমুখ ধুয়ে আপনি বিশ্রাম নিন। একটু পরেই ময়মনসিংহ থেকে ট্রাক এসে যাবে মাছের পোনা নিয়ে। ওজন করে গুনে পুকুরে ছেড়ে আমরা ফিরে যাব।'

'তুই চারজনকে জোগাড় করেছিস?'

'হুঁ। আপনি বলেছেন বলে করলাম কিন্তু আমি ওদের বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস তো করতেই হবে। তবে আর একটা ব্যবস্থা আমি করেছি যাতে ঠকার চান্স নেই।'

আলতাফ অবাক হয়ে তাকাল।

মতিন বলল, 'ভোলার বাবা দুর্গাদাসকে তুই দেখেছিস?'

'না। শুনেছি বুড়ো হাঁটা চলা করতে পারে না। আপনি তো আজ ওখানে গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, দুর্গাদাসকে দেখে এলাম। আব্বা ওর আল্লা ছিলেন। আমাদের বাড়ির জন্যে ও জান দিয়ে দিতে পারত। কোমরে আঘাত পাওয়ার পর থেকেই ও ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া বয়স হয়েছে, খেতেও পায় না ঠিকঠাক তাই আরও অথর্ব হয়ে পড়েছে।'

'তা সে কি করবে?'

'আমি তাকে বলেছি রোজ এখানে এসে পুকুর ধারে বসে থাকতে। এখানকার সব খবরাখবর রাখতে। যদি কোন গোলমাল দ্যাখে তা হলে আমাদের কাছে খবর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে সে।' মতিন বলল।

'এতদূর আসতে পারবে সে?'

'বলল পারবে।'

'মন্দ না কিন্তু কত দিতে হবে ওকে?'

'কিছু কথা হয়নি। খাওয়া-পরার মতো টাকা দিলেই হবে।'

'সে অনেক টাকা।'

'বহু টাকা লোকসান বাঁচানোর জন্যে এই টাকাটা আমাদের খরচ করতে হবে।'

'হুম। কিন্তু ভোলা কি মনে করবে?'

'তার মানে?'

'ভোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। বেশ প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে। তার

বাপকে যদি পাহারাদারের কাজে রাখি তা হলে—।' কথাটা শেষ করল না আলতাফ।

'যে ছেলে নিজের বাপের খবর নেয় না, বাপ খেতে পাচ্ছে কি না দ্যাখে না, তার কি মনে হল তা নিয়ে ভাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। দুর্গাদাসের প্রতি আমাদের পরিবার কৃতজ্ঞ। আজও সে বিশ্বস্ত। ও যদি এখানে হেঁটে আসতে পারে তা হলে দেখবি তোর সমস্যা কমে যাবে।' মতিন উঠে পড়ল হাত ধুতে।

খাওয়াদাওয়ার পর পান নিয়ে এল লিটন। একটা প্লেটে পান, সুপারি, চুন আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ছেলেটা খেয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সামলে নিল মতিন। এখানে প্রশ্ন করলেই কি জবাব শুনতে হবে তার বিশ্বাস নেই।

আলতাফ বলল, 'আপনি আলমারিটা দেখবেন না?'

মতিন আলমারির দিকে তাকাল। এই আলমারি আব্বার মৃত্যুর পরে আর খোলা হয়নি। চাবিও হারিয়ে গেছে। ওর ভেতরে কি আছে তা এখন অনুমানের বিষয়। আব্বা বিষয়ী মানুষ ছিলেন। প্রায়ই আসতেন এখানে। দরকারি কাগজপত্র ঢাকার বাড়িতে না রেখে এখানে কেন রেখে যাবেন? সে বলল, 'একটা হাতুড়ি নিয়ে আয়।'

লিটন ছুটে গেল বাইরে। এবং তারপরেই হইচই পড়ে গেল। বড়সাহেবের আলমারি খোলা হচ্ছে শুনে এ বাড়ির প্রায় সমস্ত আবাসিকরা বারান্দায় জড়ো হল। তাই দেখে আলতাফ রেগে গেল খুব, 'কি হচ্ছে কি? আপনারা কি নাটক দেখতে এসেছেন? আলমারিতে যাই থাকুক তাতে আপনাদের কি দরকার? যান, যে যার কাজে যান।'

ওর মুখচোখ গলার স্বরে কাজ হল। ভিড়টা হালকা হতে শুরু করল। মতিন ঘরে বসে দেখল ওই দলে করিমচাচা এবং কবির রয়েছে। আলতাফ তখনও চেঁচাচ্ছে, 'সব ব্যাপারে নাক গলানো স্বভাব হয়ে গেছে আপনাদের।'

এইসময় লিটন একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল। আলতাফ বলল, 'আমাকে দে।'

প্রথমে অল্প জোরে তালায় আঘাত করতে লাগল আলতাফ। কোনও কাজ হল না তাতে। আশেপাশে তাকিয়ে একটা কাঠের টুকরো নিয়ে এসে তার ওপর

তালাটাকে রেখে জোরে আঘাত করল। তালাটা সামান্য তুবড়ে গেল কিন্তু খুলল না।

মতিন দেখছিল। বলল, 'আগেকার দিনের তালা তো, বেশ শক্তপোক্ত। ভেতরে হ্যান্ডেলটা ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে দ্যাখ তো।'

আলতাফ আদেশ পালন করল। ক্রমশ সে অধৈর্য হয়ে উঠছিল। এখন মানুষগুলো বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের যে জায়গায় জড়ো হয়েছে সেখান থেকে আলমারিটা দেখা যায়। আলতাফ গায়ের জোর বাড়াতে লাগল। তার মুখ হিংস্র হয়ে উঠছিল। যেন তালাটার সঙ্গে তার সম্মানের লড়াই চলছে। শেষপর্যন্ত খোলেনি, যে কড়ায় তালা আটকেছিল সেইটেই আলমারি থেকে খুলে বেরিয়ে এসেছে। আলতাফ চাপা গলায় বলল, 'শালা।'

লিটন বলল, 'খুলছে।'

আলতাফ বলল, 'খুলে দেখুন।'

মতিন নড়ল না, 'তুই খোল।'

অতএব আলতাফ পাল্লা ধরে টান দিল। কাঠের পুরনো আলমারি। দুটো পাল্লা খুলে দিতেই তাকগুলো দেখা গেল। নানান রকম জিনিসপত্রে ঠাসা। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় একটা অন্যরকম চেহারা তৈরি হয়ে গেছে। মাঝখানের তাকটা লকারের মতো পাল্লায় ঢাকা। সেটা চাবি দেওয়া।

আলতাফ বলল, 'যাচ্চলে! এটা খুলব কি করে?'

মতিন এবার উঠে এল। লকারগুলো যেমন হয়, ফুটোটার চেহারা নিরীহ।

সে বলল, 'হাতুড়ি ঠোক, ভেঙে যেতে পারে।'

লিটন হাতুড়ি তুলে দিল। আলতাফ সেটা ধীরে ধীরে ঠুকতে লাগল। ক্রমশ আবার তার জোর বাড়তে লাগল। মতিনের তখন খেয়াল হল ভেতরের লক ভাঙলেও ওটা খুলবে না। চাবি ঘোরালে পাল্লাদুটোর সামনে খুলে আসার কথা। হাতুড়ির আঘাতে ওটা তো ভেতরে যাবে না। সে আলতাফকে থামাল, 'এভাবে হবে না। পুরোটাই ভেঙে যাবে। ওদের জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ কেউ কোনও কায়দা জানে কি না।'

আলতাফ বিরক্ত হল, 'ওরা কি জানে!'

'জিজ্ঞাসা করেই দ্যাখ না।'

আলতাফ বারান্দায় বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করল। মানুষগুলো এ ওর মুখের দিকে তাকাল। চাবিছাড়া তালা খোলার একমাত্র পথ সেটাকে ভাঙা। কিন্তু গুরুত্ব পেয়ে একজন উঠে এল বারান্দায়। লিটল মতিনের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমার আব্বা।'

আলতাফ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তালা খুলেছেন কখনও?'

লোকটা বলল, 'খুলি নাই। তবে চেষ্টা করতে পারি।'

'করুন।' আলতাফ কাঁধ নাচাতে লোকটি ভেতরে ঢুকল। লকারের সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে লাগল ফুটোতে। তারপর লিটনকে চাপা গলায় কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে লিটন ছুটল বাইরে। বিরক্ত আলতাফ বলল, 'কি হল?'

'সরু তার দিয়া আমার এক দোস্ত তালা খুলত, দেখছিলাম।' লোকটি হাসল।

মতিন লোকটিকে দেখছিল। এর কথাই লিটন তাকে বলেছে। লোকটাকে সরল বলেই মনে হচ্ছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম কি?'

'জী, আলি।'

ইতিমধ্যে লিটন ফিরে এল। তার হাতে একটা তার আর চুলের কাঁটা। আলি সে দুটো নিয়ে ফুটোতে মনোনিবেশ করল। তারটা বেঁকে যাচ্ছিল বারংবার। ওরা অধৈর্য হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে সে এবার ঘামতে লাগল। এইসময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। উঠোনের মানুষেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আইছে আইছে।'

উঁকি মেরে দেখে আলতাফ বলল, 'মাছের লরি এসে গেছে। বড়ভাই, আপনি দেখুন ও খুলতে পারে কিনা। আমি ওদিকে যাচ্ছি।'

আলি তখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। মতিন দেখল বাইরের ভিড়টা লরির দিকে এগিয়ে গেছে। হঠাৎ সে আলির গলা শুনতে পেল, 'হইছে।'

পাল্লাদুটো দু হাতে খুলে আলি হাসল, যেন যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে সে।

মতিন বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আলি। তুমি কি কর?'

'এখন কাম নাই সাহাব।'

'কি কাজ কর?'

'যে যা কয় তাই করি।'

'ঠিক আছে। এই যে কাজটা করলে তা আগে কখনও করোনি?'

'না সাহাব। আল্লা কসম, এই প্রথম করলাম।' আলি সরে দাঁড়াল।

মতিন লকারটা দেখল। একটা ফাইল কভার চোখে পড়ছে। ফিতে দিয়ে বাঁধা। পাশে একটা কাঠের বাক্স। এ ছাড়া লকারে কিছু নেই।

ফাইল এবং বাক্সটাকে তুলে নিয়ে সে খাটের ওপর রাখল। লিটন এবং আলি এখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে আছে। আলতাফের মতো ওদের তাড়িয়ে দিতে পারল না মতিন। ওদের উপস্থিতি উপেক্ষা করে সে বাক্সটা খুলতেই দুটো সোনার বালা দেখতে পেল। বেশ ভারী সোনার বালা। এক

একটাই চারভরি হবে। মতিন মনে করার চেষ্টা করল এই বালাদুটোকে সে কখনও দেখেছে কি না। তার মনে পড়ল না। জিনিস দুটোর দাম এখন অনেক। এগুলো বছরের পর বছর এ বাড়ির আলমারিতে পড়েছিল অথচ এই অভাবী মানুষগুলো কখনই নজর দেওয়ার চেষ্টা করেনি। আলতাফ বলবে, ওরা জানত না বলেই চুরি করার চেষ্টা করেনি।

বালাদুটোকে আবার বাক্সে রেখে দিয়ে ফাইলের ফিতে খুলল মতিন। কিছু রসিদপত্র, টুকরো কাগজের নীচে সে ডিডটাকে দেখতে পেল। স্ট্যাম্প পেপারের ওপর হাতে লেখা ডিড। ডিড-এর শুরুতেই ঘোষণা, 'আমি হাজী খালেদ মোহম্মদ, কালীগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী, সজ্ঞানে ঘোষণা করিতেছি যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অত্যন্ত সততার সহিত লিখিত হইয়াছে। কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির আদেশ অথবা উপদেশে প্রভাবিত হইয়া আমি ইহা রচনা করি নাই।

প্রথমেই ঘোষণা করিতেছি ইহা আমার উইল নয়। দানপত্রও নয়। বলা যাইতে পারে ইহা আমার অভিলাষমাত্র। আইনের মাধ্যমে কেহ এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে না। বিভিন্ন সময়ে আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি তাহাই এখানে লিখিত হইয়াছে। আমার উত্তরাধিকারীরা যদি এই অভিলাষকে মর্যাদা দিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। কিন্তু কেহই ইহাকে লইয়া আদালতে যাইতে পারিবে না।'

মতিন মুখ তুলল। এ রকম একটা জিনিসকে কি বলা যায়? সে দেখল লিটন এবং আলি তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে খুব হইচই হচ্ছে, মানুষজন যেন কোনও কাজের মধ্যে রয়েছে।

'আমার অভিলাষ।'

(এক) আমার পুত্রেরা সবাই ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথে। তাহারা কখনও কালীগঞ্জে বাস করিতে আসিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাই আমাদের এই কালিগঞ্জের বাড়ির সহিত যাহারা বংশপরম্পরায় যুক্ত তাহাদের অধিকার দান করিলে ভালো হয়, তাহারা যে যেমন আছে তেমনই থাকিবে। চাষের জমিতে চাষ, পুকুরের মাছ, বিলের মাছ, গাছের ফল ইহারা সমান ভাগ করিয়া লইবে। যেহেতু আইনসম্মত ব্যবস্থায় এইসব বিষয়সম্পত্তির মালিকানা আমার পুত্রদের তাই কেহই এইসব বিক্রি করিতে পারিবে না। যাহারা এই ফলভোগ করিবে তাহারা হইল—

(১) করিম আলি এবং তাহার পরিবার

(২) কবির এবং তাহার পরিবার

(৩) আবদুল কুদ্দুস এবং তাহার পরিবার

(৪) দুর্গাদাস মৃধা এবং তার পত্নী

(৫) শামসুন্নেছা এবং তার মাতা

(৬) তারিখ এবং তার পরিবার

এইসব মানুষেরা সুখে দুঃখে আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাহারা যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আমাদের সম্পত্তির উচিত তাহাদের দায় বহন করা।

আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি আমার পুত্রদের সুবুদ্ধি দান করেন।'

মতিনের মনে পড়ল এসব কথা সে তার আব্বার মুখে অনেকবার শুনেছে। কিন্তু তিনি যে এসব লিখে যাবেন তা কে জানত। এটা কোনও উইল নয়। এই কাগজটাকে মেনে নিতে কেউ বাধ্য নয়। তবু মতিনের মনে যেন কাঁটা ফুটল। সে নামগুলোর ওপর চোখ রাখল। করিম চাচা, কবির এবং দুর্গাদাসের মুখ মনে পড়ল। বাকিদের সে হয়তো দেখেছে কিন্তু নামে মনে পড়ছে না। দুর্গাদাস তো এ বাড়িতে থাকে না অথচ হাজি সাহেব তার কথাও মনে রেখেছেন। হঠাৎ তার ৫ নম্বর নামের মানুষটাকে মনে পড়ে গেল। শামসুন্নেছা। ধাই-মায়ের মেয়ের নামও তো তাই। অন্য সবার ক্ষেত্রে পরিবারের কথা লিখেছেন হাজি সাহেব কিন্তু এর বেলায় মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব অঞ্চলে সন্তানের মা হিসেবেই মহিলাদের ডাকা হত অথবা হয়। সেক্ষেত্রে শামসুন্নেছা যে ধাই মায়ের মেয়ে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ফাইলটাকে বন্ধ করল মতিন। কি করা যায়। আলতাফকে বললে সে কখনই হাজি সাহেবের অভিলাষের প্রতি সম্মান দেখাবে না। কিন্তু দেখানো উচিত। একটি মানুষ যখন তাঁর ইচ্ছার কথা লিখে যায় তখন নিশ্চয়ই সেটা সে মনে প্রাণে চায় বলেই লেখে।

'বড়ভাই।' দরজায় আলতাফের গলা পাওয়া গেল।

লিটনরা নেমে গেছে বারান্দায়। মতিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আসুন। মাছ গোনা দেখবেন না?'

'দেখব। কিন্তু।'

'কি পেলেন লকারে?'

বাক্সটা এগিয়ে দিল মতিন। আলতাফ এগিয়ে এসে সেটা তুলে নিয়ে খুলল। বালাদুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কার এগুলো?'

মতিন মাথা নাড়ল, 'জানি না। কখনও দেখিনি।'

'আম্মার?'

'না। হলেও আমি দেখিনি।'

'আম্মার হলে এখানে থাকবে কেন।' আলতাফ নিজের মনেই বলল। তারপর জিনিসদুটো বাক্সবন্দি করে মতিনের সামনে রাখল, 'ওটা কি?'

'কাগজপত্র। সঙ্গে একটা অভিলাষপত্র।'

'কি পত্র?'

'উইল বা দানপত্র নয়। আব্বার যা ইচ্ছা হয়েছিল তাই লিখে গিয়েছেন। মানা না মানা আমাদের ওপর।' মতিন বলল।

'কি ইচ্ছে?'

'পরে দেখিস। এখন চল, বাইরে কাজ হচ্ছে।'

আলতাফ অদ্ভুত চোখে তাকাল, 'উল্টোপাল্টা কিছু?'

'এখানকার ছটি পরিবার যদি বিপদে পড়ে তাহলে তাদের ভরণপোষণ যদি এখানকার সম্পত্তি থেকে হয় তাহলে উনি খুশি হবেন।'

'চমৎকার। কিন্তু কেন?' আলতাফের গলায় ব্যঙ্গ।

'আমাদের পরিবার এদের কাছে উপকৃত, তাই।'

'আব্বার মাথা ঠিক ছিল না। এখন এইকথা এরা জানলে মাথায় উঠে বসবে।'

'আব্বা নিজেই লিখে গেছেন, এই নিয়ে কোর্টে যাওয়া যাবে না।'

'ও। তাহলে তো আমরা মানতে বাধ্য নই।'

'ইচ্ছে না হলে নই।'

আলতাফ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি ইচ্ছে?'

'আমার? এখনও ভাবিনি।'

'কাদের কাদের নাম আছে?'

মতিন নামগুলো বলে গেল।

শোনামাত্র আলতাফ বলল, 'শামসুন্নেছার নামও আছে। সর্বনাশ। আপনি এই ব্যাপারটা চেপে যান।'

'কেন? সর্বনাশের কি হল?'

'আপনাকে বলা আমার পক্ষে মানায় না।'

'ব্যাপারটা কি? শামসুন্নেছাকে নিয়ে তার মা আমার কাছে এসেছিল। মহিলা আমার ধাই-মা ছিলেন। ওর মেয়ের স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে ওর ভাসুর অত্যাচার শুরু করে। আত্মসম্মান বাঁচাতে সে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।'

'আর কিছু বলেনি?'

'না। আমাকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছে।'

'বড়ভাই, আমি এখানে এখন প্রায়ই আসি। আমি না চাইলেও আমার কানে অনেক গল্প আসে। সেগুলোকে বদমাস লোকের তৈরি গল্প বলে আমি উড়িয়ে দিই। কিন্তু আব্বা লিখিতভাবে ওর নাম জানিয়ে গেছেন শুনলে লোকে আবার গল্প তৈরি করবে।'

'কি গল্প শুনেছিস তুই?'

'আমি বলতে পারব না। আব্বার চরিত্র ভালো ছিল। তাই আমি গল্পটা বিশ্বাস করি না।'

আলতাফ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মতিন হাঁ হয়ে গেল। কি বলে আলতাফ? আব্বা যখন মারা যান, তখন শামসুন্নেছার বয়স কত ছিল? আট দশ। তাহলে আব্বার চরিত্রের কথা আলতাফ তুলল কেন? তার ইচ্ছে করল ছোটভাইকে ডেকে চড় কষায়। কঠোর গলায় বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করে।

'আপনারে ডাকতেছে।' লিটনের গলা কানে এল।

বাক্স এবং ফাইল আলমারিতে রেখে মতিন বাইরে বেরিয়ে এল। একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে। লরি থেকে তিনটে বড় ড্রাম নামানো হয়েছে। তিনজন লোক সেই ড্রামে হাত ঢুকিয়ে ক্রমাগত জল নেড়ে চলেছে।

আলতাফ বলল, 'মাছের বাচ্চা আছে এখানে। মুখে যা বলে তা তো ঠিক হয় না। তাই গুনে গুনে পানিতে ফেলব। সাইজ এক। এই কৌটায় মাছ ভর্তি করলে সংখ্যাটা বোঝা যাবে।'

'পানি থাকবে না?' মতিন জিজ্ঞাসা করল অন্যমনস্ক গলায়।

'না। কৌটোর নীচে ফুটো আছে।'

আলতাফকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না সে একটু আগে আব্বা সম্পর্কে ওইসব কথা বলে এসেছে।

আলতাফ লোকগুলোকে নির্দেশ দিল ড্রামগুলোকে পুকুরের ধারে নিয়ে যেতে। এইরকম কিছু লোক গুনগুন করে উঠতেই মতিন দেখতে পেল লাঠিতে ভর করে প্রায় লেংচে লেংচে দুর্গাদাস আসছেন। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দুর্গাদাসকে ধরল, 'অসুবিধে হচ্ছে খুব?'

হাঁপাচ্ছিলেন দুর্গাদাস, 'একটু তো হইবই। অনভ্যাস। লরি কইর‍্যা মাছ আনলা নাকি?'

'হ্যাঁ। আলতাফ, এদিকে শোন।'

আলতাফ এগিয়ে এল। মতিন বলল, 'এই হলো আলতাফ, আমার ছোটভাই।'

দুর্গাদাস একদৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করলেন, 'এইটুকুন দেখছিলাম তোমারে।'

'বড়ভাই আপনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু আপনি কি পারবেন রোজ আসতে?'

মনে হচ্ছিল দুর্গাদাসকে দেখে আলতাফ মোটেই সন্তুষ্ট নয়। দুর্গাদাসের পোশাকও খুব জীর্ণ।

'আজ যখন পারলাম তখন কাল না পারার তো কোনও কারণ নাই।' দুর্গাদাস হাসলেন।

অগত্যা আলতাফ হাত তুলে একজনকে ডেকে বলল, 'লতিফকে নিয়ে এখানে আয়।'

মতিন দেখল দু'জন যুবক এগিয়ে আসছে। গ্রামের অন্য মানুষের তুলনায় এদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো। ওরা কাছে এসে সেলাম করতেই আলতাফ বলল, 'এর নাম আজিজ আর ওর নাম লতিফ। এদের আজ কাজে রাখলাম।'

মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় থাকো তোমরা?'

আজিজ বলল, 'ওই পাড়ায়।'

মতিন বুঝল আলতাফ এই বাড়ির কোনও লোককে পাহারায় রাখেনি। ব্যাপারটা ঠিক নয়। সে যুবক দুটোকে বলল, 'ছোট সাহেব যা বলে যাবেন সেইভাবে কাজ কর। আর হ্যাঁ, এঁকে তোমরা চেনো? ইনি আমাদের খুব পুরনো মানুষ। রোজ সকাল বিকেল উনি আসবেন এখানে। কোনও অসুবিধে হলে এঁকে বলবে। ঠিক আছে, যাও।'

সেলাম করে ওরা চলে গেলে মতিন জিজ্ঞাসা করল, 'চারজন লোক রাখার কথা ছিল না?'

আলতাফ বলল, 'এখন দু'জনেই হয়ে যাবে। মাছ বড় হলে—।'

'না। এরা দিনের বেলায় কাজ করবে। রাত্রের জন্য তুই এখন একজন রাখ।' সে হাত তুলে দূরে দাঁড়ানো আলিকে ডাকল। কিছু না বুঝেই আলি ছুটে এসেছিল। মতিন যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল রাত জেগে পুকুরের মাছ পাহারা দিতে পারবে কি না তখন সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

আলতাফ তাকে ধমকাল, 'আমি যদি খবর পাই তুই ফাঁকি দিচ্ছিস তাহলে...।'

আলি বলল, 'তখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।'

মাছ ছাড়া হল পুকুরে হইহই করে। আলতাফ এবং লতিফরা গুনে গুনে মাছ

ছাড়ল বিকেলের পড়ন্ত আলোয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে মতিন দেখছিল দৃশ্যটা। পাশে দুর্গাদাস। মতিন বলল, 'আপনি তো কখনও ঢাকায় গেলেন না। কিন্তু এখানে গোলমাল হলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা খবর পাই।'

দুর্গাদাসকে চিন্তিত দেখাল। মতিন পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দুর্গাদাসকে দিল, 'এটা যত্নে রাখুন। এতে আমার ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লেখা আছে। কিভাবে খবর পাঠাবেন সেটা আমার ওপর নির্ভর করছে। এই কুড়িটা টাকা রাখুন। এটা এই বাবদে দিলাম। খুব প্রয়োজন না হলে খরচ করবেন না।'

মাছ ছাড়া হয়ে গেলে অদ্ভুত ধূসর এক আলো নামল পৃথিবীতে। মতিন ভাবছিল এইসময় যদি ভোলা এদিকে আসে তাহলে ওর বাপের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হবে। মতিনও চেষ্টা করত দুজনের মধ্যে ভাব করিয়ে দেবার। অবশ্য দুর্গাদাস ছেলেকে সহজে গ্রহণ করবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। মানুষটার জন্যে বেশ কষ্ট হচ্ছিল মতিনের।

আকাশে পাখিরা এখন উড়ে উড়ে যাচ্ছে। শিমুল গাছের ওপর যেন পাখিদের সভা বসে গেছে। বিলের ওপর ছায়া ঘন হয়ে আসছে। মতিন বলল, 'আপনি এখানে রাত করবেন না। বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হবে।'

দুর্গাদাস হাসলেন, 'তোমার চাচী তাঁতকল থিক্যা যাওয়ার সময় আমারে লইয়া যাইব।'

মতিন খুশি হল। তারপর বলল, 'জানেন, এখানে যারা আছে তাদের অনেককেই আমি চিনি না।'

দুর্গাদাস মাথা নাড়লেন, 'তুমি ঢাকায় থাকো বইল্যা চিনো না, আমি ঘর থিক্যা বাহির হই না বইল্যা চিনি না। ব্যাপারখান একই।'

কাজ শেষ হয়ে গেলে আলতাফ উঠে এল।

আলতাফের হাতে পায়ে জল কাদা লেগে গেছে। সেসব পরিষ্কার করে সে দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি টাকার হিসেব রাখতে পারবেন।'

'কি রকম?'

'মাছের খাবার কেনার টাকা আমি দিয়ে যাব। গাজীপুরে পাওয়া যায়। সেখান থেকে টাইম টু টাইম কিনে এনে খাওয়াতে হবে।'

দুর্গাদাস আপত্তি করলেন, 'টাকা দেওনের দরকার কি! খাবারটাই কিনে দাও। বেশি কিনলে তো নষ্ট হইব না।'

কথাটা পছন্দ হল আলতাফের।

এখন একটু একটু করে ভাল লাগা তৈরি হচ্ছে। দিন গেলেও দিনের স্মৃতি মনে

পড়ায় যে ভাল লাগা তাই বা কম কি। মতিন একাই হাঁটতে বের হল। মসজিদে আজান দেওয়া হচ্ছে। মাঠের ওপর দিয়ে বিলের শুকনো জমি পেরিয়ে তার সুর ভেসে যাচ্ছে দূর দূরান্তরে। বড় সুন্দর এ সময়। এই পথটা আব্বা করে গিয়েছিলেন। এই পথে আব্বা হাঁটাচলা করতেন। কেমন যেন শিরশিরানি এল শরীরে। আব্বার শেষ অভিলাষ সে পূর্ণ করতে পারছে না। এই বাড়ি, মসজিদ, মাটি, পুকুরের ওপর কার অধিকার বেশি? তাদের না যারা তাদের হয়ে এতকাল আগলে বসে আছে?

এখনও সন্ধের অন্ধকার নামেনি। দোকানপাট যে জায়গায় সেখানে পৌঁছানো মাত্র একটি ছেলে দৌড়ে এল, 'এই নেন।'

মতিনের মনে পড়ল। সকালে লবেঞ্চুস কেনার সময় সে চেঞ্জ নেয়নি। ভালো লাগল ছেলেটির সততা দেখে। তারপরেই সে মুজিবর ভাইকে দেখতে পেল।

মুজিবর বলল, 'আদাব। চললেন, কই?'

'কোথাও না। এমনি হাঁটছিলাম। মুজিবর ভাই, আমি আলতাফকে বলে দিয়েছি যাতে এখানে এসে কোনও ঝামেলা না করে।'

'ভালো করছেন।'

'এখানে আমরা একটা ব্যবসা শুরু করতে চলেছি। আমার আব্বা যাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের কাউকে আমরা উৎখাত করছি না, বরং কয়েকজনকে চাকরি দিয়েছি।' মতিন বলল।

'কিন্তু আপনারা মাছ চাষ করলে ওরা পুকুরে জাল ফেলতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, সেটা সম্ভব নয়।'

'সেটাও ঠিক। তাহলে ওরা বাঁচবে কি করে?'

মতিন প্রশ্নটা শুনে হাসল, 'আপনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। আপনিই বলুন, মানুষ কতদিন অন্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে? তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা উচিত নয়?'

'এরা সবাই বৃদ্ধ, অশক্ত, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াবার বয়স চলে গিয়েছে।' মুজিবর মাথা নাড়লেন, 'আমি জোর করছি না, শুধু ভেবে দেখতে বলেছি। আমার কথা লোকে এখন শোনে না।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। বোঝাই গেল উনি একটুও সন্তুষ্ট নন। মতিনের মনে হল গোটা দেশের চেহারাটাই যদি এমন হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু হবে না। শুধু সাহায্য চেয়ে হাত বাড়িয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকা যায় না, তাতে

আত্মমর্যাদাও থাকে না। এ কথা এইসব প্রবীণ মানুষেরা কবে বুঝতে পারবেন? মুজিবর ভাই যদি জানতেন হাজী সাহেব একটা অভিলাষপত্র রেখে গিয়েছেন তাহলে আর দেখতে হত না। মতিন বুঝতে পারছিল কাগজটা পড়ার পর যে দুর্বলতা তার মনে জুড়ে বসেছিল তা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে।

মসজিদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মেছবাহউদ্দিন সাহেব। জিজ্ঞাসা করলেন, 'চললেন নাকি?'

'হ্যাঁ, একটু বাদেই ফিরে যাব।'

'আবার কবে আসবেন?'

'এখন তো মাঝেমাঝেই আসতে হবে।'

'শুনলাম মাছের চারা নিয়ে লরি এসেছে।'

'হ্যাঁ, মাছ ছাড়াও হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনার উপদেশ মতো আমরা এখানকার চারজন মানুষকে চাকরিতে নিয়োগ করেছি আজ থেকে।' মতিন ইচ্ছে করেই উপদেশ শব্দটি ব্যবহার করল।

'নিয়োগ করে ফেলেছেন? কাদের?' কপালে ভাঁজ পড়ল চেয়ারম্যান সাহেবের।

'আজিজ, লতিফ, আলি আর দুর্গাদাস।'

'দুর্গাদাসটা কে?' মেছবাহউদ্দিন পাশে দাঁড়ানো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে হে?'

মতিন জবাব দিল, 'হিন্দু পাড়ায় বাড়ি। আমার আব্বা ওঁকে খুব ভালোবাসতেন।'

'ও দুর্গাদাস।' চিনতে পারলেন মেছবাহউদ্দিন, 'ভোলার বাবা! সে তো অথর্ব, ভালো করে হাঁটতে পারে না। ওকে দিয়ে কোন কাজ করাবেন?'

'পাহারা দিতে পারবে।'

'হুম। কিন্তু আমাকে বলে নিয়োগ করলে ভালো করতেন।' গম্ভীর গলায় বললেন মেছবাহউদ্দিন, 'যাদের সত্যিকার প্রয়োজন ছিল তাদের বঞ্চিত করা ঠিক নয়।'

মতিন হাসল, 'ব্যাপারটা কি হওয়া উচিত বুঝতে পারিনি। আসলে গতকাল ঢাকায় আড্ডা মারার সময় মুকুলভাই বলেছিলেন আপনার কথা। কালীগঞ্জে কোন অসুবিধে হবে না।'

'মুকুল ভাই মানে? কোন মুকুল ভাই?'

'এম এ সামাদ মুকুল।'

'মুকুল ভাইকে আপনি চেনেন?' মেছবাহউদ্দিনের গলায় স্বর বদলে গেল।

'আমার বন্ধু।'

সঙ্গে সঙ্গে মতিনের হাত জড়িয়ে ধরলেন ভদ্রলোক, 'একথা এতক্ষণ বলেননি কেন? ছি ছি ছি। কি বলতে কি বলেছি। হ্যাঁ, এখন থেকে আপনি নিশ্চিন্ত। কেউ আপনার ওখানে কোন ঝামেলা করবে না। খুব ভালো হল। আপনারা যত গ্রামে আসবেন তত গ্রামের মঙ্গল হবে।'

এরপর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা চলে। মেছবাহউদ্দিন বারংবার মতিনকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু সময় কম বলে এড়িয়ে গেল মতিন। তারপর ফিরে এল বাড়ির দিকে।

এখন অন্ধকার গাছের মাথায়। মাটিতে তার ছোপ লেগেছে। সাবধানে পথ চলতে হচ্ছিল। মাটির পথ। হাজী সাহেবের ইন্তেকাল হওয়ার পর আর কেউ রাস্তাটাকে যত্ন করেনি। বর্ষায় এখান দিয়ে হাঁটা মুশকিল হয়ে পড়বে। হাওয়া বইছে বেশ। সেই হাওয়ায় মতিনের মন ভালো হয়ে উঠল। বাল্যকালে এইরকম সময়ে এই পথ দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় এমনই হাওয়া বইত। পৃথিবীটা ঠিকঠাক আছে, শুধু মানুষের বয়স বাড়ে আর বিলের পানি শুকিয়ে যায়।

মতিনের মনে হল বাঁকের মুখে রাস্তার পাশে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটি যে মহিলা সেটা ঠাওর করতে কয়েক পা এগোতে হল। একটা গাছের গায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে মহিলা দাঁড়িয়ে। একেবারে পাশে চলে আসার পর সে মহিলাকে চিনতে পারল। ধাই মায়ের মেয়ে শামসুন্নেছা, আনু।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?' মতিন জিজ্ঞাসা করল। এই মেয়েটি ধাই-মায়ের সঙ্গে তার ঘরে এসে একটিও কথা বলেনি আজ দুপুরে।

মাথা নিচু করল আনু। অন্ধকারে তার আদল বোঝা যাচ্ছে।

'তুমি কি কিছু বলবে?'

'আমাকে বাঁচান।' সরু ফিনফিনে গলা কানে এল মতিনের।

'আমি তো তোমার মাকে বলেছি, চেষ্টা করব।'

'সেকথা না—।'

'তাহলে?'

'আমারে একটা কাম দ্যান। গারমেন্টের কাম।'

'সেটা করতে হলে তো তোমাকে ঢাকায় যেতে হবে।'

'যামু।'

'কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকবে কোথায়? ঢাকায় একা একা থাকতে পারবে না।'

'বড় সাহেব আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি থাকলে...।'

'হ্যাঁ, বাবা তোমার নাম লিখে গিয়েছেন।' অন্যমনস্কভাবে বলে ফেলল মতিন।

কথাটা বুঝতে পারল না আনু। নিজের মনেই বলে চলল, 'আমাকে তিনি কত কি দিছিলেন। আমার বিয়ার সময় দিবেন বইল্যা দুইখান বালা কিনছিলেন। সোনার বালা।'

মতিনের বুক ধক করে উঠল। সে বলল, 'তুমি সেই বালা দেখেছ?'

'হুঁ।'

'দেখলে চিনতে পারবে?'

'হুঁ।' আনু বলল, 'বালার ওপর ছোট ছোট সাপ আছে।'

আর সন্দেহ রইল না। মেয়েটা সত্যি বালা দেখেছে। চারভরি ওজনের বালার গায়ে সাপ আঁকা ছিল। তখন খেয়াল করেনি। এখন শোনার পর মনে পড়ল। আলতাফ তখন কিছু একটা বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলেনি। ওই কাগজের খবর জানাজানি হলে আব্বাকে নিয়ে আবার গল্প চালু হবে। আব্বা যখন মারা যান তখন এর বয়স খুবই কম। বালিকামাত্র। গল্প চালু হবার কারণ কি?

'তোমাকে নিয়ে আব্বা সম্পর্কে কোনও গল্প এই গ্রামে হয়?'

'হয়।'

'কি গল্প?'

'সবাই বলে তিনি আমার বাপের মত ছিলেন।'

'বাপের মত মানে?'

'আমার নিজের আব্বারে তো সাপে কাটছিল।'

'ও।' মতিন দেখল দূরে তাদের বাড়ির দিক থেকে একটা গাড়ির হেডলাইট এগিয়ে আসছে। সে বলল, 'ঢাকায় আমাদের গারমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে। আমি দেখছি কি করা যায়। তুমি সাবধানে থেকো।'

ততক্ষণে গাড়ির আলোয় চারপাশ আলোকিত হয়ে গেছে। মেয়েটা উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তীব্রতার জন্যে। গাড়িটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। হেডলাইট নিভল না। আলতাফের গলা শোনা গেল, 'বড়ভাই আপনি এখানে?'

'একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'

'ও এখানে কি করছে? কি বলছিল?'

'এমনি কথা বলছিল।'

গাড়ি থেকে নেমে এল আলতাফ। হেডলাইট নেভায়নি। তার আলোয় ওকে বেশ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল, 'অ্যাই, বড়ভাইকে কি বলছিলি?'

মেয়েটা জবাব দিল না। মতিন বলল, 'বললাম তো তোকে।'

'আপনি জানেন না এরা কি ডেঞ্জারাস।'

'সব মানুষকে তোর ডেঞ্জারাস বলা অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে।'

'একদম না। বড়ভাই, এ আপনাকে কিছু বলেছে?'

'কি ব্যাপারে?'

'আব্বাকে নিয়ে কোনও কথা?'

'না।'

মনে হল আলতাফ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'নেক্সট টাইম যখন আসব তখন তোকে আর তোর মাকে নিয়ে যাব তোর ভাসুরের কাছে। ওখানেই থাকবি তোরা। আপদ। আসেন বড়ভাই।'

'আমরা কি এখানেই ফিরে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার একবার বাড়িতে যাওয়া দরকার।'

'কেন?'

'ফাইল আর বালার বাক্সটা আলমারিতে ফেলে এসেছি।'

ওটা আমার সঙ্গে আছে। বেরুবার সময় নিয়ে এসেছি।'

'লোকজনদের সঙ্গে দেখা করে আসব না?'

'আবার তো আসবেন। এখন গেলে সবাই টাকা চাইবে। সারাদিন বলতে পারেনি এখন সব্বাই হাত পাতবে। আসেন।' গাড়িতে ফিরে গেল আলতাফ।

মতিন ধীরে ধীরে গাড়ির কাছে গেল, 'আলতাফ।'

'বলেন।'

'দ্যাখ, আমি আমার আব্বাকে খুব সমীহ করতাম। তাঁর অনেক কিছু আমার রক্তে ঢুকে গেছে। তোরা ওঁকে খুব অল্পদিন দেখেছিস। তোরা এটা বুঝবি না।'

'তা ঠিক। কিন্তু এসব বলছেন কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে আব্বার শেষ ইচ্ছাকে সম্মান দেব।'

'কি আশ্চর্য। এইসব জমি পুকুর বিলিয়ে দেবেন? আপনি ভাবীকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনিও আপনাকে একই কথা বলবেন। আব্বা আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এসব সম্পত্তি আমাদের কারো একার নয়। আমরা একা কিছুই করতে পারি না।' আলতাফ বলল।

'ঠিক কথা। কিন্তু ওই বালাদুটো কার?'

'ওটা আমাদের সবার। তবে আপনি রেখে দিতে পারেন।'

'না। এই বালা ওর। আব্বা ওর জন্যে বানিয়েছিলেন।'

'মিথ্যে কথা।' চেঁচিয়ে উঠল আলতাফ।

'চেঁচাস না। আমরা বালা পেয়েছি ও জানে না। নিজেই বলল। বালাটার বর্ণনা দিল। যার বালা তাকে দিয়ে যেতে চাই।'

'আপনি যখন বালা দেখছিলেন তখন আলি আর তার ছেলে ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'ওরাই বলতে পারে।'

'পারে। কিন্তু অতদূর থেকে বালার গায়ের সাপ দেখতে পারে না।' মতিন হাত বাড়াল, 'বাক্সটা দে।'

'ও কি করবে এদুটো নিয়ে? কোথায় রাখবে? বিক্রিও করতে পারবে না।'

'যা ইচ্ছে করুক। আব্বা শান্তি পাবে।'

আলতাফ বাক্সটা দিয়ে দিল। মতিন সেটাকে নিয়ে আনুর দিকে এগোতেই সে কঁকিয়ে উঠল, 'না, আমি নিব না। যে নাই তার জিনিস আমি নিব না। আপনি আমারে চাকরি দেন। আমারে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবেন না।' হঠাৎ মেয়েটা ছুটতে লাগল অন্ধকারে। মাঠঘাট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল সে। তাকে আর দেখা গেল না।

মতিন গাড়ির দরজা খুলতেই কান্নার আওয়াজ পেল। স্টিয়ারিং-এর উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আলতাফ। সে খুব অবাক হল। হাত বাড়িয়ে ভাইয়ের কাঁধ ধরল, 'এই, কাঁদছিস কেন?'

আলতাফ কথা বলার চেষ্টা করল। রিভলভার নিয়ে ঘোরা রাগী ছেলেটা এখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত, 'আব্বা—আব্বা—।'

'দুর পাগল। মানুষের স্বভাব হল গল্প তৈরি করা। আমাদের আব্বা ছিলেন কালীগঞ্জের মাটি, গাছ, পুকুর বিলের মত সহজ। আমি তাঁকে অনেক বেশি চিনেছি। তাঁকে সন্দেহ করা মানে নিজের খুন নষ্ট করা। ঠাণ্ডা হ। দ্যাখ না, বাবা যাকে স্নেহ করত সে লোভী নয়। এত দামি বালাটা নিল না। যে নেই তার জিনিস নেবে না বলে। তুই গাড়ি চালাতে পারবি না আমি চালাব।'

আলতাফ সোজা হয়ে বসল। ইঞ্জিন চালু করল। মতিন বাক্সটাকে একপাশে রেখে পকেটে হাত দিল রুমালের জন্যে। হঠাৎ আঙুলের ডগায় অন্যরকম স্পর্শ। আঙুল চটচটে হয়ে উঠল। অস্বস্তি হতেই সে পকেটটা ভাল করে দেখতে গিয়ে থমকে গেল। সকালে যে লবেঞ্চুসগুলো পকেটে রেখেছিল সেগুলো খানিকটা গলে প্যান্টের সঙ্গে লেগে গেছে। তিনটেকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও পকেটের চটচটানি রয়েই গেল। শরীরটাই কেমন করে উঠল। বাড়ি ফিরে প্যান্টটাকে ছেড়ে না ফেলা পর্যন্ত মতিনের স্বস্তি হবে না। সে আলতাফকে বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার।'

— সমাপ্ত —

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত সমরেশ মজুমদারের অন্যান্য বই

সিংহ বাহিনী
জলছবির সিংহ
প্রথম উপন্যাস অমনিবাস
রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ও অন্যান্য
নহবতখানা
প্রিয় আমার
মেয়েরা যেমন হয়
উত্তরাধিকার
গর্ভধারিণী
স্বপ্নের বাজার
সর্বনাশের নেশায়
তনু অতনু সংবাদ
বৃষ্টিতে ভেজার বয়স
ভালো থেকো ভালোবাসা

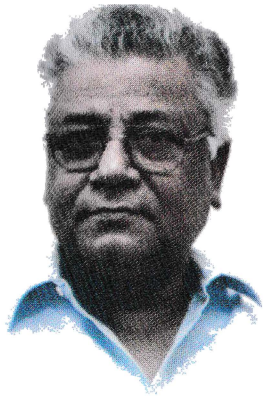

সমরেশ মজুমদারের জন্ম ১০ মার্চ ১৯৪৪। শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় আসেন ১৯৬০-এ।

শিক্ষা: স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ।

প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতেন। তারপর নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়', ১৯৭৫-এ 'দেশ' পত্রিকায়।

গ্রন্থ: দৌড়, এই আমি রেণু, উত্তরাধিকার, বন্দীনিবাস, বড় পাপ হে, উজান গঙ্গা, বাসভূমি, লক্ষ্মীর পাঁচালি, উনিশ বিশ, সওয়ার, কালবেলা, কালপুরুষ এবং আরও অনেক।

সম্মান: ১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এ ছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনিকার হিসাবে বি এফ জে এ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।